উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরন

শ্রী সুশীল কুমার গুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ

(১৮০১—১৮৬০)

UNABIMSA SATABDITE
BANGALAR NAVAJAGARAN

(1801—1860)

(Bengal's Renaissance in the
19th Century : 1801—1860)

Dr. Sushil Kumar Gupta,
M.Sc., M.A., D.Phil.

Price : Rupees Seven only.

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত, এম. এসসি., এম. এ., ডি. ফিল.

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৬ সাল (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপটশিল্পী : অরূপ গুহ ঠাকুরতা

মূল্য : সাত টাকা মাত্র

মুদ্রক
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে
পরমভক্তিভাজনেষু

সূচীপত্র

প্রাক্‌কথন

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। এই শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ হওয়াতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসিয়াছিল এবং নূতন নূতন ভাবধারার জন্ম হইয়াছিল। বর্তমান কালের গৌরবময় বহু ভাবধারার উৎস সন্ধান করিতে হইলে এই শতাব্দীর মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে হইবে। সুতরাং এই নবজাগরণের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও তেমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। কোন কোন লেখক কোন একটি বিশেষ দিক হইতে বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই সকল আলোচনা এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হওয়াতে নবজাগরণের অন্তরঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ রূপটি ফুটিয়া উঠে নাই। কোন কোন আলোচনা আবার যে পরিমাণে আবেগময় সেই পরিমাণে যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যনির্ভর নহে। এই সকল কারণে নিরপেক্ষ ও তথ্যনিষ্ঠ একটি মন লইয়া বাঙ্গালার নবজাগরণের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইয়াছি। আলোচনার সুবিধার জন্য এই নবজাগরণের ভাব ও চিন্তাধারাকে ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করিলেও মূলগত ঐক্যের কথা বিস্মৃত হই নাই, কেননা এই মূলগত ঐক্যই ইতিহাসের আত্মা। সমগ্র গ্রন্থপাঠে এই নবজাগরণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ যাহাতে ফুটিয়া উঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি।

নবজাগরণের এই ইতিহাস রচনায় বিশেষভাবে যে সকল গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও রিপোর্টের সাহায্য লইয়াছি তাহাদের নাম যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে নবযুগের রূপটিকে যথাসম্ভব জীবন্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ খুব তীব্র হইয়াছিল বলিয়া আলোচনা এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এই চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ বহু পরিমাণে সংহত হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রসঙ্গে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দটিও গুরুত্বপূর্ণ।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ছাপা বাঙ্গালা পুস্তকাবলীর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই একই খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু 'হরকরা' (গস্‌পেল মেসেঞ্জার) নামক কবিতা-পুস্তক এবং 'জ্ঞানোদয়' নামক পৌত্তলিকতা-বিরোধী গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল কারণে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার ভাবধারায় বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এই পরিবর্তনের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পাদরী উইলিয়ম কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই বৎসরের জুলাই মাসে শ্রীরামপুরে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙ্গালী রামরাম বসু রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' আত্মপ্রকাশ করে। এই একই বৎসরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ ও প্রচার হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই উইলিয়ম কেরী-প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (ইংরেজী ভাষায়) ও 'কথোপকথন' প্রকাশিত হওয়াতে বাঙ্গালা ভাষার ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার সিংহদ্বার খুলিয়া যায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দও পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোধান ঘটিয়াছে এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'পদ্মাবতী নাটক', 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়া চিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিকতার নূতন তরঙ্গ তুলিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিল্পিকদর্শন' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়।

যে সকল গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও রিপোর্ট হইতে বিশেষভাবে সাহায্য লইয়াছি ও উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহাদের নাম যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করা ছাড়াও গ্রন্থের শেষে তাহাদের একটি স্বতন্ত্র তালিকা করিয়া দিয়াছি। ইহা ব্যতীত যে সকল গ্রন্থাদি এই গ্রন্থরচনার সূত্রে পাঠ করিয়াছি তাহাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করি নাই। গ্রন্থশেষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালার নবজাগরণের ইতিহাস রচনাকালে ইওরোপের সুবিখ্যাত ও প্রকীর্তিত রেনেসাঁসের কথা মনে না পড়িয়া পারে না। মধ্যযুগের শেষের দিকে এক অনন্যসাধারণ প্রাণসমৃদ্ধ প্রচেষ্টা ইতালি, জার্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড

প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে ক্ল্যাসিকাল জ্ঞান ও কাব্যকলার পুনরাবিষ্কার হইয়াছিল, মনুষ্য জীবন সম্পর্কে নূতন আশা কৌতূহল ও আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছিল এবং ধর্মজীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে নূতন চেতনাবোধ ও ভাবনা জন্মলাভ করিয়াছিল। সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় শিক্ষা-ধর্ম-সংস্কৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জীবতা হইতে প্রবল উৎসাহে ও অদম্য শক্তিতে নূতন যুগের আলোকিত পথে যাত্রা সুরু হইয়াছিল। কোন একটি পৃথক ক্ষেত্রে এই নবজাগরণ আবদ্ধ থাকে নাই। ভাবনা, চিন্তা ও চেতনার সর্বস্তরে ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়া আধুনিক জগতের দিকে মানুষকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঠিক কোন সময়ে এই জাগরণ আরম্ভ হয় তাহা নির্দেশ করা যায় না। তবে মোটামুটি চতুর্দশ শতাব্দীতে এই জাগরণ প্রথমে ইতালিতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ধরা হয়। এই জাগরণের পূর্ণ কারণ কোন একটি বিষয়ের প্রতি আরোপ করা যায় না। শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, ভাবনা ও চিন্তায় ইতালি তখন ইওরোপের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল বলিয়া সেইখানেই এই জাগরণের অনুকূল পরিবেশ প্রথম রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই রেনেসাঁসের সম্পর্কে জন এডিংটন সিমণ্ডসের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিলেই বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে।

"The word Renaissance has of late years received a more extended significance than that which is implied in our English equivalent—the Revival of Learning. We use it to denote the whole transition from the Middle Ages to the Modern World, and though it is possible to assign certain limits to the period during which this transition took place, we cannot fix on any dates so positively as to say—between this year and that the movement was accomplished.

In like manner we cannot refer the whole phenomena of the Renaissance to any cause or circumstance, or limit them within the field of any one department of human knowledge."[১]

১। John Addington Symonds : A Short History of the Renaissance in Italy : London 1893 : p. 1.

সিমণ্ডস্ নবজাগরণের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

"By the term Renaissance, or new birth, is indicated a natural movement, not to be explained by this or that characteristic, but to be accepted as an effort of humanity for which at length the time had come, and in the onward progress of which we still participate.... It is the history of the attainment of self-conscious freedom to the human spirit manifested in the European races. It is no mere political mutation, no new fashion of art, no restoration of classical standards of taste. The arts and the inventions, the knowledge and the books, which suddenly became vital at the time of the Renaissance, had long lain neglected on the shores of the Dead Sea, which we call the Middle Ages. It was not their discovery which caused the Renaissance; but it was the intellectual energy, the spontaneous outburst of intelligence, which enabled mankind at the moment to make use of them. The force then generated still continues, vital and expansive, in the spirit of the modern world."[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণও এমনি একটি রেনেসাঁস। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে রেনেসাঁসকে নবজন্ম অর্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত। কিন্তু নবজাগরণ অর্থেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। বস্তুত ইওরোপের ভাব ও চিন্তাধারার একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে রেনেসাঁস বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই অভিব্যক্তি আমাদের জাতীয় চেতনার কাছে তেমন পরিচিত নহে বলিয়া বাঙ্গালা ভাষার নবজন্ম বা নবজাগরণ শব্দ রেনেসাঁসের পূর্ণ ভাব, কল্পনা ও ব্যঞ্জনা বহন করে না। তবে সাধারণভাবে নবজন্ম বা নবজাগরণ রেনেসাঁসের অনুবাদ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১। Ibid: page 3.

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রেনেসাঁসের ফলোদ্ভূত Humanism শব্দের প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় দুষ্প্রাপ্য। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

কেহ কেহ বাঙ্গালার নবজাগরণের আলোচনা প্রসঙ্গে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব ও গতিপ্রকৃতির ইতিবৃত্তকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার ঘটনাবলীর সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া বাঙ্গালার নবজাগরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও মূল্য নিরূপণের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক দেশের চিন্তা-চেতনার রূপানুসারে নবজাগরণের গতি ও প্রকৃতির স্বরূপ বিভিন্ন। বাঙ্গালার নবজাগরণেরও একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির গতিপথ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মূলে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব যে আছে এ কথা অনস্বীকার্য, কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত পরিচয়, সংঘর্ষ ও মিলনের ফলে এই নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই নবজাগরণ বাঙ্গালার জাতীয় মানসে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট চরিত্রানুযায়ী একটি অপূর্বসুন্দর স্বতন্ত্র রসমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালার সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, চিন্তা ও চৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার গতিপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনে ইহার সুদূর-প্রসারী প্রভাবের মূল্য নির্ধারণ করা সমুচিত।

ইওরোপের রেনেসাঁসের তুলনায় বাঙ্গালায় নবজাগরণের মধ্যে ভাবাদর্শের প্রভাব বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় সংস্পর্শে বাঙ্গালার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই নবজাগরণের মর্মমূলে সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তাধারার প্রভাব এই জাগরণের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি—এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে ভাবুক কল্পনাবিলাসী ও ভক্তিপ্রবণ বাঙ্গালীর চরিত্রানুযায়ী তাহার মানসলোকে ভাবাদর্শের যে নূতন বন্যা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনায় বাস্তব জীবনের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই নগণ্য। আর এই পরিবর্তনও অনেক বিষয়ে যতটা ব্যক্তি ও আদর্শগত ততটা সমাজগত নহে।

বাঙ্গালার নবজাগরণের মধ্যে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিকাশ থাকিলেও ভাবাদর্শের প্রাবল্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। এই কারণেই নবযুগের বহু মানবমুখী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এক ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া নবযুগের আশ্চর্যসুন্দর

আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি সুফলও ফলিয়াছিল। এই ভাবাদর্শের প্রাবল্যের জন্যই হিউম্যানিজম্ এই দেশে রূপে রসে জাতীয় চৈতন্য-মানসে একটি বিশেষ প্রেরণা হইয়া জাতিকে নবযুগের প্রাণরূপসমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্যের পদ্ম ফুটাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইওরোপের ন্যায় ভোগবাদ যান্ত্রিকতা ও প্রয়োজনবিচারবুদ্ধির প্রাবল্যে হিউম্যানিজম্ এদেশে এক প্রাণহীন মর্মরে পরিণত হয় নাই। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের মধ্যে ভক্তির সহিত যুক্তি, কল্পনার সহিত বাস্তবতা, ধর্মের সহিত কর্মের অপূর্ব মিলন বাঙ্গালার নবজাগরণকে একটি বিশেষ শ্রী ও সার্থকতায় মণ্ডিত করিয়াছিল।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালার নবজাগরণের পর্যালোচনা করিতে হইলে জাতীয় ঐতিহ্য, ভাবসম্পদ ও সারস্বত ধ্যানধারণার কষ্টিপাথরে ইহাকে বিচার করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ ইওরোপীয় রেনেসাঁসের কথা না আসিয়া পারে না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের সংজ্ঞাদি আরোপ করিয়া বাঙ্গালায় নবজাগরণের ঘটনাবলীর বিচার ও মূল্য নির্ণয় করা সমীচীন নহে। ইহাতে জাতীয় মানসের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ধারাটি আমাদের নিকটে যথাযথ রূপে রসে প্রতিভাত হইবে না। উভয় জাগরণের যেটুকু সাদৃশ্য তাহার পশ্চাতে কতকগুলি চিরাচরিত বৃত্তি, সাধারণ কারণ ও পরিবেশ ক্রিয়াশীল ছিল এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে আশা করা যায়। মানুষ যতই বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদী হউক না কেন, প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাধিকারীর (authority) উপর তাহার এক দুর্নিবার আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও মোহ আছে। মানুষ তাহার আবিষ্কার, বিচার ও যুক্তিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ হইতে যাচাই করিয়া দেখিতে চায়। অতীতের নানা ভাঙ্গাগড়া ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এক অম্লান সুস্থির জীবনভাব ও আদর্শের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তিও তাহার জন্মগত। এই কারণেই ইওরোপের রেনেসাঁসের সময়ে ক্ল্যাসিকাল যুগের সাহিত্যশিল্প ও জীবনের অনুসন্ধান ও মূল্য নিরূপণ আরম্ভ হইয়াছিল। সিমণ্ডস্ লিখিয়াছেন,

"A belief in the identity of the human spirit under all previous manifestations, and in its uninterrupted

continuity, was generated. Men found that in classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, by which they might profit in the present. The modern genius felt confidence in its own energies which it learned what the ancients achieved."[১]

ঠিক অনুরূপ কারণেই বাঙ্গালার নবজাগরণের সময়ে প্রাচীন ধর্মাদর্শের পুনরাবিষ্কার ও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির পঠন-পাঠন সুরু হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

এই সকল কথা মনে রাখিয়াই বাঙ্গালীর নবজাগরণের গৌরবময় ইতিহাস রচনার প্রয়াস করা হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থের প্রায় নব্বইভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব ফিলজফি (আর্টস) ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উহা উক্ত ডিগ্রীর জন্য মনোনীত হয়। তখন বিষয়টির পূর্ণ নাম ছিল, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ (ধর্মে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, সমাজে ও রাজনীতিতে ; ১৮০১—১৮৬০)'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম.এ., পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি.-র অধীনে আমার গবেষণা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন,—ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, এম.এ., ডি. লিট. (লণ্ডন), ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম.এ., পি. আর. এস.

আমার ছাত্র ও সাহিত্য জীবনে এবং গবেষণা কার্যে যাঁহাদের সস্নেহ সহযোগিতা, আশ্বাস ও উৎসাহ পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসাধন ভট্টাচার্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রভৃতি পূজনীয়দের ঋণ আমি এই সূত্রে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবনের অধ্যাপক-মণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট হইতেই আমি অকুণ্ঠ সাহায্য ও প্রেরণা পাইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাকে

১। Ibid : pages 6-7.

কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার অনেক বন্ধু ও সহকর্মী নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের আর মামুলী ধন্যবাদ দিয়া ছোট করিতে চাই না। তবে এই ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীপ্রশান্ত রায়, শ্রীপীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ও শ্রীপীযূষ চৌধুরীর নাম সর্বদাই আমার স্মরণে আছে।

আমার পরমভক্তিভাজন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশকালে গ্রন্থটির বিষয়ে নানা নির্দেশ ও উপদেশ দিয়া আমার প্রতি যে সস্নেহ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁহার মত মনীষীর আনুকূল্য যে কোন সাহিত্যকর্মীর জীবনে এক পরম সম্পদ।

প্রখ্যাত প্রকাশক ও সাহিত্যরসিক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আমাকে যে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বস্তুত ভাগ্যক্রমে তাঁহার মত ব্যক্তির দুর্লভ নির্ভরতা না পাইলে এই গ্রন্থ পাঠকদের দরবারে এত শীঘ্র এমন সুষ্ঠুভাবে কখনই পৌছাইত না তাহা বলাই বাহুল্য।

কলিকাতা
৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৬
(২২শে জুলাই, ১৯৫৯)

সুশীলকুমার গুপ্ত

সূচনা

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। এই শতাব্দীর উত্তরার্ধে বাঙ্গালার চিন্তা ও ভাবধারার ক্ষেত্রে নবজাগরণের চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। এই নবজাগরণের ইতিহাসের মর্মার্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও ভাবধারা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। আলোচনার সুবিধার জন্য দেশের চিন্তা ও ভাবধারাকে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি—এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথমত ধর্মের কথা ধরা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে শাক্ত ও শৈব মত, বৈষ্ণবধর্ম, ইসলামধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব ছিল। বাঙ্গালা দেশের প্রাণ-ধর্মের প্রভাবে এই ধর্মমতগুলির বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং প্রধান ধর্মমতগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই প্রাণ-ধর্মের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের প্রাণ-ধর্মের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে—শাস্ত্রগত সংস্কার হইতে মুক্তি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যোগদৃষ্টি এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ (heterodoxy)।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে বৈষ্ণবধর্মের স্রোত মন্থর হইতে থাকে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণার মূল উৎস শুকাইয়া যাইবার জন্যই এই গতিবেগের স্বল্পতা ও উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সময় বৈষ্ণবসমাজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতাকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করে। ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম যখন সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জনসাধারণের বৃহৎ অংশে পৌছিল, তখন তাহার মধ্যে শাস্ত্রের বন্ধন ও সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতা রহিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবসাহিত্যের তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য বিপ্রবর শ্রীজগন্নাথের পুত্র শ্রীল শ্রীনরহরি দাস, যাঁহার নামান্তর ঘনশ্যাম বা রঘুয়া নরহরি, 'ভক্তিরত্নাকর'

গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কথা, নিত্যানন্দ এবং তাঁহার স্ত্রী জাহ্নবী দেবী ও পুত্র বীরভদ্রের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

শ্রীনিবাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহনের সময়ে বৈষ্ণবসমাজে স্বকীয়া ও পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। রাধামোহন পরকীয়াবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাভ করেন। এই কলহ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। স্বকীয়াবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জয়পুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য। পক্ষ প্রতিপক্ষ ও সাক্ষীদের তালিকায় নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ছাড়া অন্য অনেক স্থানের পণ্ডিতদের নাম পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত ও শৈব ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। হিংস্র মনসা, রুদ্র চণ্ডী ক্রমে ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা এবং রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলীতে সর্বৈশ্বর্যময়ী মূলশক্তিরূপিণী ও উমাতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুপূর্বেই 'শূন্যপুরাণে' ধর্মঠাকুর কৃষক হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'শূন্যপুরাণ' বা 'আগমপুরাণ' সম্ভবত রামাইপণ্ডিত নামক একজনের রচনা নহে। 'শূন্যপুরাণে' সৃষ্টিপত্তন প্রসঙ্গের পর ধর্মপূজা-পদ্ধতির মধ্যে 'ধান্যের জন্ম' অংশে[১] ধর্মঠাকুরের ধানচাষের বর্ণনা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রামেশ্বরের 'শিবায়নে' শিবের চাষপালা ধর্মপুরাণ কাহিনীর রূপান্তর ও উপসংহার।

প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই শাক্তধর্মের একটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা গিয়াছিল। শাক্ত-পদাবলী বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শাক্তধর্মের বিষয়বস্তু এই সময় হইতেই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল এবং সর্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রম করিয়া জাতীয় মানসে একটি প্রেরণা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নবরূপ-প্রাপ্ত শাক্তধর্মের প্রধান আশ্রয় দুর্গা নহেন, কালী। সাধনার ক্ষেত্রে কালীর প্রাধান্যলাভ আকস্মিকভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ইহার প্রস্তুতি চলিয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যের দেবীগণ অনেকাংশেই স্থানীয় দেবী, তাঁহারা ভারতবর্ষের শক্তি-মহাদেবীর সত্যকারের প্রতিভূত্ব করিতে পারেন নাই।

১। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ' (৺ রামাই পণ্ডিত প্রণীত), কলিকাতা, ১৯০৮ঃ পৃঃ ১০৭-১১৫

সাধারণতঃ শক্তি-মহাদেবী বলিতে দুর্গাকেই বুঝায়। শক্তি-মহাদেবীরূপে কালীর আবির্ভাব দুর্গার পরে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই সাধনক্ষেত্রে কালী প্রাধান্য লাভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে শাক্ত-পদাবলীতে গলিতচিকুরা, আসবমত্তা, রুধিরার্দ্র-রসনা, রণোন্মাদিনী মহাদেবী-রূপিণী কালী স্নেহের পুত্তলী গৌরতনু উমা হইয়া উঠিলেন এবং শক্তি-ধর্মের মধ্যে নববেগ ও নবরূপতার আবির্ভাব ঘটিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ক্রমে এক নূতন সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। সকল দেবদেবী যে এক সত্যরূপ ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ ছাড়া অন্য কিছু নহে—এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছিল। কালী কৃষ্ণ শিব রাম প্রভৃতি দেবদেবী যে এক মূল সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় রূপ, এই উপলব্ধি অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনার অনেক স্থলেই পরিস্ফুট। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন,

“ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রামরূপে ধর ধনু,
কালীরূপে করে অসি ॥”[১]

রামেশ্বরের ‘শিবায়ন’ গ্রন্থে হরিহর ও দুর্গার একতা দেখা গিয়াছে। শাক্ত বৈষ্ণবের মিথ্যাদ্বন্দ্ব ভারতচন্দ্র স্বীকার করেন নাই। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী’ গ্রন্থে আশুতোষ, মহাকালী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদির বর্ণনার সহিত শচীকুমারেরও বন্দনা করা হইয়াছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কবিওয়ালারাই বহুল পরিমাণে জনসাধারণের ধর্মভাবের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন। এই কবিগণ সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্মদৃষ্টি উদার ছিল। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতগুলির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হইয়াছে। কবিগীতির স্রষ্টিকর্তা রাসু নৃসিংহ, লালু নন্দলাল ও রঘুনাথ দাস এবং গোঁজলা গুঁই। কবিওয়ালাদের মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানীচরণ বণিক, রাম বসু, আন্তনি সাহেব, নীলুঠাকুর প্রভৃতি সমধিক

১। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত ষষ্ঠ সং: পৃ: ২২

প্রসিদ্ধ। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটি, শাক্তভাবাপন্ন ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীত; অপরটি, বৈষ্ণবভাবাপন্ন সখীসংবাদ-ও বিরহ-বিষয়ক সঙ্গীত।

কবিওয়ালাদের আগমনীগানের মধ্যেই বিশেষ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের একটি উজ্জ্বল পটভূমি রচনা করিয়া দিয়াছে। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি সকল কবিই আগমনী ও বিজয়া গানে এক আশ্চর্য মানবিক আবেদন ঢালিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালা দেশে তন্ত্রের প্রচলন সপ্তদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এই তন্ত্রের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিকধর্মে পরিবর্তিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের হিন্দুতন্ত্র মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র ভারতের একটি স্বতন্ত্র প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদ প্রধান বিষয় নহে। ইহাতে প্রধান বিষয় হইতেছে, দেহকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি গুহ্য সাধনপদ্ধতির আচরণ। এই সাধনপদ্ধতিগুলি লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব ভাব ও চিন্তাধারার সহিত মিলিত হইয়া বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, আবার পরে হিন্দুধর্মের তত্ত্ব ভাব ও চিন্তাধারার সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন,

"It is an ancient religious cult of India manifesting itself sometimes as Hindu being associated with Hindu theology, thoughts and ideas and sometimes as Buddhist in association with later Buddhist theology, thoughts and ideas." [১]

শৈবশাক্তপ্রধান বাঙ্গালা দেশে শৈবশাক্ত তন্ত্রেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

১। Sashibhusan Das Gupta, *Obscure Religious Cult as background of Bengali Literature*, Calcutta, 1946, p. 20.

শাক্ততন্ত্র-সাধকদিগের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সর্বানন্দ ঠাকুর ও গোঁসাই ভট্টাচার্য, সপ্তদশ শতাব্দীর অর্ধকালী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন যুগে তন্ত্রোক্ত দেবতার মাহাত্ম্য ও তান্ত্রিক উপাসনার রহস্য প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্য ও শাক্তসঙ্গীতগুলির উল্লেখ করা যায়। বাঙ্গালার তান্ত্রিক ধারার সহিত নাথদের ধারার যোগ আছে। বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব-তন্ত্রেরও অভাব নাই। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন,

"এই তন্ত্রসাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।"[১]

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের পরে যখন ভাগীরথী তীরে নূতন নাগরিক সভ্যতার সূত্রপাত হয়, তখন এই সকল অঞ্চলে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান মন্দিরগুলির সংখ্যা ও গৌরব বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কালীঘাটের মন্দির সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এইখানে তন্ত্রসম্মত পূজায় নরবলি হইত বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির হল্‌ওয়েলের সময়ে 'কাল জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রের দ্বারা আনুমানিক ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এখানেও নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে। বাগবাজারের চিত্রেশ্বরী মন্দির, আনন্দময়ীর মন্দির, ঠনঠনিয়া কালীমন্দির, ফিরিঙ্গী কালী, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এইবার ইসলামধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। তুর্কী আমলের পরে পাঠান এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী রাজশক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানেরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজশক্তির জোরে অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সাধনা এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ করে। পলাশীযুদ্ধের পরাজয়ে মুসলমান-রাজশক্তির পতন হইলেও ইসলাম ধর্মের প্রসার থামিয়া থাকে নাই। বাঙ্গালা দেশে ইসলাম-ধর্ম প্রসারের কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমটি হইতেছে এই যে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদের সহিত সুফীবাদের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য ছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষে

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬২ : পৃ ১৯৪

অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে এদেশে স্থরবর্দীসম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। ইহার পর বিভিন্ন শতাব্দীতে চিশ্‌তী, কাদিরী, নক্‌শবন্দী প্রভৃতি আরও ছয় মতের স্থফীসাধক বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সহজিয়াধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্থফীবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং ক্রমে সহজিয়া ও স্থফীবাদের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া বাউল-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ছিল না। বাউল-সম্প্রদায় জাতিপংক্তি, তীর্থ-প্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ প্রভৃতি মানিতেন না। মানবতত্ত্বই তাঁহাদের সার। দরবেশ, সাঁঈ, কর্তাভজা, আউল প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির সাধনাও অনেকাংশে বাউল-সম্প্রদায়ের সাধনার অনুরূপ ছিল। এইরূপে স্থফীবাদের সহিত সহজিয়াবাদ মিলিত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে ইসলামধর্মের প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণটি হইতেছে এই যে, বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধাচরণের প্রবৃত্তি (heterodoxy) দেখা গিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের গোঁড়ামি, শাস্ত্রবিধির কঠোরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা যাইত। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই দিয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইসলামধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের এক অংশ সামাজিক স্থযোগ-স্থবিধার জন্য মুসলমান হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ধর্মমত বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলনকে প্রথম দিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

এইবার বাকী রহিল খ্রীষ্টধর্মান্দোলনের আলোচনা। পোর্তুগীজেরাই বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রথম লইয়া আসিয়াছিলেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক যখন কলিকাতায় আসেন, তখন কতিপয় পোর্তুগীজ তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। পোর্তুগীজেরা মুর্গীহাটায় একখণ্ড জমি পান এবং সেণ্ট অগস্টিনিয়ন-সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানগণ তথায় একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে উহা একটি ইষ্টক-নির্মিত চার্চে পরিণত হয় এবং এই চার্চটি পুরাতন হইয়া যাওয়ায় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে ধ্বংস করিয়া ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ একটি নূতন চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর ইহা মেরীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়।

চন্দননগর, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পোর্তুগীজ পাদ্রীদের কার্যকলাপ বেশী ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল চারি সহস্র।[১]

এদেশে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে পোর্তুগীজ পাদ্রীরা অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' এবং মানোএল্‌-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম প্রণীত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' প্রসিদ্ধ। প্রথম পুস্তকটি সেই সময় ছাপা হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পুস্তকটি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইজন্য সম্ভবত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ই বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। দোম আন্তোনিয়ো হিন্দুধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুধর্মের দশ অবতারবাদ, কয়েকটি পৌরাণিক উপাখ্যান ও বিশেষ করিয়া পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্মবিশ্বাসের অনেক অংশ তাঁহার নিকট অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে মোটামুটি ভাবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বীজ, মূল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাখ্যার সহিত ৬১টি ধর্মমূলক উপাখ্যান লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রথমে পোর্তুগীজ পাদ্রীরা যে ভাবে এদেশের ধর্মমতগুলিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিশনরী কর্তৃক সেই পদ্ধতি বহুল পরিমাণে অনুসৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যাপটিস্ট ও অন্যান্য মিশনরীদের প্রভাব বৃদ্ধি হইলে পোর্তুগীজ পাদ্রীদের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের কোন বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয় না।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগস্ট জব চার্নক কর্তৃক সুতানুটি গ্রাম অধিকৃত হইলে কলিকাতা শহরের প্রকৃত পত্তন হয়। সাধারণের চাঁদায় ও কোম্পানীর প্রদত্ত এক হাজার টাকার সাহায্যে কলিকাতার সেণ্ট য়্যান গির্জা ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং ৫ই জুন দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা লুণ্ঠন করিবার কালে গির্জাটিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তৎপরে

১। J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta, 1919, p. 108.

কলিকাতার পুনরুদ্ধার হইলে মুর্গীহাটার পোর্তুগীজ গির্জাটি দখল করিয়া উহাকেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের ভজনালয়রূপে ব্যবহার করা হয়।

ধর্মযাজকেরা প্রথম হইতেই শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী হইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জারবস্ বেলামি সর্বপ্রথম অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেণ্ট এণ্ড্রুজের প্রেসবাইটেরিয়ন্ চার্চের স্থানে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলগৃহ নির্মিত হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাইভের আমন্ত্রণে রেভারেণ্ড জন জাকারি কিয়ারনাণ্ডার কলিকাতায় আসেন। তিনি পুরাপুরি মিশনরী ছিলেন। তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি চার্চের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। তিনি নিজে এই চার্চের নামকরণ করিয়াছিলেন বেথ্ তেফিলা ; কিন্তু এই প্রোটেস্টাণ্ট চার্চটি ওল্ড মিশন চার্চ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তীকালে এই চার্চটি খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। এই স্থানে ডেভিড ব্রাউন, ক্লডিয়স বুকানন, হেনরি মার্টিন, ডোনিয়েল কোরি (মাদ্রাজের প্রথম বিশপ), ডিয়াল্ট্রি (মাদ্রাজের তৃতীয় বিশপ) প্রভৃতি ধর্মযাজকেরা কাজ করেন। প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের সেণ্ট জন চার্চ নামক প্রধান গির্জাটি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন রেভারেণ্ড উইলিয়ম জনসন দ্বারা উৎসৃষ্ট হয়। ইহা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি চার্চ নামে খ্যাত ছিল। তৎপরে ইহা ক্যাথিড্রেল নাম প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই এ দেশে চার্চ অব ইংলণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপক প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন ডেভিড ব্রাউন, ক্লডিয়স বুকানন, হেনরী মার্টিন, ডোনিয়েল কোরি ও টি. টি. টমসন। ইহাদের কার্যকাল মোটামুটি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ। ডেভিড ব্রাউন মিলিটারী অর্ফ্যান ইনস্টিটিউটের পাশে হিন্দুদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল খুলিয়াছিলেন। তাঁহাকেই চার্চ মিশনরী সোসাইটির জন্মদাতা বলা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারে ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রচেষ্টা অতীব উল্লেখযোগ্য। জন টমাস এই মিশনের প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজের ডাক্তার হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। জন টমাসই বঙ্গদেশে আগত প্রথম ব্যাপ্টিস্ট মিশনরী। জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া ডাঃ টমাস ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মালদহে একটি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় মণ্ডলীর পালক হন। তিনি রামরাম বসুর নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। মালদহে থাকাকালীন ১৭৮৮

খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন উইলিয়ম জন লঙ টমাসের দ্বারা ধর্মান্তরিত হইলে খুব উত্তেজনা হয়। এই সময় রামরাম বসু বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম খ্রীষ্টীয় ধর্মগীতি রচনা করেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ টমাস ইংলণ্ডে গিয়া ব্যাপটিস্ট নেতৃবৃন্দের নিকটে বঙ্গদেশের কথা বলিলে তাঁহারা তাঁহাকে ও ডাঃ উইলিয়ম কেরীকে বঙ্গদেশের মিশনরী নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন।[১] ঐ বৎসরের অগস্ট মাসে ডাঃ টমাসের চেষ্টায় ডাঃ কেরী ২০০৲ টাকা বেতনে মদনাবাটির নীলকুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ডাঃ টমাস ইতিপূর্বেই মহীপাল দীঘির নীলকুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশে ডাঃ টমাসের ভ্রাতা (সহোদর নহে) মিঃ এস পাওয়েল ডাঃ কেরীর দ্বারা ধর্মান্তরিত হইলে ডাঃ কেরী, মিঃ পাওয়েল, ডাঃ টমাস ও অন্য কতিপয় খ্রীষ্টান একটি মণ্ডলী গঠন করেন। দিনাজপুরের এই মণ্ডলীটি বঙ্গদেশের প্রথম মণ্ডলী।[২]

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর জন ফাউণ্টেন মদনাবাটিতে উপস্থিত হন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডাঃ মার্শম্যান, আচার্য ওয়ার্ড প্রভৃতি চারিজন মিশনরী শ্রীরামপুরে আগমন করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী উইলিয়ম কেরী সপরিবারে শ্রীরামপুরে আসেন এবং ওয়ার্ড ও মার্শম্যানের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরামপুর মিশনের সৃষ্টি করেন। বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে এই মিশনের প্রচেষ্টা স্মরণীয় হইয়া আছে।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে এদেশে ধর্মমতের যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা এই :—(১) শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বহু পুরাতন দ্বন্দ্বের প্রায় অবসান ঘটিয়া ধর্মমতগুলি পরস্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল ; (২) শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম তান্ত্রিকতার প্রভাবে বিকৃত হইয়াছিল ; (৩) ইসলাম ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রচার হইয়াছিল ; এবং (৪) পলাশীযুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ দেশের রাজশক্তি করায়ত্ত করিলে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১। ক্ষিতীশচন্দ্র দাস : বঙ্গে যীশুর বিজয়যাত্রা : কলিকাতা, ১৯৩২ : পৃঃ ৩৬

২। ক্ষিতীশচন্দ্র দাস : বঙ্গে যীশুর বিজয়যাত্রা : পৃঃ ৩৭

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, কোন নূতন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদাবলী প্রায় সৃষ্টি হয় নাই। তবে পুরাতন ধারানুসারে অনেকগুলি পদাবলী রচিত হইয়াছিল। একটি কথা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান। ইঁহাদের মধ্যে আফজল, আমান, কবীর (হিন্দী সাহিত্যের কবীর নহেন, বঙ্গীয় মুসলমান কবি), ফয়জুল্লা, এবাহুল্লা, আলিমুদ্দিন, মহম্মদ হামীর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদসঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি' সম্ভবত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত হয়। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে পদকর্তা 'হরিবল্লভ' বা সংক্ষেপে 'বল্লভ' দাস এই সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাতে ৩১৫টি পদ রহিয়াছে। 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তী ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'গীতচন্দ্রোদয়' সঙ্কলন করেন। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র প্রায় সমকালে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর সুযোগ্য বংশধর রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত-সমুদ্র' প্রকাশ করেন। ইহাতে মোট পদসংখ্যা ৭৪৬ টি। তন্মধ্যে রাধামোহনের স্বরচিত পদসংখ্যা ২২৮। 'পদামৃত-সমুদ্রে'র ২০/২৫ বৎসর পরেই গোকুলানন্দ সেন ওরফে 'বৈষ্ণবদাস' কর্তৃক 'পদকল্পতরু' সঙ্কলিত হয়। গৌরসুন্দর দাস 'কীর্তনানন্দ' ও দীনবন্ধু দাস 'সংকীর্তনামৃত' সঙ্কলন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত পদাবলীর মধ্যে পূর্ববর্তী পদাবলী হইতে পৃথক কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই। এই সব সঙ্কলনে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির পদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

চরিত-সাহিত্যে এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ শ্রীনরহরি দাসের (যাঁহার নামান্তর ঘনশ্যাম বা রঘুয়া নরহরি) 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ। ইহার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠকাব্য এই যুগে রচিত হয়। এই কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ধর্মমঙ্গল' রচনা শেষ করেন। ধর্মপূজা আদিম সূর্যপূজা ছাড়া অন্য কিছু নহে। ঘনরামের কাব্য উচ্চকাব্যগুণমণ্ডিত।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত ও শৈব ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন

১। ক্ষিতিমোহন সেন: হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা: কলিকাতা, ১৯৫০, : পৃঃ ৬৩

সাধিত হয়। রুদ্র চণ্ডী ক্রমে ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা এবং রামপ্রসাদের কাব্যে মাতৃরূপিণী কালী ও উমাতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। রামপ্রসাদের শাক্ত-পদাবলী এই যুগের এক পরম সম্পদ। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) ছন্দ-চাতুর্য, শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ও ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' (সম্ভবত ১৭৩৪) ও দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিওয়ালাদেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইহাদের মধ্যে রাম বসুই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আসরে উত্তর রচনা করিয়া গান করিবার প্রথা সৃষ্টি করেন। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে শাক্তভাবাপন্ন ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীত ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন সখীসংবাদ- ও বিরহ-বিষয়ক সঙ্গীত, এই দুই প্রধান শ্রেণী দৃষ্ট হয়। ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে রামপ্রসাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। রাধাকৃষ্ণের সখীসংবাদ ও বিরহের সঙ্গীতে রাম বসু সর্বশ্রেষ্ঠ। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি কবির আগমনীগানে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রের বহুল প্রচার হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে বহু পূর্ব হইতেই তন্ত্রের প্রচলন ছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হয়। ব্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' ও 'তারা রহস্য', পূর্ণানন্দের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' (১৫৭৭) ও 'শাক্তক্রম' (১৫৭১), গৌড়ীয় শঙ্করের 'তারা রহস্যবৃত্তিকা' (১৬৩০), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'শ্যামা-সপর্যাবিধি' (১৭৭৭) প্রভৃতি গ্রন্থ তন্ত্রবিষয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'মেরুতন্ত্র' সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, কেননা ইহার মধ্যে ইংরেজজাতি ও লণ্ডনের উল্লেখ আছে। মহানির্বাণতন্ত্রের কোন কোন অংশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। মহানির্বাণতন্ত্র পরবর্তীকালে আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সম্পাদনায় কুলাবধূত শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ভারতীর টীকাসহ আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১]

১। Arthur Avalon, *Tantra of the Great Liberation* (Mahānirvāna Tantra)-এর ভূমিকা, London, 1913, p. xiii.

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদিকে গ্রহণ না করিয়া প্রধানত ধর্মমত-প্রচারের উদ্দেশ্যেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জনসাধারণের মধ্যে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ', কাশীদাসী 'মহাভারত', 'মনসামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি পাঠের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যাত্রা, কবিসঙ্গীত, পদাবলী কীর্তন, কথকতা, ভাসান গান প্রভৃতির মধ্য দিয়া আনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিত। পাঠশালা ছিল শিক্ষার বনিয়াদ। টোল ও চতুষ্পাঠীতে হিন্দু-সংস্কৃতি এবং মাদ্রাসায় মুসলমান-সংস্কৃতির উচ্চতর ঐশ্বর্য রক্ষিত হইত। সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ প্রায় অশিক্ষিত ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় শিক্ষা পাইত। প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণই লিখিতে পড়িতে পারিতেন। কেউ কেউ ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। কিন্তু ইহা সত্য যে, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান সমসাময়িক কালের ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক কম ছিল।

হাইডের মতে কাপ্তেন বেলামির (Captain Bellamy) চ্যারিটি স্কুলই (১৭৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) বঙ্গদেশের প্রথম ইংরেজী স্কুল।[১] ঐ একই সময়ে কিয়ারনাণ্ডার একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর গভর্নর-জেনারেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ফ্রি স্কুল সোসাইটি স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উক্ত স্কুল দুইটি একত্র হইয়া ফ্রি স্কুল জন্মলাভ করে। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়।

বাঙ্গালাদেশে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দশকে বিলাতে চার্লস গ্রাণ্ট এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন সার্ উইলবারফোর্স। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় এই আন্দোলন জয়যুক্ত হয় নাই। সেই জন্য ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর নূতন সনন্দ আইনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ মনোভাব

১। Hyde, *Parochial Annals of Bengal*, Calcutta, 1901, p. 86.

সুস্পষ্ট। এদিকে এদেশে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে মুসলমান-প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। সংস্কৃতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী আরবী ও ফারসী শিক্ষা করিতেন। দেশীয় বিদ্যাচর্চার অবনতি রোধ এবং ইংরেজ ও দেশবাসীদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক আরবীশিক্ষার কলেজ বা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। প্রাচ্য বিদ্যার সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য সার্ উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী জেমস্ অগস্টাস হিকি (James Augustus Hicky) কর্তৃক প্রথম সংবাদপত্র 'দি বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়।[১] ঐ একই বৎসরের নভেম্বর মাসে 'দি ইণ্ডিয়া গেজেট' আত্মপ্রকাশ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেশীয় পাঠশালাসমূহের সংস্কারের চেষ্টা হয়। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নূতন ধরণের পাঠশালা স্থাপনে অগ্রসর হন। এই পাঠশালাগুলির আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। পাঠশালাগুলি অবৈতনিক ছিল এবং ইহাতে একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। কিছু ইংরেজী শিক্ষা দানের প্রয়াসও দেখা যাইত। বাঙ্গালায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যাল্‌হেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সতীদাহপ্রথার প্রচলন ও শিক্ষার অভাবের জন্য স্ত্রীজাতির অবস্থা উন্নত ছিল না। তবে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রী আসিয়া মেয়েদের গৃহে শিক্ষা দিতেন। মেয়েরা বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে এবং বাঙ্গালায় হিসাব রাখিতে শিখিতেন। ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। এই সময় স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রকাশ্য বিদ্যালয় দেখা যায় না। খ্রীষ্টান মিশনরীগণই এ বিষয়ে প্রথম ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সম্পর্কে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, হিন্দুসমাজে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষ প্রবল ছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় মিশিয়াছিল যাহাদের ধর্মসাধনা অনেকাংশে বৈষ্ণবধর্ম

১। H. E. Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, Third Edition, London, 1897, p. 162.

সাধনার অনুরূপ। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে সহজিয়া, কর্তাভজা, কিশোরীভজা, বাউল, দরবেশ, সাঁঈ প্রভৃতি সম্প্রদায়। এই প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনায় তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবধর্ম সমাজের নিম্নভাগে অবস্থিত জনসাধারণের বৃহৎ অংশে পৌছাইলে তাহার মধ্যে শাস্ত্রের বন্ধন ও সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতা রহিল না। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে বহু নিম্নশ্রেণীর সমাজচ্যুত ব্যক্তির ভিড় হইতে থাকে। ইহাদের নেড়ানেড়ী বলিত। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণবসমাজে এই নেড়ানেড়ীদের স্থান দিয়াছিলেন। খড়দহে বীরভদ্রের দ্বারা ১,২০০ ভিক্ষু ও ১,৩০০ ভিক্ষুনী বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। বৈষ্ণবদের আখড়াগুলি সমাজের দিক হইতে একটি বিশেষ কার্যসাধন করিত। অনেকস্থলে এই আখড়াগুলি পতিতা নারী, বাল-বিধবা প্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়া সমাজের ব্যাপক নৈতিক অধঃপতন রোধ করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

তান্ত্রিকদের মধ্যে সাধনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিধি ও সংস্কার মুক্তির প্রবণতা দেখা যাইত। তান্ত্রিকগণ বর্ণবৈষম্য প্রায় মানিতেন না, স্ত্রীলোকদের বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, সতীদাহের বিরোধী ছিলেন, বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং নারীহত্যাকে জঘন্য পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু তন্ত্রের অপর একটি দিক আছে। তন্ত্রের এই স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারে পর্যবসিত হইত। ইহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকের অনেকে তন্ত্রোপাসনার উচ্চ আদর্শ ও কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠান হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহাকে ইন্দ্রিয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের সহজ সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তান্ত্রিক আচারের অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতির অন্যতম কারণ এই তন্ত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার। সেইজন্য নানা ভয়াবহ অনুষ্ঠান ধর্মসাধনার অংশরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কালীপূজায় নরবলির সংবাদও পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশের সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামই ছিল সমাজ-জীবনের ভিত্তিভূমি। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অর্থের প্রাচুর্যেও পরিবর্তিত হইত না। অর্থের কৌলীন্যের স্থলে ছিল রক্তের কৌলীন্য।

এই সময় হিন্দুসমাজে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশু-উৎসর্গ, গঙ্গাজলি, চড়কপূজা

প্রভৃতি নানা কুপ্রথা ছিল। প্রধানতঃ এই সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমাজে একটি বিক্ষোভ ঘনীভূত হইতেছিল।

ইংরেজ রাজশক্তি পাইলে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরের কিছু অংশ সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা লাভের আশায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মিশনরীদের ঘৃণ্য পরচর্চাকারী ভাবিতেন। ব্রাহ্মণেরা মিশনরীদের ম্লেচ্ছ ও অশিক্ষিত বিদেশীরূপে পরিগণিত করিতেন। কিন্তু ইংরেজ সমাজের সহিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজের হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল।

রাজনৈতিক দিক হইতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের পরাজয়ে মুসলমান রাজশক্তির পতন হইয়াছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। সর্ত হয় যে, কোম্পানী ঐ তিন দেশের খাজনা আদায় করিবে ও বাদশাহকে প্রতিবৎসর ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দিবে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদিগের সহিত কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত করেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। নিয়ম হয় যে, গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হইয়া কোন সংবাদ, এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংবাদপত্রে ছাপা হইবে না।

কার্টিয়ারের শাসনকালে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হইলে স্থানে স্থানে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কোন ব্যাপক ও সংঘবদ্ধ আন্দোলন দেখা দেয় নাই।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসিয়াছিল—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাষ্ট্রশাসনের পরিবর্তনের সময় হইতেই। ঘোর তামসিকতাচ্ছন্ন জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত করিল ইংরেজ-শাসন ও তদধিক ইংরেজী শিক্ষা। জাতির প্রাণমনের সুপ্তি ভঙ্গ হইল। এই জাগরণ বাঙ্গালীর বহির্জীবন অপেক্ষা অন্তর্জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছিল বেশী। বস্তুতঃ এই জাগরণের মধ্যে ক্রমে জাতি তাহার আত্মপরিচয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং এক অভিনব জাতীয়তাবোধকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

ধর্ম-শাসিত এদেশের সমাজে প্রায় সমস্ত আলোড়নই ধর্মান্দোলনের রূপ নেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,

"You cannot think of a social question affecting the Hindu Community that is not bound up with religious considerations; and when divine sanction, in whatever form, is invoked in aid of a social institution, it sits enthroned in the popular heart with added firmness and fixity, having its roots in sentiment rather than in reason."[১]

কোন ব্যক্তিবিশেষ উনবিংশ শতাব্দীর নূতন ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলনের প্রবর্তক—এমন সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এই ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্মগত বিরোধের ফল। ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের ধ্যান ও ধারণার সহিত পরিচিত হইয়াছে। তাই এই আন্দোলনের প্রেরণা আসিয়াছে প্রধানত ইংরেজী শিক্ষা হইতে। এই কারণে এই আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে এবং ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রভূমি কলিকাতা অঞ্চলেই অধিকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য হিন্দুসমাজেই মুখ্যত এই আন্দোলন হয়। এ বিষয়ে উপসংহারে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, বহু পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই আন্দোলনকে আগাইয়া লইয়া গিয়া এক নূতন মানবতা ও জাতীয়তাবোধের জন্ম সম্ভব করিয়াছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই উনবিংশ শতাব্দীর ভাব ও চিন্তাধারাকে ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, এই পাঁচটি বিভাগ পরস্পর সম্বন্ধ-নিবদ্ধ, কেননা জীবনের ক্ষেত্রে ভাব ও চিন্তাধারার কোন বিভাগ সত্য হইতে পারে

১। Surendranath Banerjea : *A Nation in Making Being the Reminiscences of Fifty years of Public Life*, Oxford University Press, 1925, p. 396.

না। প্রতি বিভাগের আলোচনায় ইহার সহিত অন্যান্য বিভাগের কথা প্রসঙ্গত উল্লিখিত হইবে। ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় সংস্পর্শে আসিলে তাহার জীবনে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়। ক্রমে সেই আলোড়ন ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতন জাগরণ আনে। এই পাঁচটি বিভাগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া উপসংহারে এই বিভাগগুলির কেন্দ্রগত ঐক্যবদ্ধ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করা হইবে, কেননা এই বিভাগসমূহের মূলগত ঐক্যই ইতিহাসের আত্মা।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ যেমন এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের যুগ, তেমনি ইহার উত্তরার্ধ সংহতি ও প্রতিষ্ঠার যুগ। প্রাথমিক উত্তেজনা শান্ত হইয়া বাহিরের আদর্শের সহিত সমন্বয়ের ফলে যে আদর্শ সত্য বলিয়া গৃহীত হইল, তাহাই সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির ভাবজীবনে রসরূপ লাভ করিল। এই যুগোপযোগী সমন্বয়ে জাতির সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে নূতন আশ্বাস নামিয়া আসিল এবং নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই নব্য সাহিত্যই জাতি হিসাবে পূর্ণ সচেতনতার নিদর্শন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভাব ও চিন্তাধারার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন এই সময় বিশেষ করিয়া অনুভূত হইয়াছিল। কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল, সমস্ত হিন্দুরাই ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু মিশনরীদের দ্বারা যখন হিন্দুধর্মের উপর আঘাত পড়িল এবং হিন্দুগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত হিন্দুই মিশনরীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে প্রদর্শিত বিক্ষোভের প্রয়োজন ছিল। এই আঘাতকে প্রতিঘাত করিবার মধ্যেই বাঙ্গালী তাহার আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছে। সমস্ত হিন্দু একযোগে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হইয়া চলিল, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডফের ভারত-ত্যাগের পর খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত মন্দীভূত হইয়া আসিল।

বাঙ্গালীর জাতিধর্মে পুনরুত্থিত হিন্দুধর্মই ক্রমে জয়ী হইল। ব্রহ্মোপাসনার সূক্ষ্ম দার্শনিকতা বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না। তাই একদিকে ইংরেজী শিক্ষা, অপরদিকে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম—এই উভয়ের মধ্যে মর্মগত বিরোধ

থাকিলেও ক্রমে একটি সমন্বয় সাধন সম্ভব হইল, কারণ পাশ্চাত্য আদর্শেরও মর্মমূলে ছিল একটি সুপরীক্ষিত সত্য। এই পাশ্চাত্য আদর্শের মূলগত সত্যের বীজমন্ত্র হইতেছে humanism. "এই মন্ত্র আমাদের দেশীয় সংস্কার ও চেতনার বহির্ভূত বলিয়া ইহার প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই আদর্শের লক্ষ্য হইতেছে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, তাহার জীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সুস্থ জীবনপ্রীতি।"[১]

ভাব ও চিন্তাধারার এই আন্দোলন জাতিকে মোক্ষলাভের পথে লইয়া যায় নাই, জাতির জীবনকে নূতন করিয়া একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, তাহার প্রাণে জাতীয়তাবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। সমাজরক্ষার সমস্যাই প্রধানত এ-যুগের সমস্যা। সনাতন ধর্মকে যুগোপযোগী রূপ দিয়া জাতির সমাজ ও ভাবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

ইংরেজ-আমলে এদেশে নানা যন্ত্রপাতির আমদানী হওয়াতে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হইল। নূতন উৎপাদনপদ্ধতির জন্য গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ভাঙ্গিয়া গিয়া শহরকেন্দ্রিক জীবনের আরম্ভ হইল। সমাজে অর্থ-কৌলীন্যের জন্য নূতন শ্রেণীবিন্যাস হইল। এ সকল বিষয়ে উপসংহারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

১। ডাঃ সুশীলকুমার দে : দীনবন্ধু মিত্র : কলিকাতা ১৯৫১ : পৃ ১৩

ধর্মান্দোলন (১৮০১-১৮৬০)

॥ ১ ॥

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগ। এই শতাব্দীর উত্তরার্ধে বাঙ্গালার জীবনে ও সাহিত্যে আসিয়াছিল নবজাগরণের জোয়ার। এই নবযুগের সূচনা হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক দিক হইতে মোগলশক্তির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে এবং নূতন ইংরেজশক্তি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমগ্র দেশে একটি অস্থির অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। দেশ তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে আসে নাই। শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে মুসলমান-প্রভাব তিরোহিত হয় নাই। সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী আরবী ও ফার্সী শিক্ষা করিতেন। খ্রীষ্টের মহিমা-প্রচারে পোর্তুগীজ মিশনরীদের প্রচেষ্টা কমিয়া ব্যাপটিস্ট মিশন এবং চার্চ অব ইংলণ্ডের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। হিন্দুরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষদের ধর্মানুষ্ঠান বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। হিন্দুধর্মে শাক্ত ও বৈষ্ণব—এই দুই প্রধান ধর্মভাবের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু উভয় ধর্মভাবই তাৎপর্যহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছিল। বৈদিক মন্ত্র, উপনিষদ্ এবং বেদান্ত দর্শনের পঠন-পাঠন প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু এই শাস্ত্রগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শন এই শাস্ত্রগুলির স্থান অধিকার করিয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই জড়িমাগ্রস্ত জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত করিল ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণাকে জানিতে পারিয়াছে। তাই এই নবযুগের মূল প্রেরণার উৎস ইংরেজী শিক্ষা।

তিনটি প্রধান ধারায় এই ধর্মান্দোলন অগ্রসর হইয়াছে। রামমোহনের ব্রহ্মসভা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ ও কেশব সেনের নববিধানের মধ্য দিয়া একটি ধারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। ডফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ পাদ্রীগণ ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সুযোগে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলে সমাজে তুমুল

আন্দোলন ও আলোড়ন আনিয়াছেন। এই দুই বিরুদ্ধ স্রোতকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য প্রথমে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও পরে হিন্দুধর্মের সংস্কার শুরু হইয়াছে। আমরা এই তিনটি ধারারই আলোচনা করিব।

॥ ২ ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনরীগণ এবং চার্চ অব ইংলণ্ডের পাদ্রীগণ। এই শতাব্দীতে পোর্তুগীজ পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারের কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না। ইহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। এই কারণটি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোর্তুগীজ মিশনরীগণ পোর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সমর্থন ও সহায়তায় ধর্মপ্রচারে যত্নবান ছিলেন। ধর্ম-সম্বন্ধীয় কার্য বাড়িয়া যাওয়ায় পোপ শিষ্য-সম্বন্ধীয় ধর্মযাজকের পদ (Apostolic Vicariate) সৃষ্টি করিয়া ইহার জন্য ইংরেজ জেস্যুয়িট মনোনীত করেন। কিন্তু পোর্তুগাল ধর্মসম্বন্ধীয় বিচারের একক ক্ষমতার দাবী করিল। প্রাচ্যে তাহার ধর্মপ্রচারের উৎসাহের জন্য সে পূর্বে এই ক্ষমতা পোপের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালে পোর্তুগীজদের ধর্মের সকল ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া রোম ও পোর্তুগালের কোর্টের মধ্যে এই বিবাদ চলে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ও পোর্তুগালের রাজার মধ্যে এক চুক্তিপত্রের ফলে পোর্তুগীজ মিশনের ক্ষমতা খুব কমিয়া যায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিরোধের অবসান ঘটে।

উইলিয়ম কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনরীগোষ্ঠীর পরিচালক হন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা হন।

এই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তনের পূর্বে যে প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনরী এদেশে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জন টমাস। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক জাহাজের ডাক্তার হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। জাহাজের ডাক্তারী

চাকরি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মালদহে একটি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় মণ্ডলীর পালক হন। এই সময় তিনি পণ্ডিত রামরাম বসুর নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে রামরাম বসু একটি বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক চরিত্র।

রামরাম বসুর কথাবার্তায় ও রচনাবলীতে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইত, যাহাতে জন টমাসের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, রামরাম বসু খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিবেন। মালদহে থাকাকালীন ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন উইলিয়ম জন লণ্ড টমাসের দ্বারা অবগাহিত (ধর্মান্তরিত) হইলে খুব উত্তেজনা হয়। তখন শুধু মুন্‌শী রামরাম বসুর খ্রীষ্টধর্ম-ভাব দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন। জন টমাসের জীবনীকার লুইস লিখিয়াছেন,

"He was cheered amidst these discouragements by the hope that the spirit of God was powerfully working in the heart of his múnshi, Rám Basu. This man told him in June, 1788, that he had found Jesus to be the answerer of his prayer. He cried to Him in sickness, and a speedy cure had been granted. Towards the end of the same month, he brought Mr. Thomas, "a gospel hymn of his own composing, the first ever seen or heard of in the Bengalese language",—a lyric which still holds its place in our collections of Bengali hymns. Rám Basu's daily conversation betokened also a deep conviction of the truth of the gospel, and there was reason to hope he might soon be an acknowledged follower of Christ".[১]

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামরাম বসু বাঙ্গালাতে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টীয় ধর্মগীত রচনা করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে। রামরাম বসু অপর দুইজন ব্রাহ্মণের

১। C. B. Lewis : The Life of John Thomas, Surgeon of the Earl of Oxford East Indiaman and first Baptist Missionary to Bengal : London, 1873, p. 111-2.

সহিত ধর্মযাজক পাঠাইবার জন্য বিলাতে আবেদন করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে টমাস বিলাতের কেটারিঙে কেরীকে ইহা পড়িয়া শুনান।

কিন্তু রামরাম বসু শেষপর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। তিনি নিজের বিশ্বাস অপেক্ষা নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন বেশী। তিনি খ্রীষ্টান হইবেন—এইরূপ ধারণা মিশনরীদের মনে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। তবে খ্রীষ্টতত্ত্বের সহিত সুষ্ঠুভাবে পরিচিত হইবার ফলে তিনি হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন,—

"He (Ram Basoo) had a clearer perception of the truths of Christianity than any other native at the time, and he regarded the popular superstitions of the country with philosophical contempt, but he did not possess sufficient resolution to renounce his family connections, and avow himself a Christian".[১]

যদিও রামরাম বসু পরিবার, পরিজন ও স্বধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের নৈতিক অধঃপতনের কালিমা তাঁহাকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জন টমাস ইংলণ্ড হইতে পুনরায় এদেশে আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন উইলিয়ম কেরী। রামরাম বসু তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং কেরী তাঁহাকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্শী নিযুক্ত করিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে টমাস মহীপালদীঘির নীলকুঠীতে এবং ঐ বৎসরের জুন মাসের ১৫ই তারিখে কেরী মদনাবাটীর নীলকুঠীতে উপস্থিত হন। রামরাম বসু কেরীর সঙ্গে যান এবং তাঁহাকে বাইবেলের বঙ্গানুবাদে সাহায্য করেন। কিন্তু শীঘ্রই রামরাম বসুর ব্যভিচারের কথা প্রচারিত হইলে কেরী ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সংবাদে টমাস ও কেরী উভয়েই খুব মর্মাহত হইয়াছিলেন।

১। John Clark Marshman : The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I : London, 1859, p. 132.

"Of India's own sons Carey had hoped that Ram Ram Basu could be the first to desire and dare baptism. Alas! in the summer of 1796 he was proven guilty of adultery and of embezzlement. Heart broken, Carey wrote to Pearce: 'It appeared as if all was sunk and gone'."[১]

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইলে মে মাসের শেষাশেষি রামরাম বসু আসিয়া কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেরী রামরাম বসুর পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে নিযুক্ত করেন।

এই সময় এ দেশে খ্রীষ্টের মহিমা প্রচার-কল্পে মিশনরীগণ তিনটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পন্থা তিনটি হইতেছে :—(১) সুসমাচার প্রচার, (২) ভারতীয় ভাষায় ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ ও বিতরণ এবং (৩) শিক্ষা-বিস্তার।

ধর্মশাস্ত্র-অনুবাদের কার্যে তিনি মিশনরীদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত তিনি একাধিক পুস্তিকা ও গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তিকা ও গানের বহুল প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন উঠিয়াছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু কেরীর অনুরোধে 'হরকরা' (গসপেল মেসেঞ্জার) নামে ১০০ পংক্তির একটি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। ঐ বৎসরের শেষাশেষি তিনি 'জ্ঞানোদয়' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এ বিষয়ে মার্শম্যান লিখিয়াছেন,

"At the request of Mr. Carey, he compiled a religious tract, the first which had ever appeared, called the 'Gospel Messenger', which was intended to introduce the doctrines of the Gospel to his fellow-countrymen. At the same time he composed another pamphlet in which he exposed the absurdities of Hindooism and the pretensions of its priesthood with great severity. Large editions of these papers

---

১। S. Pearce Carey: William Carey: London, 1934, 8th edition, p. 172.

were printed and circulated, and produced no little sensation in the native community."[১]

এই 'জ্ঞানোদয়' গ্রন্থে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ ছিল। এস. ফাউন্টেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর সোসাইটিকে যে পত্র লেখেন, তাহার একস্থানে লিখিয়াছিলেন,

"We have another piece nearly ready, written by a native (Ram Boshu), exposing the folly and danger of the Hindu system. This is peculiarly pointed against Brahmunism, something like those thundering addresses against the idle, corrupt, and ignorant clergy of the Church of Rome, at the commencement of the reformation."[২]

খ্রীষ্টমহিমা-প্রচারে রামরাম বসু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা হন। তিনি রামরাম বসুকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু দুইটি খ্রীষ্টসঙ্গীত বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ডের অনুরোধে 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' নামে একখানি খ্রীষ্ট-চরিত লিখিয়াছিলেন। পুস্তকটি সম্ভবত ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী পাইয়া তিনি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'লিপিমালা' রচনা করেন। 'লিপিমালা'র পত্রগুলির মধ্যে যে সকল কাহিনী বা বিবরণ পাই, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপকাহিনী, গোরা-গৌরাঙ্গের উপাখ্যান, বাইবেলের অনুবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকদিগের কথা, বারাণসীর বর্ণনা ও শিবসতী-কাহিনী। খ্রীষ্টতত্ত্বের সহিত ভালভাবে পরিচিত হইবার ফলে তিনি হিন্দু-একেশ্বরবাদকে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'লিপিমালা' পুস্তকের ভূমিকায় আছে, "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা জ্ঞানদ

১। John Clark Marshman : The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I : London, 1859, p. 132.

২। Eustace Carey : Memoir of William Carey : London, 1836, p. 403.

সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে…”[১]

‘লিপিমালা’য় এক রাজা কর্তৃক অন্য রাজাকে তাহার পত্রের উত্তরে লিখিত এক পত্রে খ্রীষ্টের মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে। ঐ পত্রের একস্থানে রাজা লিখিতেছেন,

“…এখানেও পূর্বে প্রতিমাপূজা এবং যাগযজ্ঞ দান ধ্যান ইত্যাদি একই মত ছিল পরে খ্রীষ্ট বিবরণ মঙ্গল সমাচার আগমনে সমস্ত অনিত্য প্রবঞ্চ শাস্ত্র লোপাপত্য হইয়া এখন এদেশে য়েশু বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে…”[২]

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট রামরাম বসুর মৃত্যু হয়। নিজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করিলেও খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচারে তাঁহার দান মিশনরীগণ স্বীকার করিয়াছেন,

“But like those who assisted in the construction of the ark, and yet obtained no asylum in it, Ram-basoo, though he contributed largely to the introduction of Christian truth into the country, never himself sought refuge in the doctrines of the Gospel”.[৩]

শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ শ্রীরামপুর, কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামসমূহে সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক পরিশ্রম করিতেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বাঙ্গালীদের মধ্যে কৃষ্ণ পাল নামে এক ছুতার সর্বপ্রথম স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণপালের শ্যালিকা জয়মণি অবগাহিত (ধর্মান্তরিত) হয়। জয়মণিই বাঙ্গালা মণ্ডলীর প্রথম মহিলা সভ্য।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের সংখ্যা হইয়াছিল ৩০০ জন। তন্মধ্যে ১০৫ জন ঐ বৎসরের মধ্যে অবগাহিত হয়।

ক্রমে হিন্দু সমাজের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয় এবং নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারে যে কেবল হিন্দু

১। Ram Ram Bashoo : Lippi Mala : Serampore, 1802, p. 3.

২। ঐ p. 66.

৩। John Clark Marshman : The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I : London, 1859, p. 132.

ও মুসলমানেরা বাধা দিত তাহাই নহে, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে বাণিজ্য ও শাসনাধিকার লাভের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলাতের পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করিলে উইলবারফোর্স মিশনের পক্ষে বক্তৃতা দেন। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলিও লর্ডসভায় মিশনের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। অবশেষে সনদ দিবার সময় স্থির হয় যে, ভারতে প্রজাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাহাদের ধর্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আইন দ্বারা যথোপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা দান করিতে হইবে। মিশনের কার্যে কোম্পানীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ এতদিনে শেষ হইল।

ইহার পর এদেশে মিশনের কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়ুস্টাস কেরী, ইয়েটস, মিঃ পিয়ার্স প্রভৃতি এদেশে আগমন করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৪২০ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা এক হাজারেরও অধিক হয়।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সাটক্লিফ এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে য়্যান্ড্রু ফুলারের মৃত্যুতে মিশনের কার্যের খুব ক্ষতি হয়।

শীঘ্রই বিলাতের হোম কমিটির সহিত শ্রীরামপুর মিশনের নানা বিষয়ে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির সহিত শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে পুনরায় সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় ভাষায় ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ ও বিতরণ মিশনরীদের অন্যতম কার্য ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচারে রামরাম বসুর প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ডাঃ কেরী এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয় ও আসামী ভাষায় সমস্ত বাইবেল এবং পাঞ্জাবী, পস্ত, কাশ্মিরী, কঙ্কণী, তেলেগু প্রভৃতি উনিশটি ভাষায় বাইবেলের অধিকাংশ পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। মার্শম্যান সর্বপ্রথম চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে 'Gospel of St. Mathew' অংশ মূল গ্রীক হইতে অনূদিত হইয়া 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামে প্রকাশিত হয়।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'ওল্ড টেস্টামেণ্টের' 'The Pentateuch' অংশ, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'Job, Song of Solomon', ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'Isaiah—Malachi', এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'Joshua—Esther' মুদ্রিত হয়। কেরীর মৃত্যুর পূর্বে বাঙ্গালা বাইবেলের অষ্টম সংস্করণ এবং ৩৪টি ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল অথবা বাইবেলের অংশ অনূদিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের জন্য শুধু বাইবেলের অনুবাদই নহে, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী হিসাবে উইলিয়ম কেরীর মধ্যে ধর্মের যে সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা-কালে তাঁহার মধ্য হইতে সেই সঙ্কীর্ণতা বহুপরিমাণে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। অখ্রীষ্টান সমাজে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের ব্রত লইয়া কেরী এদেশে আসিলেও শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের কার্যে তিনি অন্য সকল প্রেরণা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা হইয়া তিনি এদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচনা করান। কেরী নিজে ইংরেজীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ-১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্কলন করেন।

শুধু পুস্তকই নহে, শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ সাময়িক পত্রও প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন হইতে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত 'দিগ্‌দর্শন' নামে মাসিক পত্র জন্মলাভ করে। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার সম্পাদনা করিতেন। ইহার পর মিশন হইতে 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহারও সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়।

'সমাচার দর্পণে'র উদ্দেশ্য ও প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি প্রথম সংখ্যায় ছিল, তাহাতে ধর্মপ্রচারের কোন প্রকাশ্য ইঙ্গিত ছিল না। কিন্তু প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি 'প্রেরিত পত্র' প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তিহীনতা ও কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ ছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চের 'সমাচার দর্পণে' বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত পত্রে বৈষ্ণবদের কুৎসিতভাবে

আক্রমণ করা হইয়াছে।[১] ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চের 'সমাচার দর্পণে' একটি প্রেরিত পত্রে ঘটকের মিথ্যাচার এবং কৌলীন্যপ্রথার ভয়াবহ পরিণামের একটি ঘটনা বর্ণিত আছে।[২]

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে B. A. M. S. অর্থাৎ Baptist Auxiliary Missionary Society কর্তৃক খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্র 'গস্‌পেল ম্যাগাজীন' প্রকাশিত হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি' নামে খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিষয়ক দ্বিতীয় মাসিক পত্র শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়া মিশনরীরা এদেশে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন —একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কেরী তাঁহার সহকর্মীদের সহযোগিতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বালকদের শিক্ষার জন্য প্রথম অবৈতনিক দৈনিক স্কুল এবং তাহাদের ধর্মশিক্ষার জন্য ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মধ্যে প্রথম সাণ্ডে স্কুল স্থাপন করেন। দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের কন্যাগণ শ্রীরামপুরের বিভিন্নাংশে কয়েকটি অবৈতনিক দৈনিক স্কুল স্থাপন করিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ১০,০০০ শিশু শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনে শিক্ষালাভ করিতেছিল।[৩]

এই মিশনরী স্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্কুলগুলিকে সুনজরে দেখিত না। তাহাদের স্কুলে যে সকল শিশু অধ্যয়ন করিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ফিরিঙ্গি, অনাথ অথবা সমাজচ্যুত। মিশনরীরা স্কুলে ধর্মশিক্ষা দিত এবং স্কুলগুলি সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল। এই সকল স্কুলে অত্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। কিছু ইংরেজী শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইত। কেরী, ওয়ার্ড, ব্রাণ্ডেন, গ্রাণ্ট এবং মার্শম্যানের মত মনীষীদের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর স্কুল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই স্কুলগুলিতে ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক গ্রন্থগুলি পড়ানো হইত।

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড তৃতীয় সং: কলিকাতা ১৯৪৯: পৃ ১২৪

২। ঐ : পৃ ১২৬

৩। F. W. Thomas: The History and Prospects of British Education in India: Cambridge University, 1891, p. 19.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করেন যে, এশিয়া মহাদেশের খ্রীষ্টান ও অন্যান্য তরুণ বয়স্কদের প্রাচ্য সাহিত্য এবং ইউরোপীয় দর্শনে শিক্ষা প্রদানার্থ তাঁহারা একটি কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংস কলেজের প্রথম পেট্রন, ডেনিশ গভর্নর কর্ণেল বাই প্রথম গভর্নর এবং কেরী প্রথম প্রিন্সিপাল হন। এই কলেজের শিক্ষার দ্বারা মিশনরীগণ ভারতীয় খ্রীষ্টানদিগকে জ্ঞানে ও গুণে বিশেষ উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন, কেননা তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভারতীয় খ্রীষ্টানদের দ্বারাই ভারতের পরিত্রাণ হইবে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটি ডেনিশ রয়াল চার্টারের অন্তর্ভুক্ত হয়, কেননা শ্রীরামপুর তখন ডেনদের অধিকারে ছিল। এই সনদে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদালাভ করে।

শ্রীরামপুর ছাড়া ব্যাপটিস্ট মিশনরীদের কার্য বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জে. লসন প্রভৃতি মিশনরীগণ শ্রীরামপুর মিশনের অনুকরণে কলিকাতায় একটি মিশন ও প্রেস স্থাপন করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জে. ইয়েটস্ কর্তৃক একটি বাইবেল ট্রেনিং স্কুল লোয়ার সার্কুলার রোডে খোলা হয়।

মিঃ লেনার্ডের উৎসাহে দরিদ্র বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বেনেভলেণ্ট ইনস্টিটিউশন নামে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদের ফলে এদেশে মিশনরীদের শিক্ষা ও ধর্মবিস্তারের বাধা দূরীভূত হইলে চার্চ অব ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রধানত উইলবারফোর্সের প্রচেষ্টায় মিশনরীগণের সুবিধা-সুযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলিকাতায় একজন বিশপ এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের জন্য একজন করিয়া আর্চডিকনের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার প্রথম বিশপ ডাঃ মিডিলটন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর ভারতবর্ষে আগমন করেন।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরস্থ সাহেবদের দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য শ্রীরামপুরের টোল স্থাপিত হয়। শীঘ্রই ঐ টোল কলেজে রূপান্তরিত হয়। ইংলণ্ডের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ লর্ড বিশপ সাহেবের নামে কলিকাতার পশ্চিমপারে বিশপ্স কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ডাঃ মিডলটনের প্রচেষ্টায় ১৮২০

খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কলেজের শিক্ষাদানের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই।

পাদ্রী রবার্ট মে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বেল-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য চুঁচুড়ায় নিজ বসতবাটীতে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরেজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল।[১] ক্যাপ্টেন জেমস স্টুয়ার্ট এক বৎসরের মধ্যেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে দশটি পাঠশালা স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা শাখা এই পাঠশালাগুলি পরিচালনা করিতেন। ঐ সোসাইটির কলিকাতা শাখা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী স্থাপিত হইয়াছিল।

মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়াও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি মিসেস পীয়ার্স এবং মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল আটটি।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ মিশনরী সোসাইটির আনুকূল্যে লেডিস সোসাইটি স্থাপিত হয়। ঐ লেডিস সোসাইটির সভ্যদের দ্বারা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণে সিমুলিয়ায় সেণ্ট্রাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায় কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়।

শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীগণ অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সকল বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতির সহিত বাইবেল ও খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকসমূহ পড়ান হইত। পাদ্রীরা বুঝিয়াছিলেন, এদেশে খ্রীষ্টতত্ত্ব বদ্ধমূল করিতে হইলে শিক্ষাবিস্তারের সূত্রে মাতাকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করিয়াছেন স্কটল্যাণ্ডের মিশন। পোর্তুগীজ মিশনরীদের কোন

১। রাজনারায়ণ বসু : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত : কলিকাতা ১৮৭৫ : পৃ ১৯

উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ এই সময় দৃষ্ট হয় না। ব্যাপটিস্ট মিশনরী ও চার্চ অব ইংলণ্ডের মিশনরীগণের কর্মতৎপরতা পূর্বের মত তীব্র ছিল না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির সহিত শ্রীরামপুর মিশনের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। সৌভাগ্যক্রমে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির ও মিশনের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্নমেণ্ট কেরীকে মাসিক পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা পেন্সন দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে কেরীর মৃত্যু হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ডাঃ মার্শম্যানের মৃত্যুর পরে মিঃ জন ম্যাক ও মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের উপরে শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর কলেজের ভার ন্যস্ত হয়। মিঃ জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান বহু বৎসর 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন কেরী এবং জোশুয়া ম্যার্শম্যান ও ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিরকালের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টেটসম্যানে'র সহিত যুক্ত হয়। এই পত্র সতীদাহপ্রথা, ঠগীদের কার্যকলাপ প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রবল জনমত গঠনে সচেষ্ট ছিল।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। লসন ও ইয়েট্স প্রভৃতি মিশনরীগণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর প্রেস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে দুইটি প্রেস একটি প্রেসে পরিণত হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী, সংস্কৃত ও আর্মেনিয়ান ভাষায় নূতন নিয়ম মুদ্রিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১,৫১,০০০ খণ্ড বাইবেলের অংশ বিতরিত হয়।[১]

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জে. রবিনসনের সম্পাদকত্বে 'The Evangelist' 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' নামে মাসিকপত্র বাহির হয়। ইহা ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্র শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক (ব্যাপটিস্ট) মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল এবং যীশুখ্রীষ্ট-বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করা এই পত্রের অভিপ্রায় ছিল।

১। ক্ষিতীশচন্দ্র দাস : বঙ্গে যীশুর বিজয় যাত্রা : কলিকাতা ১৯৪২ : পৃ ২৪

'মঙ্গলোপাখ্যান পত্রে'র অভাব দূরীকরণের জন্য ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গারের সম্পাদনায় 'উপদেশক' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্র চলিয়াছিল। এই সময় সম্পাদক স্বদেশে গমন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় এই পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা লুপ্ত হয়।

চার্চ অব ইংলণ্ডের কতকগুলি সাংগঠনিক পরিবর্তন এই যুগে হইয়াছিল। ইহাতে ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। বিশপ টার্নারের পর ভারতবর্ষের প্রথম ধর্মাধ্যক্ষ (Metropolitan) নিযুক্ত হন ডানিয়েল উইলসন (Daniel Wilson)। ইহার কার্যকাল ছিল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের (Charter) নূতনীকরণ (renewal) হয়। এই সনদের ফলে এদেশে চার্চ অব ইংলণ্ডের সংগঠনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনে উইলসন আনন্দিত হইয়াছিলেন।

"This Bill was a source of great joy to Bishop Wilson, as it empowered His Majesty to divide the Dioscese of Calcutta, to erect Calcutta into a Metropolitan See, and to appoint two Suffragan Bishops, one for Madras and another for Bombay. The Bill passed through Parliament on August 21, 1833, and reached India at the close of the year."[১]

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল আর একটি অ্যাক্ট পাশ হয়। ইহার ফলে কোনো হিন্দু অথবা মুসলমান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে পূর্বের মত উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণ রহিল না। উইলসন এ ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

"The Bishop in his diary speaks of this day as being 'as memorable a day as December 4, 1829, when Lord William Bentinck abolished the rite of Sati'."[২]

১। Eyre Chatterton : A History of the Church of England in India since the Early Days of the East India Company : London 1924 : p. 162

২। Ibid, p. 179.

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ধর্মাধ্যক্ষ জর্জ এডওয়ার্ড লিঞ্চ কটন (George Edward Lynch Cotton) এবং তাঁহার কার্যকাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

এই যুগে ডাঃ ডফের নেতৃত্বে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের আন্দোলনে নূতন উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। ডফের সকল কর্মের প্রেরণা ছিল গোঁড়া পাদ্রী মনোভাব। ডফ এদেশে আসিয়া একটি স্কুল স্থাপনের জন্য প্রথমে রামমোহন রায়ের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। রামমোহন চিৎপুর রোডের উপরে তাঁহার ব্রহ্ম সভা ভবনের একটি ঘর সামান্য ভাড়ায় ডফকে ছাড়িয়া দেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই এই স্কুল প্রথম খোলা হয় এবং রামমোহন ছাত্রসংগ্রহে সাহায্য করেন। এই স্কুলটি শীঘ্রই জেনারেল এসেমব্লিস ইনস্টিটিউশন নামে খ্যাত হয়।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব পার্শ্বে বর্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে এসটাবলিশড চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে বিভেদ উপস্থিত হইলে ও ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের সৃষ্টি হইলে ডফ ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হইলে পর এই কলেজটি ডফ কলেজ নামে আখ্যাত হয়। এইখানে ইংরেজী শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত।

চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কলিকাতায় ফ্রি চার্চ নামে যে সঙ্গত সভা গঠিত হয় ডফ ও ম্যাকডোনাল্ড তাহার সহিত গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ম্যাকডোনাল্ডের সম্পাদনায় 'দি ফ্রি চার্চ ম্যান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই সময় ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক ভয়াবহ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাঁহার শিক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্য বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ছাত্রদের হিউমের রচনা এবং টম পেইনের (Tom Paine) 'এজ অব রিজন' পড়িতে বলিতেন। ডফের জীবনীকার জর্জ স্মিথ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

'Outside of the classes, but constantly referred to by the teachers, the favourite book was Paine's coarse "Age

of Reason", which a respectable deist would not now mention save as a warning. That book, his bitter reply to Burke, his "Rights of Man", and his minor pieces born of the filth of the worst period of the French Revolution, an American publisher issued in a cheap octavo edition of a thousand copies, and shipped the whole to the Calcutta market ; such was the notoriety of the anti-Christian success of the College which Rammohun Roy was ashamed to patronise.'[১]

ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ পৈতা ত্যাগ করিলেন, ইলিয়ডের লাইন তাঁহাদের উৎসবের মন্ত্র হইল। এই অবস্থাকে স্মিথ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

'In May, 1829, the teaching of a Eurasian of some genius and much conceit, named Derozio, had begun to undermine the faith of the students of the Hindoo College in "all religious principles whatever," as even its secularist managers expressed it. ......Young Brahmans refused to be guilty of the hypocrisy of submitting to investment with the poita, or sevenfold Brahmanical cord ; many substituted favourite lines of Pope's "Iliad" for their daily and festival prayers.'[২]

হিন্দু কলেজে ধর্মশিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে তাঁহার ছাত্রেরা হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু পাইতেছিলেন না যাহা কি না বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই তাঁহাদের নাস্তিক্য-বুদ্ধি জন্মের কারণ। ডফ লিখিয়াছেন,

১। George Smith : The Life of Alexander Duff, Vol. I : London 1879 : pp. 144-5.

২। George Smith : The Life of Alexander Duff, Vol. I : London 1879 : p. 143.

"That Institution, as has already been repeatedly remarked, is the very beau-ideal of a system of education without religion. It communicates largely European literature and science ; but, as far as its regulations extend, neither within nor without its walls will it tolerate the impartation of religious truth. Now, the citadel of Hinduism being, from the base to its highest pinnacle, a citadel of error, it can never resist a vigorous onset of true knowledge, however secular. Accordingly their ancestral faith was completely sub-verted in the minds of the more advanced alumni of the Government College, but nothing better was attempted or allowed to be substituted in its room. Many had become, or were rapidly becoming, sceptics ; and others direct atheists."[১]

এই ক্রমবর্ধমান সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে হিন্দু কলেজের প্রায় ঠিক অপর দিকে কলেজ স্কোয়ারে ডফ তাঁহার নিজের বাড়ীতে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন।

মিস্টার হিল কর্তৃক সত্যানুসন্ধানে প্রয়োজনীয় নৈতিক গুণাবলীর বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা এই বক্তৃতাবলীর সূচনা হয়। খ্রীষ্টধর্মের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রমাণের বিষয়ে ডফ প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাবলীর শেষ বক্তৃতা দিয়াছিলেন টমাস ডিয়ালট্রি। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল খ্রীষ্টতত্ত্ব। ডিয়ালট্রি (১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ) সেই সময় ওল্ড মিশনরী সোসাইটির ধর্মযাজক ছিলেন। পরবর্তীকালে (ডনিয়েল কোরির পরে) ইনিই কলিকাতার প্রধান ধর্মাচার্য হন।

ডেভিড হেয়ার গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন না। তিনি মিশনরীদের কার্যকলাপে আতঙ্কিত হইলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ একটি সভায় মিলিত

১। Alexander Duff : India and India Mission, 2nd Ed. : Edinburgh 1840 : Appendix, p. 632.

হইয়া স্থির করিলেন যে, রাজনৈতিক অথবা ধর্মনৈতিক সমিতিতে কোন ছাত্র যোগদান করিলে তাহাকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে।

এই ব্যবস্থায় কিছুকালের জন্য উত্তেজনা হ্রাস পাইল এবং মিশনরীরা বক্তৃতার ব্যবস্থা বন্ধ করিলেন। কিন্তু আবার ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। পঁচিশ জন ছাত্রকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হইল। ১৬০ জন ছাত্রকে সন্দিগ্ধ অভিভাবক কলেজ যাইতে নিষেধ করিলেন। কলেজের পরিচালক কমিটির সদস্য রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ব্যক্তির চেষ্টায় ডিরোজিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

ডফের সফলতার মূলে ডিরোজিওর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। বলিতে গেলে ডিরোজিওর আরব্ধ কার্যকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা অনেক পরিমাণে আগাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তদানীন্তন পরিবেশ অনেক পরিমাণে ডফের অনুকূল ছিল। এ সম্বন্ধে ডফ বলিয়াছেন,

"......we rejoiced, in June 1830, when, in the metropolis of British India, we fairly came in contact with a rising body of natives, who had learnt to think and to discuss all subjects with unshackled freedom—though that freedom was ever apt to degenerate into license in attempting to demolish the claims and pretensions of the Christian, as well as every other professedly revealed faith. We hailed the circumstance, as indicating the approach of a period for which we had waited, and longed, and prayed."[১]

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, কেবলমাত্র ডিরোজিওর শিক্ষা নহে, সাধারণভাবেই ইংরেজী শিক্ষা তরুণ যুবকদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হইয়াছিল এবং ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া লর্ড মেকলে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করিয়াছেন।

ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া ইংরেজী শিক্ষাকে পাকাপোক্ত

১। Alexander Duff: India and India Mission, 2nd Ed.; Edinburgh 1840: Appendix, p. 631-2.

ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই যে এদেশের জনসাধারণ কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই, ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা যে স্বাভাবিকভাবে সাধিত হইবে, তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর কলিকাতা হইতে পিতাকে লিখিত এক পত্রে মেকলে লেখেন,

"The effect of this education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo, who has received an English education, ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy ; but many profess themselves pure Deists, and some embrace Christianity. It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without any efforts to proselytise ; without the smallest interference with religious liberty ; merely by the natural operation of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the prospect."[১]

সুতরাং তদানীন্তন পরিবেশ যে ডফকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল এ কথা মনে রাখিতে হইবে। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডফের প্রভাব বিস্তৃত হইল। ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁহার বন্ধুদের দ্বারা গোমাংস ভক্ষণ এবং তাহাদের দ্বারা হাড়গুলি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপরাধে তিনি সমাজচ্যুত হইয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে ডফ তাঁহাকে সাহায্য করিলেন এবং তাঁহার প্রভাবে কৃষ্ণমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পূর্বে মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ডফের কার্যে মিস্টার ম্যাকে (Mackay) খুব সহায়তা করেন। ম্যাকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে

১। George Otto Trevelyan : The Life and Letters of Lord Macaulay, new edition, Vol. I : London 1895 : p. 464.

মাসে তাঁহার সহিত যোগ দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থ হইয়া পড়ায় ডফ সস্ত্রীক ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ডফ আবার এদেশে ফিরিয়া আসেন। ডফ কাজ চালাইবার মত বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বাইবেল সোসাইটির এবং ট্র্যাক্ট সোসাইটির সভায় তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেন। ডফ প্রথম হইতেই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন জে. ডবলিউ. কেয়ে (J. W. Kaye) এবং ইহার প্রথম সংখ্যা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় ডাঃ ডফ 'Our Earliest Protestant Mission to India' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁহার 'Female Infanticide in Central and Western India' প্রকাশিত হয়। কেয়ে অসুস্থ হইয়া ভারত ত্যাগ করিলে তৃতীয় সংখ্যা হইতে পত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব ডাঃ ডফ, ডাঃ স্মিথ এবং শ্রীরামপুরের জন. সি. মার্শম্যানের উপর পড়ে। তবে তিনি মুখ্যত সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ত্যাগের সময় পর্যন্ত ডফ এই পত্রের সম্পাদনা করিয়াছিলেন।[১]

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন সোসাইটির মিশনরীদের লইয়া একটি মাসিক সভা গঠিত হয়। ইহা ক্রমে কলিকাতা মিশনরী কনফারেন্স নামে পরিচিত হয়। প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে সভা বসিত। এই সোসাইটি সৃষ্টির বিশেষ কৃতিত্ব ডাঃ ডফের।[২] যখন ডাঃ স্মিথ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কনফারেন্সে যোগদান করেন, তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ। এই কনফারেন্সের মুখপাত্র হিসাবে 'কলিকাতা খ্রীষ্টিয়ান অবজার্ভার' নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ডাঃ ডফ ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। অবজার্ভারে খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্ব ও খ্রীষ্টানদের নানা সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এই সময় এপিসকোপালিয়নদের (Episcopalians) 'The Calcutta Christian Intelligencer' নামক পত্রিকা ছিল।

মহেন্দ্রলাল বসাক এবং কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ডফ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র তেরটি যুবককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

১। Thomas Smith : Alexander Duff : London 1883 : p. 88.
২। ঐ ঐ ঐ : p. 82.

ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালবিহারী দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডফ স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন। মিশনরীদের স্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত কতকগুলি ছোট স্কুল খোলা হয়। ইহা ব্যতীত কতকগুলি অনাথ আশ্রম এবং স্ত্রীলোকদের বোর্ডিং স্কুলও স্থাপিত হইয়াছিল।

এদেশবাসীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ডফের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং পূর্ববর্তী মিশনরীদের মত তিনি তিনটি পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার তিনটি পথ সম্বন্ধে ডফ লিখিয়াছেন,

"What, then, with a special reference to India, is the great object which, as Christian philanthropists, we ought ever to avow? The grand ultimate object we ought unceasingly to avow is,—the intellectual, moral, and spiritual regeneration of the universal mind;—or, in the speediest and most effectual manner, the reaching and vitally imbuing the entire body of the people with the leaven of Gospel truth.……Looking at the history of the past, we may say, that by common consent, there are three generic modes of applying it. There is, first, the preaching of the Gospel to adults; secondly, the teaching of it to the young; and, thirdly, the translation and circulation of the Bible and other religious works."[১]

ডফের কাছে হিন্দুধর্ম মিথ্যা ধর্ম বলিয়া মনে হইয়াছে। তবে ইহার বিস্তৃতি ও অসংখ্য শাখাপ্রশাখার জন্য ইহাকে ডফ সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক বৃহৎ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি ঢুকিয়াছে বলিয়া ইহাকে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট রূপ বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"Of all the systems of false religion ever fabricated by the perverse ingenuity of fallen man, Hinduism is surely

১। Alexander Duff: India and India Missions: p. 308-9.

the most stupendous—whether we consider the boundless extent of its range, or the boundless multiplicity of its component parts. Of all systems of false religion it is that which seems to embody the largest amount and variety of semblances and counterfeits of divinely revealed facts and doctrines. In this respect it appears to hold the same relation to the primitive patriarchal faith, that Roman Catholicism does to the primitive apostolic faith. It is, in fact, the Popery of primitive patriarchal Christianity."[১]

ডফের অপেক্ষা গোঁড়া পাদ্রী মিশনরী খুব কমই দেখা যায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ডফ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা এদেশে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) অন্যতম। কৃষ্ণমোহন ইয়ং বেঙ্গলের নেতা। অন্যায়ভাবে সমাজচ্যুত হওয়ার জন্য কৃষ্ণমোহন চিরকাল হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন।

ডিরোজিওর প্রধান আঠার জনের অধিক শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন অগ্রণী। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হিন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ারের স্কুলের (স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের) সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন।

কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েশনের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। ইহার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও এবং সম্পাদক ছিলেন উমাচাঁদ বসু। বলিতে গেলে কৃষ্ণমোহন কলিকাতার প্রগতিশীল দলের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদের পবিত্র ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা পোপ ড্রাইডেনের কাব্যকে অধিক শ্রদ্ধা করিতেন। হিন্দুধর্মের সংস্কার বিসর্জন দিয়া তিনি ডিরোজিওর গৃহে পানাহার করিতেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগস্ট কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বন্ধুরা কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে গোমাংস আহার করিয়া হাড়গুলি পার্শ্ববর্তী নিষ্ঠাবান হিন্দুদ্বয় ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তীর

১। Alexander Duff: India and India Missions: p. 204.

গৃহে নিক্ষেপ করেন। এই অপরাধে কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহন কর্তৃক কৃষ্ণমোহন গৃহ হইতে বিতাড়িত হন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অগস্টের 'এনকোয়ারারে' সংবাদ বাহির হয় যে, কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার পর ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন ডফ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে 'রিফর্মারে'র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কৃষ্ণমোহন 'এনকোয়ারার' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'রিফর্মার' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'এনকোয়ারার' ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্রে কৃষ্ণমোহন হিন্দুধর্মকে নানাভাবে বিদ্রূপ করিতেন।

কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া ডফের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং ডফ ও ডিয়ালট্রির বাসায় গিয়া তর্কবিতর্ক করিতেন। এই সময় তিনি 'পারসিকিউটেড' (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখেন। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু সমাজের নানা দোষ দর্শাইয়াছিলেন। এই "The Persecuted or Dramatic Scenes, Illustrative of the present State of Hindoo Society, in Calcutta"—গ্রন্থের ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন লেখেন,

"The inconsistencies and the blackness of the influential members of the Hindoo Community have been depicted before their eyes. They will now clearly perceive the wiles and tricks of the Brahmins and thereby be able to guard themselves against them."

এখানে কৃষ্ণমোহন 'rising generation'-কে সতর্ক করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার খ্রীষ্টপরায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. এইচ. পেটনের সাহায্যে কৃষ্ণমোহন তাঁহার স্ত্রী বিন্দুবাসিনীকে তদীয় মাতাপিতার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন এবং বৎসর খানেকের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করান। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন বিশপ কলেজের সংলগ্ন বেগম সমরুর গীর্জায় পাদ্রী হন। মহেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু-উপলক্ষে তিনি সর্বপ্রথম আচার্যের কার্য করেন এবং এই রাত্রেই

তিনি যদুনাথ ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহন তাঁহার দ্বারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের জন্য হেদুয়ার কোণে এক ভজনালয় নির্মাণ করা হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর এই ক্রাইস্ট চার্চের দ্বার উন্মোচন করা হয় এবং কৃষ্ণমোহন তাহার ভারপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে তাঁহার প্রভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টান হইয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণমোহনের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করিলেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলিতেন, 'I am a Brahmin Christian.'[১]

ডফ কর্তৃক দীক্ষিত হইলেও কৃষ্ণমোহন স্কচচার্চের অনুবর্তী না হইয়া চার্চ অব ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হন। ডফের গৃহে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমোহন কয়েক মাস প্রতি রবিবার সকালে সাধারণত পুরাতন গীর্জায় (ইংলিশ চার্চ) ও সেণ্ট এণ্ড্রুজ গীর্জায় (স্কচ চার্চ) সন্ধ্যাকালে উপাসনায় যোগদান করিতেন। শীঘ্রই স্কচ চার্চে যাওয়া বন্ধ করিয়া তিনি চার্চ অব ইংলণ্ডের সভ্য হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের কয়েকজন যুবকের একই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া খ্রীষ্টান চার্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সোসাইটির সেক্রেটারী আর্কডিকন ডিয়ালট্রি পদত্যাগ করেন এবং কৃষ্ণমোহনকেও কর্ম হইতে অপসারিত করা হয়। হিন্দুধর্ম-বহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য হেয়ার কর্তৃক পটলডাঙ্গা স্কুল হইতে অপসারিত হইয়া কৃষ্ণমোহন চার্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা কমিটি কর্তৃক ইংরেজী স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদলাভ করিয়া এই সময় খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার করিতেছিলেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত হইয়া ডিয়ালট্রির সহায়তায় কৃষ্ণমোহন বিশপ কলেজে একটি বৃত্তিলাভ করিয়া কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ কলেজের বেগম সমরুর গীর্জায় পাদ্রী হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হেদুয়ার কাছে ক্রাইস্ট চার্চের আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ইহার পর বিশপ কলেজের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা ত্যাগ করেন।

---

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত ঃ পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়) ঃ কলিকাতা ১৯২৩ ঃ পৃ ৩৬

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন হিন্দু ষড়্‌দর্শন বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে কৃষ্ণমোহনের ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে এবং হিন্দুধর্মের এক নূতন ব্যাখ্যা দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

'ষড়্‌দর্শন সংবাদ' গ্রন্থে কৃষ্ণমোহন বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া একেবারেই স্বীকার করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি চারিটি প্রশ্ন[১] তুলিয়াছেন,—

১ শ্রুতি মধ্যে অনিত্য ব্যাপারের উল্লেখ থাকাতে বেদ কিরূপে নিত্য হইতে পারে?

২ বেদের নিত্যতার অথবা ব্রহ্মযোনিত্বের প্রমাণ কি?

৩ বেদ কিম্ভূত পদার্থ?

৪ বেদের মধ্যে স্বকীয় পরিচয়বাক্য কি প্রকার আছে?

তাঁহার মতে বেদ "স্নুবর্ণাভাস মিথ্যা মূদ্রা" এবং বাইবেলই "বিমলা সুবর্ণময়ী যথার্থ রাজমুদ্রা"।

"সত্যকাম। সত্যমুদ্রা বাইবেল শাস্ত্র। উহার এমত নিরপেক্ষ প্রমাণ আছে যদ্দারা উহার লেখকদিগের ঐশ্বরিক উপাদিষ্টতা উৎপন্ন হয়, এবং উহার তাৎপর্যও এমত উৎকৃষ্ট যে তৎসহকারে বিশুদ্ধ ধর্মের উন্নতি সম্ভবে।"[২]

শুধু তাহাই নহে কৃষ্ণমোহনের মতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্ম ও যজ্ঞেশ্বর-রূপ কল্পনাও বাইবেল হইতে লওয়া হইয়াছে। সুতরাং যে স্থানে আদ্য কল্পনা আছে, তাহাকেই আদর্শ করা উচিত।

"...যে কৃষ্ণাবতারের বিশেষ সম্প্রদায় রামানুজ ভট্টাচার্যের দ্বারা দক্ষিণ দেশে সংস্থাপিত হয় কাঞ্চীপুরে অদ্যাপি তাঁহার গদি আছে বাইবেলোক্ত যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পূর্ণ পরিচয় দক্ষিণ দেশীয় খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজের পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম এবং যজ্ঞেশ্বর কল্পনা করা খ্রীষ্টীয় উপদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে এমত অনুমান করা যাইতে পারে।"[৩]

তাঁহার মতে খ্রীষ্টীয় ধর্মের দেবত্রয় হিন্দুধর্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়াছে।

১। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ষড়্‌দর্শন সংবাদঃ কলিকাতা ১৮৬৭ঃ পৃ ৪৭৬
২। ঐ ঃ পৃ ৪৯৪-৫
৩। ঐ ঃ পৃ ৫২০

"সত্যকাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবত্রয়ের বার্তা।"[১]

কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস করিতেন যে, কৃষ্ণাবতারের শুদ্ধ পরিচয় বাইবেলে আছে। এই স্থলে ডফের সহিত তাঁহার মতের মিল দেখা যায়।

"সত্যকাম।...তিন উপাধিবিশিষ্ট এক ঈশ্বরের পরিচয় অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রেতে বিকৃত হইয়াছে উহার শুদ্ধতাবস্থা কেবল বাইবেল শাস্ত্রেতেই আছে।"[২]

কৃষ্ণমোহন তাঁহার গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন।

"...ইহাদের তাৎপর্য দুর্বোধ্য। তদীয় আদ্য গুরু রামমোহন রায় শ্রুতি-স্মৃতি সর্বশাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে তদনুচরেরা ক্রমশঃ স্মৃতি পুরাণ ব্রহ্মসূত্রাদি সমুদয় খণ্ডন করিয়া কেবল শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন সেই এক অবলম্বন আবার ত্যাগ করিয়া স্ব২ সহজ জ্ঞানকেই কেবল শিরোধার্য করিলেন।"[৩]

এখানে ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তনকে কটাক্ষ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণমোহনের ধারণায় জগতে যদি সত্য থাকে তবে তাহা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রেই আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন কৃষ্ণমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কৃষ্ণমোহনকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজনাথ ঘোষ নামক একটি অপরিণত বয়স্ক ছাত্রকে তিনি পিতৃগৃহ হইতে খ্রীষ্টান করিবার জন্য লইয়া আসেন। সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা হইলে সার্ এডওয়ার্ড রায়নের বিচারে তিনি ব্রজনাথকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় কৃষ্ণমোহন কর্তৃক একটি বালক অপহরণের সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৪] কৃষ্ণমোহনকে লোকে অবজ্ঞা করিয়া 'কেষ্টো বান্দা' বলিত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে ডিয়ালট্রির সঙ্গে যাইয়া কৃষ্ণমোহন বহুশত হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

১। ঐ : পৃ ৫২১
২। ঐ : পৃ ৫২২
৩। ঐ : পৃ ৪৬২
৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড : কলিকাতা ১৯৩৩ : পৃ ১৭৩

এদেশীয় লোকদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মিশনরীগণ অনেক সময় ছল বল কৌশলের প্রয়োগ করিতেন। কৃষ্ণমোহনের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রলোভন দেখাইয়া এদেশীয়দের খ্রীষ্টান করিবার দৃষ্টান্ত মধুসূদনের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই।

মধুসূদন দত্তর বিলাত যাইবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলিতেন যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিতেন যদি ইংলণ্ডে গমন করিতে পারিতেন। কবি হওয়ার প্রধান আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে বিলাত যাওয়ার বাসনা ইন্ধনরূপে ছিল। তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতার ছিদ্রপথ এই বিলাত যাইবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আবিষ্কার করা কঠিন হয় নাই। মধুসূদনের চরিত্রের এই ছিদ্রপথেই কৃষ্ণমোহন বিলাতগমনের সাহায্য-নিশ্চয়তার আশ্বাস-সহযোগে পরিত্রাণের শর নিক্ষেপ করেন। শীঘ্রই সরলবিশ্বাসী কবি ডিয়ালট্রি কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

বলা বাহুল্য মধুসূদনের আশা পূর্ণ হয় নাই। দুনিয়াদারীর যুদ্ধে প্রথমেই এই পরাজয়ের নির্মম অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে কবির 'আশার ছলনা' এবং 'মেঘনাদ-বধে'র করুণ সঙ্গীতের প্রেরণা জোগাইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করেন। মধুসূদন যে ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই একথা ঠিক। বস্তুত কোন ধর্ম প্রেরণাই মধুসূদনের কবিধর্মের উপরে উঠিতে পারে নাই। মধুসূদনের ধর্ম সত্যকার কবিধর্ম।

গোঁড়া মিশনরী পাদ্রীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলেও কৃষ্ণমোহন দেশের অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বাল্যবিবাহের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"The present custom of getting rid of daughters by an early marriage, before they can possibly understand the meaning of marriage, must exert a baneful influence upon their minds, and put a stop to all intellectual improvements."[১]

কৃষ্ণমোহন স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। উত্তম মাতা ও স্ত্রী হইবার

১। K. M. Banerjea : A Prize Essay on Native Female Education : Calcutta 1841 : p. 26.

এবং চরিত্রের উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য। তবে এই শিক্ষা স্ত্রীসুলভ বৃত্তি এবং সমাজ-সংস্কারে তাহাদের বিশেষ স্থান অনুযায়ী হওয়া উচিত। তিনি লিখিয়াছেন,

"Suffice it to say, that as our object in advocating the cause of their education is to turn them into better wives and better mothers, and to raise their character as moral and religious beings, we wish their instruction to be compatible with the natural delicacy of their sex, and with their particular station in society". [১]

ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ওল্ড চার্চে ডফের দ্বারা তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ডিরোজিওর শেষ অসুখের সময় শিষ্যদল পালা করিয়া মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে থাকিত। মিঃ হিল যখন ডিরোজিওকে দেখিতে আসেন তখন হিলের সহিত মহেশচন্দ্রের দেখা হইয়াছিল। তাঁহার কাছেই জানিতে পারি যে, ডিরোজিও মৃত্যুকালে হিলের নিকট তাঁহার খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের কোন ঘোষণা করেন নাই। ডিরোজিও আমৃত্যু সত্যানুসন্ধানী ছিলেন।[২]

ডফ কর্তৃক যাঁহারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন তাঁহাদের মধ্যে লালবিহারী দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে লালবিহারী দের সম্পাদনায় 'অরুণোদয়' নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্র ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্রের মঙ্গলাচরণে ছিল,

"......এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞানবার্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্যধর্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম-সূচক উপদেশ ও নানাবিধ পরমার্থঘটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে।"[৩]

১। K. M. Banerjea : A Prize Essay on Native Female Education : Calcutta 1841 : p. 93.

২। Thomas Edwards : Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher and Journalist : Calcutta 1884 : p. 125-6.

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নূতন সং : কলিকাতা ১৯৪৮ : পৃ ১৪৭

কৃষ্ণমোহন কি করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতেন তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' পাওয়া যায়।

"কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাছে ক্যাটিকৃষ্ণ ভায়া—সুবর্বন চৌকিদারের মত পোশাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপি। আদালতী স্বরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফিরিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ক্যাটিকৃষ্ণ কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না! পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েচে— আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়!"[১]

এখানে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তৎকালীন লোকের মনোভাবের একটি সরস ব্যঙ্গচিত্র পাওয়া যায়। সমাজচ্যুত হইয়া দেশীয় খ্রীষ্টানগণ যথেষ্ট দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল। হুজুকে পড়িয়া যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছিল, হুজুক কাটিয়া গেলে তাহাদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন,

"সহরে যখন যে পড়্‌তা পড়ে, শীগ্‌গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে একজন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, একজন বেণে ও কায়স্থও কৃশ্চান দলে বাড়্‌লো— দুচারজন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। কৃশ্চানি হুজুক রাস্তার চল্‌তি লণ্ঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো।"[২]

ডফ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইহার পর হইতে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না। হিন্দুধর্মের সংস্কার আরম্ভ হইলে ধর্মান্তর গ্রহণ বলিতে গেলে খুবই হ্রাস প্রাপ্ত হইল।

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ: হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কল্‌কেতার হাটহদ্দ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৯৩৯: পৃ ১৫

২। কালীপ্রসন্ন সিংহ: হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কল্‌কেতার হাটহদ্দ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়: পৃ ৭৮

॥ ৩ ॥

রামমোহন প্রথম সত্যকার চিন্তার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহার ধর্মচিন্তা একটি নূতন ধর্মান্দোলনের প্রবর্তন করিল। বাস্তব-প্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজশাসন বা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিবার জন্য রামমোহনই প্রথম নির্দেশ দিলেন। সমসাময়িক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে যে স্বাধিকারবাদ ছিল, রামমোহনের চেষ্টার ভিতরেও ছিল সেই স্বাধিকারবাদের এক ভিন্নতর রূপ, শাস্ত্রবিধি ও সমাজশাসন হইতে ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। রামমোহন নিজের জীবনে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাকেই এক তত্ত্ববুদ্ধি ও সূক্ষ্মযুক্তির ভিত্তির উপর জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। "এজন্য প্রধানত একটি বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন—অতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহ্যসাধনা হইতে জাতির মনকে মুক্ত করা; যাহা একটা অন্ধবিশ্বাস মাত্রে পর্যবসিত হইয়া জীবনকে কুণ্ঠিত ও ভয়গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং চারিত্রিক দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছিল—তাহার উচ্ছেদসাধন।"[১] শাস্ত্রবিধির শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তিবাদই রামমোহন-প্রবর্তিত যুগের মুক্তিমন্ত্র।

রামমোহনকে সমগ্রযুগের নায়ক বলা চলে না। তিনি একটি নূতন যুগের সূচনামাত্র করিয়াছিলেন। তিনি কোন মৌলিক মতবাদের প্রবর্তক নন। অনেক ভিত্তিহীন কিংবদন্তী রামমোহনের জীবনের চারিদিকে এক কুয়াশাজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া রামমোহনের দলিলপত্র বিচার করিলে দেখা যায় যে, তিনি হুগলী জেলার রাধানগরে এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে নিজগ্রামে বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ভাব বা কর্মের সূচনা দেখা যায় না। কার্যব্যপদেশে মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত আরবী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' প্রকাশ করেন বলিয়া মিস কলেট লিখিয়া গিয়াছেন।[২] তিনি ফার্সী ও সংস্কৃতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ

১। মোহিতলাল মজুমদার: বাংলায় নবযুগ: কলিকাতা ১৯৪৫: পৃ ১-২

২। Sophia Dobson Collet: The Life and Letters of Raja Rammohun Roy: London 1900: Page 7.

করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস। ইহার পরে রংপুরে থাকাকালীন জন ডিগবী সাহেবের সঙ্গলাভে ইংরেজী শিক্ষা, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাহচর্যে হিন্দু-তন্ত্রশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং মুসলমান মৌলবীদের সহিত আলোচনার ফলে মুসলমানশাস্ত্রাদি বিষয়ে তত্ত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস করিতে আসেন। এই সময় কলিকাতা ছিল মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী—এই তিনপ্রকার বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এই কলিকাতাতেই রামমোহন এক নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। মুসলমানী বিদ্যায় হিন্দুর পৌত্তলিকতার বিষয়ে তাঁহার মনে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তাহা পূর্ণবিকশিত হয়।

রামমোহনের প্রথম বাঙ্গালা রচনা 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সত্তরটি মৌলিক বা অনূদিত পুস্তক-পুস্তিকা বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন। ইহা ছাড়া রামমোহন 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'মীরাৎ-উল-আখবার' (১২ এপ্রিল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) এই তিনখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে প্রথমটি ইংরেজী-বাঙ্গালায়, দ্বিতীয়টি বাঙ্গালায় এবং তৃতীয়টি ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের ধর্মমত-সম্বন্ধে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, রামমোহন ছিলেন ভোগী পুরুষ এবং পুরাদস্তুর এ্যারিস্টোক্র্যাট। ধর্মপ্রচারক অর্থে আমরা যাহা বুঝি তাহা তিনি একেবারেই ছিলেন না। তিনি দিনে বারো সের দুধ খাইতেন, একটা গোটা পাঁঠা খাইয়া ফেলিতেন এবং সুরাপানও করিতেন। শোনা যায় যে, বিলাতে দুগ্ধপানের সুবিধা হইবে না বলিয়া তিনি দুইটি দুগ্ধবতী গাভী বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত সৌখীন ও বিলাসী লোক ছিলেন। তিনি সুখৈশ্বর্যের মধ্যে কলিকাতায় থাকিতেন। ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কস রামমোহনের বাড়ীর উৎসবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,

"1823, May—The other evening we went to a party given by Rammohun Roy, a rich Bengallee baboo; the

grounds, which are extensive, were well illuminated, and excellent fire works displayed.

In various rooms of the house nāch girls were dancing and singing.……The style of singing was curious; at times the tones proceeded finely from their noses; some of the airs were very pretty; one of the women was Nickee, the Catalani of the East." [১]

নিকী সেকালের বিখ্যাত মুসলমান বাঈজী। সেকালের সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় রামমোহন মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিধান করিতেন। খ্রীষ্টান মুসলমানদের সহিত পানাহার করিতেন বলিয়া শোনা যায়। বাড়ীতে মুসলমানী খানা খাইতেন। তিনি পুরামাত্রায় বিষয়ী লোক ছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের টাকাকড়ি কর্জ দিতেন ও কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায় করিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মত বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা রামমোহনের সরকারী চাকরি করিয়া আর্থিক উন্নতির মূলে ঘুষ লওয়ার ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

'By serving in this capacity [Dewan], he is said to have realised as much money as enabled him to become a Zemindar with an income of Rs. "ten thousand a year." If this assertion be true, it must raise in the mind a strong suspicion of the moral character of this extraordinary man.'[২]

কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড্ বলিয়াছেন,

"During the ten years he was Dewan he is said to have saved so much money as to enable him to purchase an estate worth £ 1,000 a year, or 1,000 Rs. a month a matter

---

১। Fanny Parkes: Wanderings of a Pilgrim, in search of the picturesque during four-and-twenty years in the east; with Revelations of life in the Zenāna, Vol. I: London 1850: pages 29-30.

২। Calcutta Review, Vol. IV, no. VIII: Page 364.

which is not supposed to add to his fame. Unlike Solomon, he seems to have made the acquisition and retention of wealth an object of life, not second even to that of wisdom".[১]

৬ই এপ্রিল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী-প্রেরিত চারি প্রশ্ন মুদ্রিত হইলে রামমোহন চারি প্রশ্নের উত্তর লিখেন। ইহার পর ধর্মস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মনামে নন্দলাল ঠাকুর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পাষণ্ডপীড়নে'র এক স্থানে লিখেন,

"কিন্তু নগরান্তবাসীর অদ্যাপি যবনীগমনের চিহ্নপ্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজ বাসস্থানের প্রান্তেই যবনীগমনের ধ্বজা পতাকা রোপণ করিয়াছেন।"[২]

রামমোহন-রচনাবলীর কোথাও যবনীগমনকে অস্বীকার করা হয় নাই।

রামমোহনের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিয়া তাঁহার ধর্মমতের আলোচনা করিলে তাঁহার সত্য রূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে, কেননা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র তাহার চিন্তা ও মতামতকে প্রভাবিত করে।

পূর্বেই বলিয়াছি রামমোহনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হইতেছে তিনি যুক্তিবাদী সংস্কারক। রামমোহন একটি যুক্তি-সম্মত ধর্ম দেশবাসীর জন্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার একেশ্বরবাদের মধ্যে লৌকিক কল্যাণ চিন্তাই মুখ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, জাতির উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়া মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির আরাধনা করিতে হইবে, শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। রামমোহন ভক্তভাগবতশ্রেণীর ধার্মিক ছিলেন না। রামমোহন যুক্তিবাদী নীতিবাদী ধর্মপ্রণেতা। তিনি জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন বিদ্রোহঘোষণা।

নিষ্ঠুর সতীদাহপ্রথা-নিবারণের জন্য রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (নভেম্বর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ)

১। Rev. K. S. Macdonald : Rajah Ram Mohun Roy, The Bengali Religious Reformer : Calcutta 1879 : Page 5.

২। রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড : সাহিত্যপরিষদ্ ১৯৪১ : পৃ ৬৫

সম্বন্ধে ২৬শে ডিসেম্বর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামপুরের সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' লেখেন, "সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"[১]

এই পুস্তকখানি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশের বিধায়ক নিষেধের সম্বাদ-এর প্রত্যুত্তরে লিখিত ও ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের সহমরণ বিপ্র ও মুগ্ধবোধ ছাত্র নামে দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে লিখিত ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে রামমোহন লিখিয়াছেন,

"যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে নিন্দিত যে স্বর্গকামনা, এমত কামনাবিশিষ্ট সহমরণকে ব্রহ্মচর্যধর্ম যাহাতে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া মোক্ষ হওনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কথন সর্বপ্রকারে অগ্রাহ্য ও পূর্ব ২ আচার্যের এবং গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হয়।"[২]

এই চিন্তাও রামমোহনের মৌলিক নহে। সহমরণ যে শাস্ত্রসম্মত নহে, এই মত এদেশের একজন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে ব্যক্ত করেন। তাঁহার মূল সংস্কৃতপাতি পাওয়া না গেলেও ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে তাঁহার মতের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। বিলাত হইতে প্রকাশিত "Some Remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the Practice of Female Sacrifices in India" গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত রামমোহন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রামমোহন রায়, পরিবর্ধিত চতুর্থ সং ঃ কলিকাতা ১৯৫৬ ঃ পৃ ৮৫

২। রামমোহন-গ্রন্থাবলী তৃতীয় খণ্ড ঃ কলিকাতা ১৯৫২ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ঃ

বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া রামমোহনের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেন।

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন, জাতির কুসংস্কার দূর করিতে হইলে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তিনি লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘপত্র লেখেন। ঐ পত্রের একস্থলে লিখিত আছে,

"Neither can such improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedant :—In what manner is the soul absorbed into the deity ? What relation does it bear to the divine essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence ; that as father, brother, etc. have no actual entirety, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better".[১]

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন। শুধু তাহাই নহে। পাদ্রী ডফের স্কুলের জন্য চিৎপুর রোডের উপর তাঁহার ব্রহ্মসভা ভবনের একটি ঘর সামান্য ভাড়ায় তিনি ডফ সাহেবকে ছাড়িয়া দেন। এই স্কুল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই খোলা হয় এবং রামমোহন নিজে ছাত্র সংগ্রহ করেন।

রামমোহন কৌলীন্যপ্রথাজনিত বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন এবং দেশব্যাপী কুসংস্কার পদদলিত করিয়া সর্বপ্রথম বিলাতযাত্রা করেন। বাঙ্গালীর শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি মাংসাহারের নির্দেশ দেন। সকলের নিন্দাকে অগ্রাহ্য

১। Jatindra Kumar Majumdar : Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India (1775-1875) : Calcutta 1941 : Page 252.

করিয়া তিনি অজ্ঞাতকুলশীল রাজারামকে পুত্র হিসাবে পালন করিয়াছিলেন। রাজারামকে মিঃ ডিক হরিদ্বারের এক মেলায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন এবং বিলাত যাইবার পূর্বে ঐ বালককে রামমোহনের কাছে রাখিয়া যান।[১] অনেকের মতে রাজারাম রামমোহনের শৈববিবাহের মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। এই বিবাহের ফলে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করে এবং হুগলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। দ্বিজরাজের খেদোক্তি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ও ৮ই নভেম্বর 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। উহার একস্থলে আছে,

"যবনী প্রয়িসী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল॥
... ...
ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবনী রমণী।
পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয়বাদিনী॥
তার গর্ভে জন্মে এক সুলক্ষণা কন্যা।
আমার নয়ন তারা রূপেগুণে ধন্যা॥[২]

রামমোহনের সমসাময়িক অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন।

রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী। এক সর্বজনীন ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণসাধনই তাঁহার মতে প্রকৃত ধর্ম ছিল। তিনি এই বিশ্বজনীন ধর্মকে জাতীয় আকারে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক ঈশ্বরের বাণী শুনাইয়াছেন, আবার মুসলমানশাস্ত্র মন্থন করিয়া একেশ্বরের কথা বলিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্মকে অন্যান্য ধর্মমত অপেক্ষা নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাতির উন্নতির অনুকূল বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং সেমীয় একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বর্জন করিতে পারেন নাই। পরধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও তাহার প্রভাব স্বীকার না করিয়া তিনি নিজের মতের সপক্ষে বেদান্ত উপনিষদ্ হইতে

১। Mary Carpenter: The Last Days in England of the Raja Rammohun Roy: Calcutta 1915: page 222.

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড: কলিকাতা ১৯৩৩: ১।০

প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। রামমোহন নিজেকে পুরাপুরি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেন। পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইয়া রামমোহন ও অন্যান্য সকল ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে রামমোহন কলিকাতায় নিজ ব্যয়ে হিন্দুপ্রথানুযায়ী পিতার শ্রাদ্ধ করেন। 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর উক্তিতে রামমোহনের ধর্মে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিরূপ কর্মকাণ্ডের আভাস পাওয়া যায়।

"দেখ, ধর্মের নাম শ্রবণমাত্রেই এতাদৃশ দুর্দান্ত দুর্জীবেরা সম্প্রতি পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধাদিরূপ কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়াছে, যে দুর্জীব পূর্বে অনেক অবোধ জীবকে অসদুপদেশ দ্বারা মুক্তিকারণগঙ্গাদিতে অভক্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া অট্টালিকোপরি দিব্যাসনে অপূর্ব তত্ত্বজ্ঞানে প্রাণ বিয়োগপূর্বক অপূর্ব সুখ সম্ভোগস্থানে প্রস্থান করাইয়াছেন…"[১]

মৃত্যুকালেও রামমোহন দ্বিজত্বের প্রতীক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। মেরী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন,

"His family was Brahminical, of high respectability; and, of course, he was a Brahmin by birth. After his death the thread of his caste was seen round him, passing over his left shoulder and under his right".[২]

মোহিতলাল বলিয়াছেন,

"এইখানেই তাঁহার 'ভাবের ঘরে' চুরি ছিল; তিনি ভিতরে যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাইরে তাহা খোলাখুলি স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না।"[৩]

যুক্তিবাদী রামমোহন শঙ্করাচার্যের সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রচার করেন। তাঁহার 'বেদান্তগ্রন্থ' ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'বেদান্তসার' ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রচারিত হয়। "কিন্তু

১। রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত ১৯৪৫: পৃ ২৬

২। Mary Carpenter: The Last Days in England of Raja Rammohun Roy: Calcutta 1915: page 2.

৩। মোহিতলাল মজুমদার: বাংলার নবযুগ: পৃ ২৭২

যে ব্রহ্মের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই ধর্মগত বিশ্বাসের ব্রহ্ম, নীরস দর্শনশাস্ত্রের ব্রহ্ম নয়।"[১]

রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মন বৈষ্ণবধর্মাচারকে সহ্য করিতে পারে নাই। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থে (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি বৈষ্ণবধর্মকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগ্যের বস্ত্র হরণপূর্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোনো গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণচর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতেন। বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিচার করেন।"[২]

কিন্তু রামমোহন তন্ত্রোক্ত উপাসনার প্রতি মূল্য আরোপ করিয়াছেন। "যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসারহিত ব্যক্তিদের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।"[৩]

বৈষ্ণবধর্মকে কটাক্ষ করিয়া রামমোহন 'চারিপ্রশ্নের উত্তর' (১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও ভুরি কাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না।"[৪]

১। সুশীলকুমার দে: নানানিবন্ধ: কলিকাতা ১৯৫৪: পৃ ২৩৭
২। রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড সাহিত্য পরিষদ্ সং: কলিকাতা ১৯৫২: পৃ ৫১
৩। রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড: কলিকাতা ১৯৫২: পৃ ৫৪
৪। রামমোহন গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড: কলিকাতা ১৯৪৫: পৃ ৩

রামমোহন শৈববিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,

"বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত্ নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়?"[১]

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে রামমোহন শৈব মতে এক যবনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই শৈব বিবাহের পত্নী রঙ্গপুর হইতে চার মাইল দূরবর্তী তাম্ফাট্‌বাসিনী ছিলেন।[২] এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে।

রামমোহন তান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পালপাড়ানিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, পরে যিনি তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন, তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করান এবং তাঁহার সাহচর্যে তিনি তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট হন। রামমোহনের তান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বলিয়াছেন,

"......এক্ষণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের নিগূঢ় শাস্ত্র দর্শন করিলাম, যে নিগূঢ় শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা শৈববিবাহ, যবনীগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্মের অনুষ্ঠান এবং ছাগীমুণ্ড, বরাহতুণ্ড, হংসাণ্ড ও কুক্কুটাণ্ড ভোজন করিয়া থাকেন।"[৩]

রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার এই মত নূতন নহে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 'জ্ঞানোদয়' নামক পুস্তিকা রচনা করেন।

খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি ত্রিত্ব ঈশ্বরবাদকে কোন ভাবেই সমর্থন করেন নাই। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র হইতে উক্তি সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের

১। রামমোহন গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড: কলিকাতা ১৯৪৫: পৃ ১৯

২। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী: রাজা রামমোহন রায় (জীবনচরিতের নূতন খসড়া): কলিকাতা, প্রকাশকাল নাই: পৃ ৩৪

৩। রামমোহন গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড: কলিকাতা ১৯৪৫: পৃ ৫৬

নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ডাঃ মার্শম্যান তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ইহার উত্তরস্বরূপ তিনি তিনখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করেন :—

(১) 'An Appeal to the Christian Public, in Defence of the Precepts of Jesus' (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ), (২) 'Second Appeal to the Christian Public, in Defence of the Precepts of Jesus' (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং (৩) 'Final Appeal to the Christian Public in Defence of the Precepts of Jesus' (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ)। মার্শম্যান রামমোহনের 'Final Appeal to the Christian Public in Defence of the Precepts of Jesus' পুস্তকের সমালোচনা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে করিয়াছিলেন।

মিশনরীদের উদ্দেশ্যে রামমোহন লিখিয়াছেন,

"য়িশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। য়িশুখ্রিষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

ঈশ্বর এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, গোষ্ট ঈশ্বর।"[১]

রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের একত্ববাদ প্রচার করিবার জন্য ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'হরকরা' নামক সংবাদপত্রের অফিসবাড়ীর দ্বিতীয়তল গৃহে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি (Unitarian Society) নামক এক সভা সংস্থাপন করেন। এখানে খ্রীষ্টীয় মতানুসারে উপাসনা হইত। এই সভার প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনার ব্যাপারে পাদ্রী অ্যাডাম প্রধান সহায়ক ছিলেন।

ইহার পূর্বে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয় সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। এই সভায় ধর্মমত সম্বন্ধে তুমুল দলাদলি হয় বলিয়া সভা বন্ধ হইয়া যায়।

রামমোহনের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি বিশেষ সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারিল না। তাই তিনি ব্রহ্মোপাসনার জন্য জোড়াসাঁকো, চিৎপুর

১। রামমোহন গ্রন্থাবলী ৫ম খণ্ড : সাহিত্য পরিষদ্ সং : কলিকাতা ১৯৫১ : পৃ ১৮

রোডের উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া একটি নূতন সভা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন। এই উপাসনা সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট। ইহার নামকরণ হয়—ব্রাহ্মসমাজ। লোকে তৎকালে ইহাকে ব্রহ্মসভা বলিত।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত সভা চলিত। বাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী সঙ্গীত করিতেন ও গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী জোড়াসাঁকোয় সমাজের নিজস্ব বাড়ীতে যখন সমাজের কাজ আরম্ভ হয়, তখন উদ্বোধনের সময় মণ্টগোমারি মার্টিন উপস্থিত ছিলেন। ইহার প্রধান আচার্য হন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। এই সভায় হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপাসনা করিতে পারিত।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

রাজনারায়ণবাবু তাঁহার পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাইবার পূর্বে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার মৃত্যু হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।"[১] এই উক্তির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তাঁহার ব্রহ্মসভা কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মসমাজ ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে কখনই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না। একেশ্বর ব্রহ্মবাদী হইলেও আসলে তিনি যুক্তিবাদী দার্শনিক। ইংরেজ জাতির প্রতি আস্থা, তাহাদের সদাশয়তার উপর বিশ্বাস রামমোহনের ছিল। তাঁহার চিন্তা অনেক পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষার ফল এবং হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাও বহু পরিমাণে ঐ ফল-প্রসূত।

রামমোহন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। তিনি যুগোপযোগী একটা ধর্মমত সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র। কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় তিনি স্থাপন করেন নাই। যে দার্শনিক অনুশীলনকে Study of Comparative Religion বলা হয়, রামমোহন তাহারই নির্দেশ দেন।

১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ৫ম সং : এলাহাবাদ ১৯২৮ : পৃ ৬১৪

'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

"All speculations, as to his belief in the abstract truth of any religion, founded on his advocacy of certain doctrines connected with it, or his attendance at its place of worship, are obviously futile. For Rammohun Roy was a religious Benthamite, and estimated the different creeds existing in the world, not according to his notion of their truth, or falsehood, but by his notion of their utility ; according to their tendency, in his view, to promote the maximization of human happiness, and the minimization of human misery."[১]

রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মসমাজ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই জন্য পরবর্তী-কালে ব্রাহ্মসমাজের যে রূপ দেখা যায় রামমোহনকে সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তক বলা যায় না। রামমোহনের চিরজীবনের সকল সাধনার ফল তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা। এই ব্রহ্মোপাসনাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া তিনি দেশবাসীকে দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজে এই ব্রহ্মোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু যে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম-প্রণয়ন এবং ব্রহ্মোপাসনার ক্ষেত্রে নানা মত ও পথ স্বীকৃত ও অনুসৃত হইয়াছিল, রামমোহন সে ভাবে সে সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, এমন কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ রামমোহন যখন তদানীন্তন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণের জন্য স্বীকৃত হইলেন না, তখন ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে স্বীকৃতি দান করিয়া একেবারে পুরোভাগে স্থাপন করিল। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মকে বিধির মত গ্রহণ করিয়া একদল লোককে লইয়া নূতন ধর্মসম্প্রদায় গঠন করিবার কোন চেষ্টাই রামমোহন করেন নাই।

'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে 'The Last Days in England' of the

১। Calcutta Review, Vol. IV, No. VIII : page 388.

Raja Rammohun Roy' (মেরী কার্পেণ্টার লিখিত) গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

"It is therefore manifest that what Rammohun Roy wanted was not unity of creed or the creation of a separate religious community like that of the Brahmos, but to spread monotheistic worship, to establish a universal church where all classes of people,—Hindus, Mehomedans, and Christians,—would be all alike welcome to unite in the worship of their supreme and common Father".[১]

রামমোহন রায়ের পরে ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনের যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু এবং অক্ষয়কুমার দত্তই প্রধান। এই যুগের শেষের দিকে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের মধ্যে এক নূতন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সমস্ত বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সহিত আদি বা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ সুরু হয়। ইহার ফলে পরিশেষে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের এক সভাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

রামমোহন রায়ের ভারতত্যাগের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের কাল পর্যন্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই ব্রাহ্মধর্মের দীপশিখাকে নানা ঝঞ্ঝার আক্রমণ হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই (১৮১৭—১৯০৫) এই যুগের ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের একজন প্রধান পুরুষ।

দেবেন্দ্রনাথ অ্যাংলো-হিন্দুস্কুলের ছাত্র ছিলেন। অ্যাংলো-হিন্দুস্কুলের তৎকালীন ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ "গৌড়ীয় ভাষার উত্তম রূপে অর্চনার্থ" ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সর্বতত্ত্বদীপিকা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় ধর্মালোচনাও হইবে বলিয়া স্থির হয়। ইহার পূর্বে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন নামক বিতর্কসভা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা

১। Calcutta Review, No. LXXXVII: Page 232.

স্কুলের ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া অ্যাংলো-হিন্দুস্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই বিতর্কসভায় ধর্মবিষয়ে আলোচনার কথা ছিল না। সর্বতত্ত্বদীপিকা-স্থাপনের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

"১৭৫৪ শকের (১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টা সময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুল নামক বিদ্যালয়ে সর্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।...

অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করা কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে।"[১]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় যথাক্রমে এই সভার সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন। দুঃখের বিষয় পরবর্তী অধিবেশনাদি সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভাবের উন্মেষ হইয়াছিল প্রথমে রামমোহনের সংস্পর্শেই। পৌত্তলিকতাকে তিনি অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন সময় একদিন সহসা একটি সংস্কৃতপুস্তকের পাতা তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যায়। ঔৎসুক্যবশতঃ দেবেন্দ্রনাথ সেই পাতা ধরিলেন। কেহই যখন ঐ পাতায় লিখিত শ্লোকগুলির অর্থ করিতে পারিল না, তখন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের পরামর্শে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হইল। বিদ্যাবাগীশ ঐ পাতায় লিখিত ঈশোপনিষদের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিলে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশের নিকট ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ এবং অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে আর ছয় উপনিষদ্ পাঠ করিলেন।[২] যখন উপনিষদে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অধিকার হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন তাঁহার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন সেই সত্যধর্ম প্রচার করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ "তত্ত্বরঞ্জিনী" সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড : কলিকাতা ১৯৩৩ : পৃ ৮৬-৭

২। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত তৃতীয় সং : কলিকাতা ১৯২৭ : পৃ ৬২

আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সভার নাম পরিবর্তন করিয়া "তত্ত্ববোধিনী" নাম রাখিলেন। ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯) রবিবার কৃষ্ণ-পক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয়।[১]

যদিও দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর কাছে পড়েন নাই, তথাপি তিনি The Society for the Acquisition of General Knowledgeএর সভ্য ছিলেন। এই সভার অনেকে পরে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।"[২]

প্রথম দিনে ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল দশ জন মাত্র। ক্রমশ ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। মাসের প্রথম রবিবার রাত্রিকালে সভার অধিবেশন হইত এবং বিদ্যাবাগীশ সভায় আচার্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতেন। তৃতীয় বৎসরে এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়।

এই সাংবৎসরিক সভা হইয়া গেলে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভাকে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। নির্ধারিত হইল যে, তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিবে।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিকতার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৬ শকের (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) ২৬শে বৈশাখ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

"১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে) দ্বাদশ বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন আমার প্রথম যোগ হয়, তখন দেখিলাম—সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদ পাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ ৬৪
২। ঐ : পৃ ৬৫

করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্ম-বিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উক্ত কর্ম হইতে অবসৃত হইলেন।"[১]

পূর্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের কাল পর্যন্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট রামমোহন চিৎপুর রোডস্থ কমললোচন বসুর বাড়ী ভাড়া লইয়া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে ব্যাখ্যান দেন তাহাতে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নামটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন ব্রাহ্মসমাজের জমিক্রয়ের কবালা-পত্রে 'ব্রহ্মসমাজ' কথাটি ব্যবহৃত হয়। হয়ত 'ব্রাহ্ম' শব্দটি তখন পরিচিত ছিল না বলিয়া 'ব্রাহ্মসমাজে'র স্থলে 'ব্রহ্মসমাজ' লেখা হইয়াছিল। তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলিতে 'ব্রহ্মসভা', 'ব্রাহ্মসভা', 'ব্রহ্মসমাজ', ইত্যাদি নাম পাওয়া গেলেও রামমোহন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেই 'ব্রাহ্মসমাজ' নামকরণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র ব্রহ্মের উপাসক-অর্থে মানুষের বিশেষণরূপে রামমোহনই 'ব্রাহ্ম' শব্দটিকে ব্যবহার করেন। রামমোহনের অনুবর্তী ব্যক্তিগণ যে ব্রহ্মোপাসক হইয়া ও প্রতিমাদি পূজা হইতে বিরত হইয়া 'ব্রাহ্ম' এই বিশেষ নামে চিহ্নিত হইবেন হয়ত এ কল্পনা রামমোহনের ছিল। ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণের প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা ও ব্রত প্রবর্তন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া ইহার কার্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া তাহার উপযোগী একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন ও ২০ জন সঙ্গীসহ তাহা পাঠ করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন। এইভাবে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক 'ব্রাহ্ম' এই নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়া 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। এইভাবেই সত্যকার ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্ম

১। প্রধান আচার্য : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (কলিকাতা, প্রকাশ কাল নাই) : পৃ ১৮-৯

সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হইবে। শুধু এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতেই ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।

'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি রামমোহনের সময় সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সময়ে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' নামে অভিহিত হইত। সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর 'ব্রাহ্ম' কথাটি খুবই প্রচলিত হইয়া উঠে এবং রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে 'ব্রাহ্মধর্ম' বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকে। এমনও হইতে পারে যে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম বলিতে ব্রাহ্মের অবশ্য প্রতিপালনীয় ব্রতসমষ্টি মনে করিতেন। সমস্ত জীবনের জন্য কতকগুলি বিধি ও নিষেধাত্মক সঙ্কল্পের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করা এই অর্থ তিনি 'ধর্ম' কথাটি দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বিধিপূর্বক আচার্যের নিকটে গিয়া ঐরূপ সঙ্কল্প গ্রহণকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা বলিয়াছেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম' এই দীর্ঘ নামের স্থলে 'ব্রাহ্মধর্ম' এই সংক্ষিপ্ত নাম অবলম্বন করা হইবে এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৫০) প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন।[১] এই গ্রন্থরচনার বিস্তৃত বিবরণ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে দিয়াছেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে।

তত্ত্ববোধিনী সভা অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজীশিক্ষিত কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তিনটি উপায় অবলম্বন করেন—(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (২) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, এবং (৩) শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশের কারণ-সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত

১। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ বাঙ্গালা অনুবাদ সহ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮+৮০ এবং অনুবাদ অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৩+।৮০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই গ্রন্থের এক কপি আছে।

নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না ; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তারউদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রশোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক ; আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।

পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার রচনাতেও গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ-সন্ন্যাস আমার মত-বিরুদ্ধ।......ফলতঃ, আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি।......বেদবেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।"[১]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ-নির্বাচনের ভার একটি গ্রন্থ-কমিটির উপর অর্পিত হয়। ইহাকে পেপার-কমিটি বলিত। দেবেন্দ্রনাথ এই পেপার-কমিটির অধ্যক্ষ এবং অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষী গ্রন্থ-কমিটির সদস্য হন।

ক্রমে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে ধর্মপ্রচার করিতে চাহিতেছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সেইভাবে সাহায্য করিতেছে না। সেই জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ১৭৭৫ শকের ২৬শে ফাল্গুন (১৮৫৪, মার্চ) রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন,

"ক্রমাগত তোমার পত্র পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি। বিশেষতঃ গতবারের মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার বান্ধবমণ্ডলীর

১ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ ৭৫-৭৭

মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের সুবিধা নাই।"[১]

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সঙ্গে এই পেপার-কমিটিও বিলুপ্ত হয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরেই কলিকাতা সিমলা পল্লীর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা উভয়েরই কার্য চলিতে থাকে। অক্ষয়কুমার প্রথম হইতেই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার অর্থসামর্থ্য এমন ছিল না যাহাতে ইহা কলিকাতায় অন্যান্য স্কুলগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত করা হয়। অক্ষয়কুমারের পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভবপর না হইলে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা প্রচলিত করিবার এক উপায় হিসাবে এই পাঠশালার সৃষ্টি হইয়াছিল।

কার ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অনটনের জন্য এই পাঠশালা বন্ধ হইয়া যায় এবং ডফ ফ্রি চার্চ মিশনের পক্ষে এই একই স্থানে একটি মিশনরী স্কুল স্থাপন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন ধরিয়াই খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারে বাধা দিয়াছেন। পাদ্রী ডফের নেতৃত্বে খ্রীষ্টান মিশনরীরা হিন্দুধর্মের নিন্দা ও খ্রীষ্টধর্মের গুণকীর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহারা হিন্দুসন্তানদের খ্রীষ্টান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ছল-বল-কৌশলে তাহাদের কার্য সমাধা করিত।

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৮৪৫) রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কনিষ্ঠ

১। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী : পৃ ১০-১১

ভ্রাতা উমেশচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী ডফকর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবার সংবাদে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মিশনরীদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করেন।

বাড়ী বাড়ী যাইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহারা সন্তানসন্ততিদিগকে পাদ্রীদের স্কুলে প্রেরণ না করেন। তিনি রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৬৭ শকের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে) এক সভা করিলেন। এই সভাতে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। ধর্মসভা ও ব্রহ্মসভা দলাদলি ভুলিয়া একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইল। স্থির হইল যে, একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকার স্বাক্ষর পাওয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

'এই সভা হইতে "হিন্দুহিতার্থী" নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।'[১]

প্রায় এক বৎসরের উদ্যোগ-আয়োজনের পর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে আর্থিক দুর্গতির জন্য বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়।

প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন। বেদান্তদর্শনকে শ্রদ্ধা করিতেন না, যেহেতু তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মকে এক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদি উপাস্য ও উপাসক এক হইয়া যায় তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? তাই তিনি যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ঃ পৃ ১০৬

দেবেন্দ্রনাথ কেবল মাত্র প্রাচ্যের দর্শনশাস্ত্রগুলিই পড়েন নাই, তিনি স্কচ দর্শনকারদের রচনা, বেন্থাম হইতে মিল পর্যন্ত ইউটিলিটিবাদের গ্রন্থ, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের লেখা পড়িয়াছিলেন। ধর্মের আলোচনা-ক্ষেত্রে তাঁহার উপর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যে বিশেষ প্রভাব ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করাতে শঙ্কর-বেদান্তের মতে তিনি মত দিতে পারিলেন না। ঐ অভেদ-প্রতিপাদক বাক্যগুলিকে কোন কোন উপনিষদে দেখিয়া তিনি উপনিষদ্‌কে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি করিতে চাহিলেন না। তিনি তখন ভিত্তি করিলেন—'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'[১] এবং বলিলেন যে, 'হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা, ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হন।'[২]

ইহার পর 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থে (১৮৫২) দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। "আবার জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। তাঁহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।"[৩]

শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই ভয়ঙ্কর দ্বৈত-মত গ্রহণ করিয়া বসিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে তাঁহার এই দ্বৈত-মত তিনি যে অনেকাংশে কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৬০) এবং 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (প্রথম প্রকরণ ১৮৬১, দ্বিতীয় প্রকরণ ১৮৬৬) গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে।

'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' এবং 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে' জর্জ ভিল্‌হেল্‌ম্ ফ্রেডারিক্ হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। হেগেলের মতে প্রজ্ঞানরূপী অদ্বৈত সর্বগ এবং ইহা বিশ্বের অন্তর্নিহিত (ইমানেণ্ট) সত্য। হেগেলের অদ্বৈত নানা নামে অভিহিত। কখনও ইহাকে

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী: সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত: ৩য় সং: কলিকাতা ১৯২৭: পৃ ১৬৭

২। ঐ পৃ ১৬৮

৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আত্মতত্ত্ববিদ্যা (প্রথমাবধি পঞ্চমাধ্যায় পর্যন্ত) ২য় সং: কলিকাতা ১৮৬২: পৃ ১৪

অদ্বৈত ভাব (অ্যাব্‌সলিউট্‌ আইডিয়া), কখনও ইহাকে অদ্বৈত প্রজ্ঞান (অ্যাব্‌সলিউট্‌ রিজন্‌), কখনও ইহাকে অদ্বৈত আত্মা (অ্যাব্‌সলিউট্‌ স্পিরিট) বা অদ্বৈত মন (অ্যাব্‌সলিউট্‌ মাইণ্ড) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই জগতের সমস্ত বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই অদ্বৈতই সমস্ত সম্বন্ধের ভিত্তিস্বরূপ। জীব-শরীরের অবয়বসমূহ যে প্রকারে সমগ্রের অধীন ও সমগ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই প্রকারে বিশ্বের সকল ব্যাপারই অদ্বৈতের অধীন ও অদ্বৈত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাতিভাসিক জগৎ অদ্বৈত হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে। ইহা অদ্বৈতের বাহিরে অবস্থান করিতেছে না। কিন্তু এই অভেদের মধ্যে যে ভেদ নাই তাহা নহে। অদ্বৈত ও জগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই রহিয়াছে। বিশিষ্টতা ও সসীমত্বসহ মানব মন বা আত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। বিশিষ্টতা ও সসীমত্ব বর্জন করিলে মানবাত্মা ঈশ্বরের সহিত এক হয়।

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও এই চিন্তাধারা দেখা যায়। তিনি শেষ পর্যন্ত দ্বৈতবাদ অনেক পরিমাণে কাটাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন,

"তিনি আমারদের শরীরমন্দিরের পরম দেবতা। বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা, সেও তাঁহাকে দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই নিকটে দেখি। তিনি শরীরমন্দিরের দেবতা। তিনি আমারদের নিজস্ব ধন। ...তাঁহার সঙ্গে প্রতিআত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি প্রতিশরীরের পুরস্বামী; তিনি প্রতিজনের গৃহদেবতা। আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার স্বসা, এই-সকলকে আমার বলিয়া থাকি; ঈশ্বরও সেইরূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমার হৃদয়েশ্বর।"[১]

তিনি পুনরায় বলিয়াছেন,

"আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্রে রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। এ দুইজন সর্বদা একত্রে থাকেন। একজন আশ্রয়, একজন আশ্রিত; একজন ফলভোগী, আর একজন ফলদাতা। অতএব তাঁহার সঙ্গে আমারদের কেমন নিকট সম্বন্ধ।"[২]

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণ) ও মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ একত্রে: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত: কলিকাতা ১৯৪৫: পৃ ১৩

২। ঐ পৃ ১৭

জগৎ ও মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ ; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহার রূপ দেখা যায়। সৃষ্টির সৌন্দর্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, ধার্মিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে।"[১]

এই ব্যাখ্যানে আগেকার ভয়ঙ্কর দ্বৈতমত অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়া পূর্ণ অদ্বৈতমত না হইলেও, অদ্বৈতের কাছাকাছি একটা মত দাঁড়াইয়াছে বলিতে হইবে। পুরা অদ্বৈতমত হইলে মুক্তি একেবারে কৈবল্যমুক্তি হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্ব ও ক্রমিক উন্নতির অবকাশ রহিত হইয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের আত্মার ক্রমিক উন্নতির ধারণায় হেগেলের দ্বান্দ্বিক-পদ্ধতির (Dialectics) প্রভাব ছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"অতএব ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি ব্রহ্মেতে লয় হওয়া নহে ; ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি আত্মার অনন্ত কালের উন্নতি!"[২]

দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্বের ধারণায় ইমানুয়েল কাণ্টের (১৭২৪-১৮০৪) The Principle of Autonomy of the Will এর প্রভাব আছে। ব্যক্তির স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ধারণা দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' গ্রন্থে সুস্পষ্ট।

"আমাদের ইচ্ছা কখনো তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হয়, কখনও বা বিরোধিনী হয়।...এই স্বাধীনতাশক্তি মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের এক অমূল্য দান।...আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে সর্বস্ব দান করি, আমারদিগকে স্বাধীন করিবার তাঁহার অভিপ্রায় এই। এস্থলে অনুরোধ, ভয়, বাধ্যতা, এ সকল কিছুই নাই। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি এই চাহেন।"[৩]

এই স্থলে স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্যের কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

জীবের মুক্তিসম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, জীবত্ব গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি হইবে। ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা ; তাঁহাদের মুক্তি ঈশ্বর

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান : পৃ ১৫

২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস তৃতীয় সং : কলিকাতা ১৮৬৯ পৃ ৯৪

৩। ঐ : পৃ ৭৯-৮০

হইয়া যাওয়া। বস্তুতঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা, তাহাতেই যথার্থ মুক্তি।"[১]

শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত সাধনা—এইরূপ একটি ধর্মমতকে দেবেন্দ্রনাথ আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং এই ধর্মমতে হেগেলের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

বেদ পাঠ করার ও সুষ্ঠুভাবে ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিবার মত লোকের যথেষ্ট অভাব ছিল। এই জন্য দেবেন্দ্রনাথ আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য ও রমানাথ ভট্টাচার্যকে কাশীতে প্রেরণ করেন। রমানাথ ঋগ্বেদ, বাণেশ্বর যজুর্বেদ, তারকনাথ সামবেদ এবং আনন্দচন্দ্র অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত টীকাসমেত উপনিষদ্‌সাহিত্যও ইঁহারা পড়িয়াছিলেন। কাশীধামের বেদাধ্যয়ন স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে দেবেন্দ্রনাথ একবার তথায় গমন করেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিলে দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদের স্বমতানুযায়ী শাস্ত্রাদি গ্রন্থের সার-সংগ্রহে নিযুক্ত করেন।

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, সমাজের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটার ন্যায় কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত নাই। এই নিমিত্ত তিনি স্থির করিলেন যে, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের এমন একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিলেন যাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার কথা ছিল। রামমোহনের গায়ত্রী মন্ত্রের বিধান দেখিয়াই এইরূপ উপাসনার কথা তাঁহার মনে হয়। ঐ পত্রে প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনার একটি বিধি ছিল। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর) বিদ্যাবাগীশের নিকটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, লালা হাজারীলাল প্রমুখ ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের (ডিসেম্বর ১৮৪৩) মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হন।

গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা উপাসনা করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয় দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞাতে "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পর-

---

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস : পৃ ৯২

ব্রহ্মের উপাসনা করিব" এই কথার স্থলে "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব" করিয়া দিলেন। উপাসনার জন্য উপনিষদ্ হইতে "সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম" এবং "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই দুটি বাক্য উদ্ধার করিয়া দিলেন। পরে ইহার সহিত "শান্তং শিবমদ্বৈতং" বাক্যটি যোগ করা হয়।

ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবার পক্ষে প্রথমের ঐ দুইটি বাক্যই যথেষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি প্রশস্ত উপাসনাপ্রণালী থাকা আবশ্যক। সেইজন্য তিনি ঐ দুইটি মহাবাক্যকে প্রথমে সংস্থাপন করিয়া উপনিষদ্ হইতে আরো তিনটি শ্লোক যোগ করিয়া দিলেন।

ইহার পর একটি হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্ম-স্তোত্র সন্নিবেশ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ বেদ খুঁজিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ তাঁহাকে মহানির্বাণতন্ত্র হইতে একটি স্তোত্র দিলেন। কিন্তু তাহাতে অদ্বৈতবাদ থাকার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঐ স্তোত্রের পঞ্চরত্নের কিছু সংশোধন করিয়া লইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ উপাসনাপ্রণালীর সর্বশেষে একটি প্রার্থনা রচনা করিয়া সন্নিবিষ্ট করিলেন : "হে পরমাত্মন! মোহ-কৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপচিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" ১৭৬৭ শকে (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রাহ্মসমাজে এই উপাসনাপ্রণালী প্রবর্তিত হয়।[১]

দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিতে সচেষ্ট ছিলেন। লোকনিন্দা ও আত্মীয়স্বজনের পীড়নের ভয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৭৭৮ শকের (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাসে লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। অনেকে তাঁহাকে পৌত্তলিকমতে শ্রাদ্ধ করিতে বলিলেন। রাধাকান্ত বন্ধুভাবে পরামর্শ দিলেন, "শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধান আছে, সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করিও।" আত্মীয়স্বজন সকলেই সেই পরামর্শ দিলেন। একমাত্র লালা হাজারীলাল তাঁহাকে সমর্থন করিল।

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ ৯৪

শালগ্রামশিলা ও পুরোহিতের বদলে কঠোপনিষদের শ্লোক পাঠ করা হইল। ব্রাহ্মধর্মের পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত।

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে উপনিষৎ সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় কোথায়? বেদে তাহার পত্তন-ভূমি হইল না, উপনিষদেও তাহার পত্তন-ভূমি হইল না। শেষে দেখা গেল যে "আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তন-ভূমি।"[১] সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই গ্রহণযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলেন। ঈশ্বরের প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্য সকল তাঁহার হৃদয়ে যাহা উদ্‌ভাসিত হইতে লাগিল তাহা তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমার তাহা লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বর-প্রসাদে, ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি তাঁহার হৃদয় হইতে বাহির করিলেন। তিনঘণ্টার মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

'এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই "ব্রাহ্মধর্ম" সংগঠিত হইল, এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্প-তরুর অগ্রশাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষদ্, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ ;...'[২]

ব্রাহ্মধর্মের দুই অঙ্গ—একটি উপনিষদ্, দ্বিতীয়টি অনুশাসন। ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডে উপনিষদ্ সমাপ্ত হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে অনুশাসন লিপিবদ্ধ করা হইল। এই অনুশাসন ষোল অধ্যায়ে বিভক্ত।

পূর্বেই বলিয়াছি দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা-বর্জনকে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"ব্রাহ্মধর্মকে তিনটি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রথম বিঘ্ন পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় বিঘ্ন খৃষ্টধর্ম, তৃতীয় বিঘ্ন বৈদান্তিক মত।...পৌত্তলিকেরা যেমন ব্রহ্মেতে মনুষ্যত্ব আরোপ করে, বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে।"[৩]

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ ১৬৭

২। ঐ : পৃ ১৮০

৩। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ব-রচিত জীবন-চরিতের পরিশিষ্ট : কলিকাতা ১৮৯৮, পৃ ১৭-৮

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপনয়নের প্রথা প্রবর্তন করেন। এই প্রথানুসারে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রদ্বয় সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন দেন।[১] পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হয়।[২] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্মসমাজের অনেকে উপবীত ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা কেবল উপাসনার সময় উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন।[৩] কেহ কেহ বলেন, দীক্ষিত ব্রাহ্মদের উপবীত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের গৃহে দগ্ধ করা হইত; পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহারা আবার উপবীত পরিতেন।[৪]

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের নিয়মানুসারে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন,

"পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের ব্যবস্থানুসারে আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।...... আমার নিজ পরিবারে আর পৌত্তলিকতার গন্ধও রহিল না। ইহাতে আমার আর আর জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"[৫]

পৌত্তলিকতাপূর্ণ বিবাহে দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,

"সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, আর কীটাবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি আছে?"[৬]

বিবাহের ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই। এক পত্রে রাজনারায়ণকে লেখেন,

"ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণশূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে।"[৭]

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী: পৃ ৩১: এই স্থলে একটি বংশতালিকা আছে।
২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত: কলিকাতা ১৯০৮: পৃ ১৯৯
৩। ঐ : পৃ ৬৩
৪। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত: কলিকাতা ১৮৭১: পৃ ৯৫
৫। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী: পৃ ৩৩
৬। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী: পৃ ৩৫
৭। ঐ : পৃ ৩৮

দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদের পক্ষপাতী না হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে, খুব শীঘ্র জাতিভেদ দূর করা সম্ভব নয়; ক্রমে ক্রমে ইহা দূর হইয়া যাইবে। তাই প্রথমে উপবীতধারণে তাঁহার সম্মতি না থাকিলেও, পরে তিনি উপনয়নের বিধান দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণকে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করাইতে ব্যগ্র, তুমি ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ। যাহা হউক জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুরও এই মত।"[১]

দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ে কন্যা সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মদিরাপানকে তিনি সমর্থন করিতেন না। তাঁহার মতে মদিরাপান কখনই ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। আত্মচরিতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"তাঁহারা জানিতেন না যে, আমি মদ্যপানে বিরত, এবং আমার মতে মদ্যপান ধর্মবিরুদ্ধ;..."[২]

নাস্তিকতাকে দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। The Essential Religion by Rajnarain Bosu প্রবন্ধটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ছাপা হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"এ নাস্তিকতা—ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ছাপাইলে পত্রিকার কলঙ্ক হইবে। এমন কথা এ পর্যন্ত তোমার কলমে আসে নাই এবং পত্রিকাতেও উঠে নাই, অতএব এইটা বাদ দিবে।"[৩]

দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রথমতঃ দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। এই লইয়া অক্ষয়কুমারের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ হয়। শেষে দুইজনে তর্ক করিয়া স্থির করেন যে, বেদকে আর ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নহে, কেন না উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ বাক্য দৃষ্ট হইতেছে।

১। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী: পৃ ৫০

২। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী: পৃ ২৭৫

৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী: পৃ ১২৮

"বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ১১ই মাঘ দিবসে সাংবৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।"[১] ইহার পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী হইয়া বেদ ও উপনিষদ্ হইতে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ উদ্ধার করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ' (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশ করেন। ইহাতেও বিবাদের শেষ হইল না। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের ধর্মভাব ও নিষ্ঠার অভাব তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮১ শকের (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে তত্ত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত কার্য ও তাহার সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তত্ত্ববোধিনী সভা লীন করিয়া দিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই বৎসরের শেষের দিকে দেবেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে লইয়া ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র এখানে প্রতি সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্মসম্পর্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের জন্য বাঙ্গালায় যেমন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তেমনি ইংরেজীতে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগস্ট প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।

শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা-বর্জনকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়াছেন। জটিয়াবাবাকে তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন,

"একমাত্র পৌত্তলিকতাপরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্মের উদ্‌ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন।"[২]

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই দেবেন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মধম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিবাহের অনুষ্ঠান হিন্দুমতে হইলেও যদি সেই বিবাহে শালগ্রামশিলা না আনা হইত তবে দেবেন্দ্রনাথ সেই বিবাহে উপস্থিত

১। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত : পৃ ৬৮

২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী : পৃ ২১৪

থাকিতেন। দেবেন্দ্রনাথের ধারণায় ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম— ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এদেশ ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না।"[১]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই অক্ষয়কুমার দত্তর (১৮২০-১৮৮৬) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই অক্টোবর) রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতিথিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে সভার নাম তত্ত্বরঞ্জিনীর স্থলে তত্ত্ববোধিনী রাখা হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজশরীরে লীন হয়। ঈশ্বর গুপ্তর প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় অক্ষয়কুমার ঐ সভার সভ্য হন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে অক্ষয়কুমার ইহার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল পাঠশালা বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হইলে অক্ষয়কুমারের পক্ষে কলিকাতা ছাড়া সম্ভব নয় বলিয়া তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হইলে অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক-পদে বৃত হন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় আত্মীয় সভা স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি ও অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক হন। ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সমাজের উপাসনার পর মহর্ষির বাড়ীতে সভা আহূত হইত। এই সমাজের উপাসনাকার্য প্রথমে সংস্কৃতে এবং পরে তাহার বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইত। অক্ষয়কুমার ও তাঁহার

১। প্রধান আচার্য: ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত: পৃ ৪২-৩

অনুচরেরা বাঙ্গালায় উপাসনাকার্য প্রবর্তিত করিতে চাহিলে দেবেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন না।

আত্মীয়-সভা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,

'ওদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত একটা "আত্মীয়-সভা" বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, "ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ কি না?" যাহার যাহার আনন্দ-স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইত।'[১]

'একদিন সভার কার্যারম্ভ হইলে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্।" অক্ষয়বাবু বলিলেন, "সর্বশক্তিমান্ নন, বিচিত্র শক্তিমান্।" তিনি বলেন, "কি! ঈশ্বরের মহিমা ও সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আমরা এখনও সন্দিহান!" এই সকল কারণে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ার জন্য আত্মীয় সভা উঠিয়া যায়।'[২] অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম ছিলেন: কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। যে সমীকরণ দ্বারা তিনি প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করেন তাহা এই:

পরিশ্রম = শস্য; প্রার্থনা ও পরিশ্রম = শস্য, অতএব প্রার্থনার শক্তি = ০[৩]

তাঁহার ধর্মমতসম্বন্ধে 'অক্ষয়-চরিতে' লিখিত আছে, "একদা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটন করিয়া যখন পীড়িতাবস্থায় নৌকা করিয়া চুপীর বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন আরোগ্যলাভের জন্য গৃহ-প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্তু পৌত্তলিকও ছিলেন না। তবে কি ছিলেন? তিনি যাহা ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার পরম সুহৃৎ বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রকাশিত হইল;—

"The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu sects."[৪]

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী: পৃ ২২০

২। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস: অক্ষয়-চরিত: কলিকাতা ১৮৮৭: পৃ ৩০

৩। ঐ : পৃ ৩৯

৪। ঐ : পৃ ৩৯-৪০

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা এই লইয়া ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল দেবেন্দ্রবাবুর সহিত যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কারবিষয়ে অগ্রসর অক্ষয়কুমারের তর্ক উপস্থিত হয়। শেষে ঠিক হয় যে, বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলা যায় না, কেননা উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে লিওনার্ড (Leonard) লিখিয়াছেন,

"There were conflicts of opinion between Devendra Náth Thákur and Akshay Kumár Datta, on the question of Vedic infallibility, the latter being against the doctrine of such infallibility. Finally truth triumphed, the Bráhma Samáj abjured the said doctrine (the Vedas as the revealed work of God)."[১]

দেবেন্দ্রনাথের মতে পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা স্ত্রীলোকদের ব্রহ্মোপাসনা করা উচিত। কেবল চিন্তনাদি দ্বারা ব্রহ্মের আরাধনা করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক, সাধ্যায়ত্ত ও সহজ কাজ নহে, বিশেষতঃ এদেশীয় অশিক্ষিত নারী-জাতি তো আবার দুর্বল অধিকারী। তাই দেবেন্দ্রবাবু স্থির করেন যে, স্ত্রী-লোকেরা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবে। এমন কি তিনি এইরূপ কার্য করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়ার কোন বৈদ্যপরিবারে তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা উপদেশ করান। কিন্তু অক্ষয়বাবুর বুদ্ধি-শক্তি ও চিত্ত-প্রবৃত্তি বিশাল ও দূরদর্শী। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন।[২]

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, পরমেশ্বর তাহা অতিক্রম করিয়া কোন কার্য করেন না। প্রাকৃতিক নিয়মই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত

১। S. Leonard : History of the Bráhma Samáj : Calcutta 1879, page 90.

২। মহেন্দ্রনাথ রায় : শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত : কলিকাতা ১৮৮৫ : পৃ ৯০-১

নিয়ম। মানুষের তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলে অভিপ্রেত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মবলে যাহা সংঘটিত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই। তাঁহার মতে "মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।"[১] একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে কোন সাধারণ বিষয়ের নিমিত্ত ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব হয়। অক্ষয়বাবু প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়।

অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্মের ক্ষেত্রে আর একটি মতের প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানের আকর, সুতরাং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যের কার্যের নিয়ামক হওয়া উচিত। ব্রাহ্মধর্ম বিজ্ঞান-সম্মত ও অবনী-মণ্ডলের হিতগর্ভ মহোপকারক হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মেরা বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনার, আত্মপরিজনের, স্বদেশীয় জনসমাজের ও সমগ্র মানব-কুলের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান-পূর্বক সর্বাংশে ভূলোকের হিত-সাধন করাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ও আপনাদের প্রকৃত ধর্মকর্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত। এইজন্য ইনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'ধর্মনীতি' ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। যখন বিশ্ব-গ্রন্থই ব্রাহ্মদের ধর্ম-পুস্তক, তখন বিজ্ঞানই সেই ধর্মপুস্তকের প্রকৃত জ্ঞান। বিজ্ঞান-গ্রন্থই তাহার ব্যাখ্যা পুস্তক।[২]

অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন,

"পরমেশ্বরকে প্রীত করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম। যে সমস্ত কার্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াও তাহার সাধন করা কর্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্যই তাঁহার প্রিয় কার্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।"[৩]

১। অক্ষয়কুমার দত্ত: ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় সং, ২য় ভাগের উপক্রমণিকা: কলিকাতা ১৯০৭: পৃ ৪০

২। মহেন্দ্রনাথ রায়: শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত: পৃ ১০০-১

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত: বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ৫ম সং ২য় ভাগ: কলিকাতা ১৮৭৩: বিজ্ঞাপনের পৃ ৫

অক্ষয়বাবুর মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য করাই ধর্ম এবং না করাই অধর্ম। যাহাতে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তির যুগপৎ উন্নতি-সাধন হয়, ব্রাহ্মধর্মে তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন,

"সমুদয় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলে, অশেষবিধ বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য।"[১]

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন,

"বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।..... বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হইলে, ভক্তি-বৃত্তি সৃষ্ট ও মনকল্পিত বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।"[২]

মানব-প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "যৎপরিমাণে আমাদের মানব-প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তু বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, তৎপরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য-বিষয়ক জ্ঞানেরও আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব।"[৩]

অক্ষয়কুমার নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,

"জীবহিংসা (সুতরাং আমিষ ভোজন) যেমন আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির অভিমত নহে, সেইরূপ তাহা আমাদের অহিতকারী ব্যতীত কদাপি হিতকারী নয়, কারণ মৎস্যমাংস আহার করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়।"[৪]

১। অক্ষয়কুমার দত্ত : বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ২য় ভাগ : পৃ ৩-৪

২। অক্ষয়কুমার দত্ত : ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ সং : কলিকাতা ১৮৯৪ : পৃ ১২

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত : বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ২য় ভাগ : পৃ ১০-১

৪। অক্ষয়কুমার দত্ত : বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ১ম ভাগ ৭ম সং : কলিকাতা ১৮৭১ : পৃ ১৮১

অক্ষয়কুমার মদ্যপানকে সমর্থন করিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহারা কহেন, মদ্যপান করিলে যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্মপ্রবৃত্তিও বর্ধিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের একথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি মদিরা পান করিলে, ধর্মপ্রবৃত্তিসকল প্রবল হইত, তাহা হইলে ভূমণ্ডল অত্যল্পকালে অক্লেশে ধর্মরূপ সুধারসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। প্রত্যুত, তদ্দারা কামজিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীতে পাপতাপ প্রবল করিতেছে।"[১]

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অক্ষয়কুমার অতি অল্পদিন ব্যতীত বরাবর মৎস্যাদি ভক্ষণ ও ঔষধার্থে নির্ধারিত পরিমাণে সুরাপানও করিতেন। তবে "বাহ্যবস্তু" লিখিবার পর কিছুদিন তিনি আমিষ ভোজন করেন নাই, একথা সত্য।

তাঁহার খাদ্যের বিষয় গুপ্ত-কবি লিখিয়াছেন,

'আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল॥
নোদে শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি।
শেষ করিয়াছে যত, দেশের গুগলি॥
নিরামিষ আহারেতে, ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তার "বাহ্যবস্তু" মানব প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি॥
... ...
মাংস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন, বিপরীত তার॥
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর, ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি, বসিলেন কেঁচে॥
... ...

১। অক্ষয়কুমার দত্ত: বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ২য় ভাগ: পরিশিষ্ট পৃ ১৭২

কোটি কোটি গ্রন্থকার, লিখেছেন যাহা।
"কুম" ধোরে একা কেন, কাটো তুমি তাহা॥'[১]

অক্ষয়কুমার বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন নাই। তিনি বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষাকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু মনের দিক হইতে কি তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন? একটি নৈতিক ও যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির উপর তিনি ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক অক্ষয়কুমার।

অক্ষয়কুমার পৌত্তলিক ছিলেন না। কিন্তু রামমোহনের পাষাণমূর্তি নির্মাণের জন্য অত ব্যগ্র হইয়াছিলেন কেন?

"মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ! অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ-প্রতিমূর্তি-দর্শনে অনুরাগী ও উদ্‌যোগী হইবেন না। এ দেশে মানব-প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্যয়ই ঘটিয়াছে।"[২]

রামমোহনের এই পাষাণমূর্তি-গঠনের আবেদন কি শুধু জাতিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আহ্বান? ইহার মধ্যে কি পৌত্তলিক মনোভাব নাই? রাজনারায়ণ বসুও অক্ষয়কুমারকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

'বেকন যথার্থই বলিয়াছেন, "Old Love can never be forgotten." রামমোহন রায়ের পাষাণ-মূর্তি এখনো হইল না বলিয়া আমাদিগের জাতিকে যে গালি দিয়াছেন, তাহারা সে গালি খাইবার উপযুক্ত।'[৩]

দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধে যদিও দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রামশিলাকে আনিতে দেন নাই, কিন্তু পিতার কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়াছিলেন। সত্যকথা বলিতে কি ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতাবর্জন অন্যতম অঙ্গ হইলেও সে সম্বন্ধে ব্রাহ্মেরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে যাইতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহাদের ধর্মের প্রধান দুর্বলতা।

অক্ষয়কুমারের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

১। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস: অক্ষয়চরিত: পৃ ৫০-২

২। অক্ষয়কুমার দত্ত: ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ২য় ভাগ: ২য় সং: কলিকাতা ১৯০৭: উপক্রমণিকা: পৃ ৩২২

৩। মহেন্দ্রনাথ রায়: অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত: পৃ ১৮১

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অক্ষয়কুমার যে উদার মতের প্রবর্তন করিতে চান তাহার বাধাস্বরূপ কতকগুলি ভ্রমকে তিনি দূর করিয়াছিলেন। বহু তর্ক করিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে এই ভ্রম হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্যগুলি এই :—

১। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র, এই মত নিরাকরণ।

২। পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মপূজার ব্যবস্থা-নিবর্তন।

৩। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করিয়া ইহার নিরাকরণ।

৪। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা-প্রবর্তন।

৫। বাঙ্গালায় উপাসনাপ্রণালীর প্রচলন।

কিন্তু 'অক্ষয়-চরিতে'র লেখক নকুড়বাবু বলিয়াছেন,

'"বেদ অভ্রান্ত ও ঈশ্বরপ্রণীত" এই মত এবং পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিরাকরণ ও "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করা (The Indian Messenger, Sunday, May, 30, 1886) প্রভৃতি কার্য যে তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রাহ্মধর্ম সঙ্কলন করিবার সময়, তিনি কোনও রূপে মহর্ষির সহায়তা করেন নাই। তবে ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্যে অক্ষয়বাবুর কোন কোন লেখা আছে। তাহাও মহর্ষির দ্বারা সংশোধিত। আদি ব্রাহ্মসমাজে "বেদ ঈশ্বরপ্রণীত ও অভ্রান্ত" এই মত এক সময়ে প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি আচার্যগণ এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা তদনুযায়ী উপদেশ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন নামে জনৈক উপাচার্য রাম-অবতার বিষয় পর্যন্ত বেদি হইতে বক্তৃতা করেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মত রহিত করেন। তিনি ইহাতে কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজে কখনও পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধি ছিল না ; অক্ষয়বাবু কর্তৃকও তাহা রহিত হয় নাই। একবার কাঁচড়াপাড়া নিবাসী লোকনাথ রায় ও জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয়দিগের বাটীতে শ্রীধর ন্যায়রত্ন কর্তৃক এরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বিশেষরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া ইহাতে মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই এক বিশেষ ঘটনা, এরূপ কার্যের আর কুত্রাপিও অনুষ্ঠান হয় নাই।'[১]

১। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত : পৃ ৪০-১

"বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত" এই মত যে আদি ব্রাহ্মসমাজে ছিল ইহার উল্লেখ দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে এবং রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে আছে। নকুড়বাবুও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই ভ্রম কাহার দ্বারা দূরীভূত হয় এই কথার কোন উল্লেখ দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে নাই। তবে অক্ষয়কুমারের দ্বারা যে এই ভ্রম দূরীভূত হয় একথা রাজনারায়ণবাবু স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।[১] ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। রাম-অবতার বিষয়ে বক্তৃতা রহিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদকে যে সমর্থন করেন না ইহারই প্রমাণ দিয়াছেন ; বেদের অপৌরুষেয়ত্বে তাঁহার অবিশ্বাসের কথা কোথায় ?

মহর্ষি অক্ষয়কুমারের রচনা সংশোধন করিতেন এ কথা ঠিক। কিন্তু তিনি শুধু ধর্মবিষয়ক রচনাগুলিই বিশেষভাবে সংশোধন করিতেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়নের সময় অক্ষয়কুমার মহর্ষির মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন একথা দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে বলিয়াছেন।[২] সুতরাং তিনি সাহায্য করেন নাই একথা ঠিক নয়।

অক্ষয়কুমারের রচনা বিদ্যাসাগর বিশেষ করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন একথা বিদ্যাসাগর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন।

"তিনি বলিতেন—অক্ষয় লিখ্‌তে-টিখ্‌তে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।"[৩]

পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা যে একবারও পূজা হইয়াছিল একথা নকুড়বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তবে ইহার রহিত করণে যে অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টা ছিল না তাহারই বা প্রমাণ কি ? অক্ষয়কুমার প্রথম অবস্থাতেই বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া হয়ত ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা। ধর্মবিষয়ে তাঁহার মনকে যে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয় তাহার নাম 'Travels of Cyrus by Chevalier Ramsay.' এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন,

'যেখানে মিশর দেশের পুরোহিতেরা সাইরস রাজাকে বুঝাইতেছে যে,

১। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত : পৃ ৬৭-৮

২। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ ১৭৬

৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়) : কলিকাতা ১৯১৩ : পৃ ৫৩

মিসরিক পুরাণ কেবল রূপক মাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে হিন্দুধর্মও ঐরূপ। মন এইরূপে খুলিয়া গেলে আমি পুত্তলিকাপূজা হইতে বিরত হই। সরস্বতী পূজা সম্মুখে উপস্থিত, তাহা করিলাম না। ইহাতে আমার মনে হয় আমার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যেহেতু তাঁহার মত ছিল, "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ"; কিন্তু সেই অবধি পৌত্তলিকাচার না করিলে আমাকে আর কিছু বলিতেন না।"[১]

ইহার পর রামমোহন রায়ের "An Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus'" এবং চ্যানিঙ্গের (Channing) গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান হন, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হইয়া পরিশেষে কলেজের পাঠ শেষ করিবার পূর্বে Hume পড়িয়া সংশয়বাদী হন।

ইয়ংবেঙ্গলের দল হইতে রাজনারায়ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। হিন্দু কলেজে পঠদ্দশায় তিনিও মদ্যপান ও গোমাংস আহার করিতে আরম্ভ করেন। অপরিমিত মদ্যপানের জন্য একটি উৎকট ব্যাধি জন্মানোতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরেই রাজনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী ও তৎপরে পিতার মৃত্যু হয়। উভয়ের মৃত্যু তাঁহার সংশয়বাদী মনকে প্রকৃতিস্থ করিল এবং তাঁহার সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্মে বিশ্বাস জন্মিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন তিনি যে জাতিভেদ মানেন না ইহা দেখাইবার জন্য বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজনারায়ণ তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকের কর্মে ষাট টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি ক্রমে ক্রমে কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তর্জমা করেন।

এই সময় রাজনারায়ণ সমাজে বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন,

"পূর্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত (সে সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয়বাবু

১। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত : কলিকাতা ১৯০৮ : পৃ ১৬

একজন) তাহার বক্তৃতা জ্ঞানপ্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতাসকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধহয় আমি দাওয়া করিতে পারি।"[১]

রাজনারায়ণ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়নে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন। "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়" ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ এবং "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়" এই প্রার্থনাটুকু তাঁহার দ্বারা প্রবর্তিত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী হইতে লওয়া হয়।[২]

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি অবসর লন।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরনিবাসী শিবচন্দ্র দেবের দ্বারা সংস্থাপিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু ইহাকে পুনরুদ্ধৃত ও উদ্দীপ্ত করেন। রাজনারায়ণের অধিকাংশ বক্তৃতাই মেদিনীপুর সমাজে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার ধর্মতত্ত্বদীপিকার রচনা মেদিনীপুরেই আরম্ভ ও শেষ হয়। ব্রাহ্মধর্ম পরম সত্যধর্ম ইহা দেখান ও তাহার তথ্যসকল ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। রাজনারায়ণ এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্মসম্বন্ধীয় স্থূল বিষয়সমূহের সন্নিবেশ করিয়া ইহাকে ব্রাহ্মধর্মের পুরদ্বার স্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মসাধন পুস্তকও মেদিনীপুরে রচিত হয়। এই পুস্তকের সাধারণভাব Upham's Interior Life হইতে নীত। তবে ইহাতে লেখকের নিজস্ব কথাও আছে। রাজনারায়ণ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,

"এই ব্রাহ্মসাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে লোকে উহার তত্ত্বসকল আপনার জীবনে উপলব্ধি না করিলে এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না। কেশববাবু আমার ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণবিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন।"[৩]

রাজনারায়ণের ব্রাহ্মধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ

১। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত : পৃ ৫২
২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত : পৃ ৬৩
৩। ঐ : পৃ ৭৮

ব্রাহ্মধর্মমতে দেওয়া। এই বিবাহে কেশববাবু প্রধান আচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী আচার্যের কর্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কর্ম করেন।

মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজনারায়ণ জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা স্থাপন করেন। এই সভার কার্যবিবরণ হইতে 'Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal' রচিত হয়। উক্ত Prospectus বা অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই 'নেশানাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র উক্ত বিবরণগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য হিন্দুমেলা (চৈত্রমেলা বা জাতীয় মেলা নামেও পরিচিত) স্থাপন করেন। সত্যকথা বলিতে কি এদেশে যাঁহারা জাতীয়তাবোধ জাগরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে রাজনারায়ণ একজন। তিনি শুধু ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে প্রীতির সঞ্চারই করেন নাই, তিনি ব্রাহ্মধর্মকে একটি জাতীয় রূপও দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মধর্ম এদেশের জাতীয় ধর্ম, ইহাকে একটি জাতীয় রূপ দান করা সকল ব্রাহ্মের কর্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন এক পত্রে লেখেন,

"We should adopt a national form of divine worship, a national theistic text book and national ritual as far as all this could be done consistently with dictates of conscience."[১]

রাজনারায়ণ চিরদিন হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,

"আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র মনে করি।"[২]

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক বক্তৃতাতে তিনি এই কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

১। যোগেশচন্দ্র বাগল : রাজনারায়ণ বসু : কলিকাতা ১৯৪৫ : পৃ ৫১

২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত : পৃ ৮৬

রাজনারায়ণ বসু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনারায়ণের প্রভাবে তাঁহার জেঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও তাঁহার সহোদর মদনমোহন বসু বিধবা-বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে হয়। তিনি নরপূজাকে সমর্থন করেন নাই। নরপূজার বিরুদ্ধে 'Brahmic Advice, Caution and Help' গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তিনি জাতিভেদকে সমর্থন করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরে প্রীতি ও মনুষ্যে প্রীতি রাজনারায়ণের মতে ধর্মের মর্মকথা। তাঁহার 'The Essential Religion' প্রবন্ধে আছে,

"Love of God and Love of Man constitute the essence of religion".[১]

রাজনারায়ণ সারধর্মের অনুষ্ঠান ও প্রচারের তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, মতামত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্যসাধনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান; দ্বিতীয়, প্রচারসময়ে মতামত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা ধর্মের সারভাগ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্যসাধনের উপর বিশেষ জোর প্রদান; তৃতীয়, সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন করিয়া সকল মানুষের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন।[২]

ব্রাহ্মধর্মের উদার ধর্মমতকে লক্ষ্য করিয়া রাজনারায়ণ বলিয়াছেন,

"লোকের ধর্মমত আক্রমণ না করিয়া ধর্মে লওয়ানো ব্রাহ্মধর্মে ব্রহ্মাস্ত্র; এই প্রণালী দ্বারা তিনি বিশ্ববিজয়ী হইবেন। এক্ষণে ব্রাহ্মেরা দুই প্রধান দলে বিভক্ত; বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ও স্বজাতি-পরবশ ব্রাহ্ম।......ইহা বলা বাহুল্য যে, লেখক শেষোক্ত দলভুক্ত।"[৩]

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজনারায়ণ প্রীতির উপর জোর দিয়াছেন। ঈশ্বরই প্রীতির বস্তু এবং এই প্রীতি মনুষ্যের সকল কর্মের মূল। তিনি বলিয়াছেন,

"ঈশ্বর আমাদের একমাত্র প্রকৃত প্রেমাস্পদ বস্তু। প্রীতি এই বিশ্বের জীবন

১। Rajnarain Bose : The Essential Religion : Calcutta 1886 : p. 2.

২। রাজনারায়ণ বসু : সারধর্ম : কলিকাতা ১৮৮৬ : পৃ ৫

৩। ঐ : পৃ ২২

স্বরূপ। আমাদের সকল উদ্বোধ, সকল ভাব, সকল বাক্য, সকল কার্যের মূল প্রীতি।"[১]

ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা মনুষ্যের কি লাভ হইতে পারে এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বলেন,

'ব্রাহ্মধর্ম এমন কোন স্থান নির্দেশ করিয়া দেন না যে সেখানে গেলেই আমাদের সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম, সকল স্থখ লাভ হইবে। কিন্তু কোন কালে আমাদের আত্মার উন্নতির বিরাম হইবে না। আমরা এক লোক হইতে অন্য উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" স্বর্গ হইতে স্বর্গ, সুখ হইতে উৎকৃষ্টতর সুখভোগ করিতে থাকিব। বিষয়-সুখ নয় কিন্তু ব্রহ্মানন্দ।'[২]

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম-বৎসর ১৭৫০ শক (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ) দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার যোগ হওয়া পর্যন্ত এই মধ্যকালবর্তী সময়ে কোন বিশেষ উন্নতিসূচক পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই পত্রিকা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষয়বাবুর বিশেষ যত্নে দিন দিন উন্নতির সহিত পরিচালিত হয়। "সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করত তিনিই ব্রাহ্মধর্মকে স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্মের পত্তনভূমি বুদ্ধি ও যুক্তি। বুদ্ধিকে নেতা করিয়া তিনি ব্রাহ্ম-ধর্মকে অতি কঠোর বৌদ্ধ-ধর্মের আকারে প্রচার করিয়াছিলেন।"[৩]

রামমোহন যে তিনটি মহৎ অভাব অপূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা দেবেন্দ্রনাথ পূরণ করিয়া দেন। প্রথমতঃ তিনি অচিহ্নিত উপাসকমণ্ডলীকে দলবদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের বীজ ও কয়েকটি মূলমত প্রস্তুত করিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন। তদনন্তর উপাসনার প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পূর্বেকার উপাসনাপ্রণালীর স্থলে সংস্থাপন করেন। পরিশেষে আপনার

১। রাজনারায়ণ বসু: ধর্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ: কলিকাতা ১৮৪৭: পৃ ৩৩
২। ঐ : পৃ ৮১
৩। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত: কলিকাতা ১৮৭১: পৃ ৯৫

স্বাভাবিক বুদ্ধি ও কৌশলে এবং কাশী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞ পণ্ডিত চারিজনের ও অক্ষয় দত্তের সাহায্যে বেদের অনেকানেক ভ্রমকল্পনা বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মধর্মকে সহজ-জ্ঞান-ভূমির উপর স্থাপন করেন।

শেষোক্ত বিষয়টি যদিও তাঁহার পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে এই তিনটি গুরুতর কার্য সম্পন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মধর্মের একটি নবরূপ লাভ হইয়াছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুশাস্ত্র হইতে এক ঈশ্বরপ্রতিপাদক গভীর জ্ঞানগর্ভ শ্লোক সকল সঙ্কলন করিয়া ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে "রামমোহন রায়ের কৌশল অনুসারে হিন্দুভাব রক্ষা করত পৃথিবীর আর আর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ না করিয়া হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে এই বিশ্বজনীন ধর্মকে বদ্ধ রাখা হইল।"[১]

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে রামমোহনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন বটে, কিন্তু রামমোহন যেরূপ উদার রীতিতে প্রেমের সহিত ডফ প্রমুখ খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত ব্যবহার করিতেন, দেবেন্দ্রনাথ সে ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মিশনরীরা হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা করিত। তবে এ কথা ঠিক যে, রামমোহনের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেক পরিমাণে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মায় পিতাপুত্রের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছিলেন। প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথকে খ্রীষ্টানদের সহিত একযোগে কার্য করিতে দেখা যায়। মুসলমানদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁহার তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রেও যেমন উপনিষদ্ প্রধান অবলম্বন ছিল, তেমনি প্রেমভক্তির জীবনে হাফেজের সঙ্গীত ছিল অন্যতম সহায়। রামমোহন রায়ও হাফেজের ভক্ত ছিলেন। হাফেজের সঙ্গীতের মধ্যে অনন্তত্ব ও মহিমা দেবেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হাফেজের সঙ্গীত দেবেন্দ্রনাথকে কতখানি প্রেরণা দিয়াছিল তাহার উল্লেখ তাঁহার আত্মজীবনীর অনেকস্থলে আছে। একথা ঠিক যে, হিন্দুধর্মকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী হিন্দুসমাজের মধ্যেই থাকিবে, কেবল

১। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত : কলিকাতা ১৮৭১ : পৃ ৯৯

তাহার পৌত্তলিকতা-সংস্পৃষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডের স্থলে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইবে।

দেবেন্দ্রনাথের মতের স্থুল কথা তিনটি[১] :—

১। সাধারণ মানবজাতির প্রতি কর্তব্যসাধনকে ব্রাহ্মজীবনের একটি গুরুতর অঙ্গ স্বীকার না করিয়া ধ্যান উপাসনা এবং ঈশ্বর-সহবাসের আনন্দলাভের জন্যই যত্ন করা উচিত। ব্যক্তিগত গোপনীয় চরিত্র ব্রাহ্মোচিত না হইলেও তজ্জন্য বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম নাই।

২। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কেবল হিন্দুধর্মের ও তৎসম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

৩। কেবল ঈশ্বরের করুণায় পরিত্রাণ হয় না, নিজের ক্ষমতাতেই মুক্তিলাভ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মদের মধ্যে ক্রমে হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ করিয়া কেন্দ্রগত ঐক্যকে বিনষ্ট করে। ফলে ব্রাহ্মধর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় ও 'ক্রীশ্চানির ভড়ং' ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের অলঙ্কার হইয়া উঠে। হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড যে ব্রাহ্মধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া 'কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দে' কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিয়াছেন,

"যখন ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মঅন্নপ্রাশন, ব্রাহ্মজাতকর্ম, ব্রাহ্মসূতিকাপূজো ও ব্রাহ্মউপনয়ন প্রভৃতি চল্‌চে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতীপূজো ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন?"[২]

॥ ৪ ॥

পাশ্চাত্যের শিক্ষাসভ্যতার প্রসার এবং মিশনরীদের খ্রীষ্টতত্ত্বপ্রচার এই দুই ঘটনার ফলে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল প্রতিটি হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার প্রসারে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম অথবা সামাজিক রীতিনীতির উপর কোন আক্রমণ সহ্য করেন

১। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত : পৃ ১৭৫-৭

২। কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা, কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় : কলিকাতা ১৯৩৯ : পৃ ৩১

নাই। এই তিন বিরুদ্ধধারার সংঘর্ষেই উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ সম্ভব হইয়াছিল। জে. এন. ফারকুহারের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"The answer is that the Awakening is the result of the co-operation of two forces, both of which began their characteristic activity about the same time, and that it was quickened by a third which began to affect the Indian mind a little later. The two forces are the British Government in India as it learned its task during the years at the close of the eighteenth and the beginning of the nineteenth centuries, and Protestant Missions as they were shaped by the Serampore men and Duff; and the third force is the work of the great Orientalists. The material elements of Western Civilisation have had their influence, but, apart from the creative forces, they would have led to no awakening."[১]

ইংরেজীশিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুলকলেজস্থাপন ও পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়নে হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সকলের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টধর্মপ্রচার অথবা হিন্দুধর্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা সাধারণভাবে ইংরেজীশিক্ষাবিস্তারের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই এবং এইজন্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুদের অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। তবুও শিক্ষাবিস্তারের কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদের সহিত তাঁহাদের সহযোগিতা করিতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভায় মুসলমান সভ্য ছিল।

দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার স্পৃহা সম্বন্ধে লাশিংটন বলিয়াছেন,

"Still, it is undeniable that an intercourse with Europeans has already worked a very remarkable change among the Natives, in this part of the country. Both

১। J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India: New York 1915, pages 5-6.

Hindoos, and Mohomedans give a ready and efficient support to the School Book and School Societies, as above observed. The establishment among themselves of the Vidalaya manifests an anxiety for the dissemination of knowledge, highly creditable to the wealthy and respectable Hindoos, who were concerned in it, and the readiness with which they have admitted European co-operation, displays a degree of liberality, for which our former acquaintance with the Hindoo character had not prepared us".[১]

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কোন ধর্মপুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার সোসাইটির নিয়মবহির্ভূত করা হয়।

"That it forms no part of the design of this Institution, to furnish religious books—a restriction, however, very far from being meant to preclude the supply of moral tracts, or books of a moral tendency, which, without interfering with the religious sentiments of any person, may be calculated to enlarge the understanding, and improve the character".[২]

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার কিছু পরেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোন ধর্মমত প্রচার করা এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল না।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। হিন্দু কলেজ ইংরেজীশিক্ষার প্রধান

১। Charles Lushington : The History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity : Calcutta 1824, page 222.

২। The First Report of the Calcutta School Book Society 1818, p. v.

স্থান ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে তথাকথিত ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি হয়। ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিকচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডিরোজিওর শিক্ষাদান কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকাবলীতেই সীমাবদ্ধ থাকিত না। কলেজের ছুটির পর কিংবা কলেজের বিশ্রামের সময়ে তিনি ছাত্রদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি ছাত্রদের লকি, রিড, হিউম এবং ডুগল্ড স্টুয়ার্টের রচনাবলী পাঠ করিতে বলিতেন। ইহার ফলে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ছাত্রদের লইয়া ডিরোজিও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। মাণিকতলার শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই স্থানে ডিরোজিওকে সভাপতি এবং উমাচরণ বসুকে সেক্রেটারী করিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা সাহিত্য ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ, বিতর্ক ও আলোচনা করিত। তাহাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অনেক-ক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিত।

ছাত্রেরা প্রচলিত রীতিনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া বেড়াইতেন। মুসলমানের দোকান হইতে বিস্কুট কিনিয়া খাওয়াকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য জয় বলিয়া মনে করিতেন। উইলসনের দোকানের রুটি বিস্কুট কেক লইয়া জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। ডিরোজিওর ছাত্রগণ 'এথেনিয়ম' (Atheneum) নামে একটি ইংরেজী মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লিখিয়াছিলেন, If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism. শুনিতে পাওয়া যায় যে ঐ পত্রিকার দুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন উহা বন্ধ করিয়া দেন।[১] ডিরোজিওর অধিনায়কত্বে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী

১। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : কলিকাতা ১৯০৪, পৃ ৯৩

মাসের মাঝামাঝি সময়ে ছাত্রেরা 'পার্থেনন' কাগজ বাহির করে। প্রথম সংখ্যার পরেই ইহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ডিরোজিও ছাত্রদিগকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার অন্তঃসারশূন্যতা হইতে মুক্ত থাকিতে বলিতেন। তাঁহার মতে কলেজ বয়ের অর্থ হইতেছে সত্যানুসন্ধানী। "তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।"[১]

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

"The junior students caught from the senior students the infection of ridiculing the Hindu religion and where they were required to utter mantras or prayers, they repeated lines from the Iliad. There were some who flung the Brahmanical thread instead of putting it on".[২]

হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। আদেশ প্রচারিত হইল,

"The managers of the Anglo-Indian College, having heard that several of the students are in the habit of attending Societies at which political and religious discussions are held" (the discussions which led to the first Reform Bill were agitating the band of lads influenced by Derozio), "think it necessary to announce their strong disapprobation of the practice, and to prohibit its continuance. Any students being present at such a society after the promulgation of this order will incur serious displeasure."[৩]

১। রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং : কলিকাতা ১৯৫১ : পৃ ৩২

২। Peary Chand Mittra : David Hare : Basumati Sahitya Mandir edition : Calcutta 1949, pages 17-8.

৩। Thomas Edwards : Henry Derozio, the Eurasian Poet, Teacher and Journalist : Calcutta 1884, page 70.

এই আদেশ জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র হিন্দু কলেজের ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু দেওয়ান রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু ম্যানেজারগণ ডিরোজিওকে কলেজ হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিও ডেভিড হেয়ার ও এইচ. এইচ. উইলসন ডিরোজিওর সপক্ষে মত ব্যক্ত করিলেন, তবুও অধিকাংশ সভ্যদের মতানুসারে তাঁহাকে কলেজ হইতে অপসারিত করাই স্থির হইল।

ডাঃ উইলসন ডিরোজিওকে কমিটির সিদ্ধান্ত জানাইলে ডিরোজিও ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে লিখিত উইলসনের পত্রে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির একটি আভাস পাওয়া যায়।

ডাঃ উইলসন ডিরোজিওকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

"Do you believe in a God? Do you think respect and obedience to parents no part of moral duty? Do you think the intermarriage of brothers and sisters innocent and allowable? Have you ever maintained these doctrines by argument in the hearing of your scholars?."

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ডিরোজিও অভিযোগগুলির উত্তর দিয়া উইলসনকে একটি পত্র লেখেন। তিনি অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন।

ডিরোজিওর অপসারণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিন্দুপ্রধানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের আন্তরিক পক্ষপাতী হইলেও সেই শিক্ষাবিস্তারের সূত্রে কোন মতবাদ প্রচার অথবা সামাজিক ও ধর্মনৈতিক রীতিনীতির প্রতি আক্রমণ সহ্য করেন নাই। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান হিন্দু কলেজের নিয়মাবলীতে দেখা যায় যে, এই কলেজে কেবল সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু সন্তানগণই শিক্ষা পাইবেন বলিয়া নিয়ম ছিল।

"The primary object of this Institution is the tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages, and in the literature and science of Europe and Asia".[১]

১। Peary Chand Mitra: David Hare: Appendix A, page i.

কোন ধর্মপ্রচার এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল না।

এই যুগে স্ত্রীশিক্ষাকে লইয়া এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা সমাজের মন গৃহমুখী আর এই গৃহের কর্তৃত্ব নারীর। তাই অনেকে আশঙ্কা করিলেন যে, নারী শিক্ষিতা হইলে তাহার মন বহির্মুখী হইবে এবং বাঙ্গালী সমাজের ভারকেন্দ্রের পরিবর্তনে বিপর্যয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

এই সময় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রীলোকদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মিশনরীরাই ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মিস কুক নামে একজন মহিলা কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অধীনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য বিলাত হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি মিশনরী মিস কুককে সাহায্যদান করিতে না পারিলেও চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাঁহাকে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সম্মত হন এবং কুক কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি জুভিনাইল স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লেডীস সোসাইটি অব নেটিব ফিমেলস্ স্থাপিত হইলে পরবর্তী জুন মাসে মিস কুকের বালিকা বিদ্যালয়গুলিও এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসে। ঐ সোসাইটির সভ্যদের দ্বারা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণে সিমুলিয়ায় সেণ্ট্রাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রক্ষণশীল সম্ভ্রান্ত হিন্দুরাও সমর্থন করিয়াছিলেন। সেণ্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজা বৈদ্যনাথ কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ রাধাকান্ত দেবের আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে ইহার একটি সংস্করণ বাহির করেন।

স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রসম্মত ইহা গৌরমোহন এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে নানা উদাহরণ যোগে প্রমাণ করিয়াছেন।

"যদ্যপি স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিখিতে শাস্ত্রে এবং ব্যবহারে কোন দোষ থাকিত তবে পূর্বকার সাধ্বীস্ত্রীগণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না। মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা,

অনস্থয়া, বাহ্বট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী, রুক্মিণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, মালতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী, খনা প্রভৃতি পূর্বকার স্ত্রীসকল নানাশাস্ত্র পড়িয়া সেই ২ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন। এবং এখনকার রাণীভবানী, হঠী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী, ইহারাও লেখাপড়া এবং নানাশাস্ত্র ও দর্শনবিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাঁহাদের কোনরূপে মানহানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই, বরং সুখ্যাতি বাড়িয়াছে।"[১]

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রধানেরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রচারের চেষ্টাকে সমর্থন করিয়াছেন। অর্থকরী বিদ্যোপার্জনের আবশ্যকতাকেও তাঁহারা শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"অতএব অর্থকরী বিদ্যোপার্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধি বটে এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাঁহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজকর্ম [২৪] নির্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না।"[২]

সাহেবেরা ধর্মশীল ও সুবিচারক এবং তাঁহারা ধর্মার্থে পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন এ কথা ভবানীচরণ লিখিতে দ্বিধা করেন নাই।

"ন, উ, সাহেবরদিগের অভিপ্রায় আমি কি প্রকারে বলিতে পারি আমার বিবেচনা দ্বারা এই হয় যে তাঁহারা ধর্মার্থে পাঠশালা করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা অত্যন্ত ধর্মশীল এবং সুবিচারক এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে দরিদ্রলোকের বালকদিগের বিদ্যাউপার্জনের কোন পন্থা নাই তাহাতেই দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পাঠশালা বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন।"[৩]

কিন্তু কোন কোন প্রগতিশীল আন্দোলনকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সমর্থন করেন নাই। ভবানীচরণ ও রাধাকান্তের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা সহমরণপ্রথার সপক্ষে আন্দোলন উপস্থিত করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন

১। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার: স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত: কলিকাতা ১৯৩৭: পৃ ১৭

২। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কলিকাতা কমলালয়: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত: কলিকাতা ১৯৩৬: পৃ ১৩

৩। ঐ : পৃ ৪৫-৬

করেন এ আন্দোলন তাহারই প্রতিক্রিয়া। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র ও রামগোপাল মল্লিক বেণ্টিঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া সতীদাহপ্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। সতীদাহনিবারণ-আইন জারি হইলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী রক্ষণশীল হিন্দুরা স্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত যে ধর্মসভা স্থাপন করেন ভবানীচরণ তাহার সম্পাদক ছিলেন। সতীসহমরণধর্মনিবারণের আইননিবারণ এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই সভার অন্যান্য উদ্দেশ্য বিষয়ে ভবানীচরণের জীবনীতে আছে।

"…এই সভার দ্বারা ভ্রষ্টাচারি কুপথবিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু সন্তানদিগের মতগর্ব খর্ব হইয়া সনাতনধর্ম উজ্জ্বল আছে, নানা দেশীয় ধার্মিকগণ ধর্মবিষয়ে নির্যাতন প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য কার্যসিদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, এই মহাসভার শাখাসভা নানা প্রদেশে অর্থাৎ ঢাকা পাটনা দানাপুর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে ২ স্থাপিত হইয়া ধার্মিকবর্গের ধর্ম রক্ষা হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভা রাজদ্বারে আবেদন দ্বারা হিতৈষণী হইয়া থাকেন, পাদ্রিসাহেবেরা বিদ্যাদানচ্ছলে হিন্দু বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করিতে নিতান্ত যত্নবান্ তন্নিবারণ কারণ শীল্‌স ফ্রি কলেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বংশ্য বালক বৃদ্ধাতুর বিধবাদি গ্রাসাচ্ছাদনে অবসন্ন হইলে এই সভা দ্বারা দানপত্রী হইয়া যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তিস্বরূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন ইত্যাদি প্রকার দেশীয় নানা মঙ্গল এই সভা দ্বারা হইয়া থাকে,……"[১]

ধর্মসভার মুখপত্র ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'। প্রথমে ভবানীচরণ কলুটোলা-নিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্তের সহিত মিলিয়া 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। কিন্তু ধর্মবিষয়ে অংশিগণের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় ১৩শ সংখ্যা বাহির হইবার পর 'সম্বাদ কৌমুদী'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশ

১। ধর্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্ট শ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ: কলিকাতা ১৮৪৯ : পৃ ১৭-৮

ঘটান। মতানৈক্যের প্রধান কারণ এই যে উক্ত পত্র সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে ছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। কৃষ্ণমোহন দাস ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'সম্বাদ তিমিরনাশক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র রক্ষণশীল দলের সপক্ষে ছিল।

ধর্মসভার বিশিষ্ট সদস্য বা সভাধ্যক্ষ ছিলেন রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আশুতোষ দে, গোকুলনাথ মল্লিক ও বৈষ্ণবদাস মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভা সম্পাদক ছিলেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুযারী সংস্কৃত কলেজে ধর্মসভার প্রথম উদ্বোধন হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সহমরণপ্রথানিবারণ-আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য এই সভা মুখ্যত স্থাপিত হইলেও নানাভাবে হিন্দুধর্মের স্বার্থরক্ষা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুশাস্ত্রাদি বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া এই সভায় স্থির হয়। যে সকল লোক হিন্দু অথচ হিন্দুধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল। ১২৩৬ সালের (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের) ২৬শে মাঘ কাশীপুরে প্রাণনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে ধর্মসভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে,…"যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহাদিগের সহিত কাহার আহারব্যবহার থাকিবেক না।"[১]

পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ধর্মসভা সতীদাহনিবারণ-আইন রোধ করিতে পারে নাই। কেননা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ রক্ষণশীল দলেরই এক শক্তিশালী অংশ এই ঘৃণ্য নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইঁহারা সফল হন। রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি ধর্মসভার সদস্য হিন্দু কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষায় প্রণোদিত ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিবার জন্য তাঁহারা ডিরোজিওকে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ডঃ তৃতীয় সংঃ কলিকাতা ১৯৪৯ঃ পৃ ৩০৬

প্রাপ্তবয়স্কেরা এবং যাঁহারা স্কুলকলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহারা যাহাতে পরবর্তী জীবনে বিদ্যাচর্চা করিতে পারেন তাহার জন্য গৌড়ীয় সমাজ নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল। ৬ই ফাল্গুন ১২২৯ সালে (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দু কলেজের এক সভায় এই সমাজ গঠনের প্রস্তাব হয়। এই সভার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রামজয় তর্কালঙ্কার, উমানন্দন ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কাশীকান্ত ঘোষাল, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, কালাচাঁদ বসু, রামচন্দ্র ঘোষ, রামকমল সেন, কাশীনাথ মল্লিক প্রভৃতি। হিন্দুধর্মশাস্ত্রের কেহ নিন্দা করিলে তাহার উত্তর লিখিতে হইবে—এইরূপ আলোচনাও করা হয়। রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেক্রেটারী মনোনীত হন। দেশের হিতার্থে ও সমাজ বন্ধকরণার্থে এই সমাজের সৃষ্টি হয়। এই সমাজে বেদ পাঠারম্ভের সংবাদও পাওয়া যায়।[১]

নব্যশিক্ষিত আচারভ্রষ্ট দেশবাসীদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য ভবানীচরণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ টীকাটিপ্পনীসমেত পুঁথির আকারে তুলটকাগজে পুনর্মুদ্রিত করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। 'শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা'র বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,

"চন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের নিমিত্তে ৩২ টাকা তদ্‌ভিন্নান্য গ্রাহক ৫০ টাকা স্থির করিয়াছি···। সমাচার দর্পণ, ২৫ আগষ্ট, ১৮২৭।"[২]

ইহা ছাড়া ভবানীচরণ 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক', 'মনুসংহিতা', 'ঊনবিংশ সংহিতা', 'রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব', 'নব্যস্মৃতি' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করেন।

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড তৃতীয় সং ঃ কলিকাতা ১৯৪৯ ঃ পৃ ১০-১

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ সং ঃ কলিকাতা ১৯৪৭ ঃ পৃ ৩৪

দেশবাসীদিগকে স্বধর্ম ও স্বভাষানুরাগী করিতে ভবানীচরণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী সক্রিয় ছিল। প্রমথনাথ শর্মণ ছদ্মনামে ভবানীচরণ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'নববাবুবিলাসে'র ভূমিকায় আছে,

"……নববাবুবিলাস নামৈক পুস্তক বিশিষ্ট শিষ্টানুষ্ঠিত বিধিত নিত্য নৈমিত্তিক দৈব পৈতৃক কাম্যাদি ধর্মকর্মানুষ্ঠানবিবর্জিত স্বীয় ধর্মচ্যুত অন্য ধর্মাশ্রিত পুরুষের বহুতর দোষশ্রুতিপুরঃসর বহুতর বেদ পুরাণাদিসম্মত পথগামী পুরুষের ছলক্রমে পুরুষার্থবোধিত প্রকাশ হইবেন ইতি।"[১]

ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'নববিবিবিলাস' সম্ভবত ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণের জীবনীতে আছে,

"…প্রথমত নববাবুবিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান্ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন। তদনন্তর ১২৩০ সালে (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে নগরস্থ কুবর্ত্মগামি ধনিগণের কুরীতি দুর্নীতি দোষ দর্শিত হয়।"[২]

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত এক পত্রে তদানীন্তন সমাজে ভবানীচরণের ব্যঙ্গপুস্তকগুলির প্রভাবের উল্লেখ আছে।

"…এক্ষণে নূতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতিবত্নীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদারগমনে শেষবিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবুবিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতীবিলাস এর অপূর্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিয়াছেন।…"[৩]

১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: নববাবুবিলাস: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত: কলিকাতা ১৯৩৭: পৃ ১০

২। ধর্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্ট শ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ: কলিকাতা ১৮৪৯: পৃ ১৫

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ সং: কলিকাতা ১৯৪৭: পৃ ২৬

পূর্বে বলিয়াছি খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার জন্য হিন্দুদের রক্ষণশীল দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সুরু হয় এবং কেহ কেহ হিন্দুসমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। রক্ষণশীল দলের প্রধান প্রধান নেতা হইলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ঠিক এই দলে বিদ্যাসাগরকে ফেলা যায় না। রক্ষণশীল তো তিনি একেবারেই নন, বরং তৎকালীন বহু প্রগতিশীল ব্যক্তির অপেক্ষা তিনি অগ্রসর ছিলেন। যাঁহারা সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরই প্রধান। কিন্তু তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য তাঁহাকে লইয়া স্বতন্ত্র ধর্মের কোন ধারার সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইল না।

কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল সকল হিন্দুই পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার ও প্রাচ্য শিক্ষাসংস্কারে তৎপর হইয়াছিলেন। উভয় দলই সমাজের নৈতিক মান উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের গোমাংস আহার, মদ্যপান প্রভৃতি অনাচারকে কেহই সমর্থন করেন নাই। আপন আপন মতানুযায়ী সকলেই দেশের কুসংস্কার দূর করিয়া দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইয়ং বেঙ্গলের উপর হেয়ার, ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। ডিরোজিও দেশের সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। ডিরোজিও ছাত্রদের হিউমের রচনা এবং টম পেইনের 'দি এজ অব রিজন্' (The Age of Reason) পড়িতে বলিতেন। ছাত্রেরা কিরূপ উৎসাহে এই গ্রন্থগুলি পড়িত ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট সংখ্যা 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভারে' তাহার উল্লেখ আছে।

হিন্দু কলেজে নাস্তিক্য-বুদ্ধির সংবাদ সুদূর আমেরিকাতেও পৌছাইয়াছিল। একজন প্রকাশক একহাজার কপি টম পেইনের বই কলিকাতার বাজারে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার প্রতি কপির দাম ছিল ২ শিলিং। কিন্তু বাজারে ঐ পুস্তকের এত চাহিদা হইয়াছিল যে কেউ কেউ প্রতি কপির জন্য আট টাকা অর্থাৎ ১৬ শিলিংও দিতে চাহিয়াছিল।[১]

১। George Smith : Life of Alexander Duff, Vol. I : London 1879, pages 144-5.

এই উক্তি হইতেই ডিরোজিওর প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গলের চিত্তচাঞ্চল্যের কথা স্পষ্ট হইবে।

ডেভিড হেয়ারের প্রভাবেও ইয়ং বেঙ্গলের নাস্তিক্যবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। হেয়ারের মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে যে মৃত্যুসংবাদ বাহির হয় তাহার এক জায়গায় লিখিত আছে,

"At the same time, it must be confessed with deep regret, that his inveterate hostility to the Gospel, produced an unhappy effect on the minds of the Native Youths who were so largely under his influence,..."[১]

এই উক্তির মধ্যে হেয়ারের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনাস্থার ইঙ্গিত রহিয়াছে। হয়ত এই জন্যই তাঁহার মৃত্যুর পর খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি রচনা করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাঁহারই প্রদত্ত হিন্দু কলেজের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন (১৮০০-১৮৬৫) হিন্দু কলেজের প্রফেসর হন। পরে তিনি প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে তিনি পুনরায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া প্রায় এক বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

জে. ই. ডি বেথুনের সহিত মতানৈক্যের ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করিয়া প্রথমে বটতলায় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান একাডেমিতে কয়েক মাস এবং পরে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনরী নামক বেসরকারী কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছিলেন,

"কাপ্তেন রিচার্ডসনের চরিত্র দোষ ছিল; তাঁহার রক্ষিতা এক বাঙ্গালিনী একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে ছিল; এ ব্যাপার চাপা রহিল না; বীটন্ সাহেব স্পষ্টই তাঁহাকে hoary-headed libertine আখ্যা প্রদান করিলেন।"[২]

১। Peary Chand Mittra: David Hare: p. 88.
২। বিপিনবিহারী গুপ্ত: পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়): কলিকাতা ১৯২৩: পৃ ১৭

ইহাই বেথুনের সহিত রিচার্ডসনের মনোমালিন্যের কারণ।

কিন্তু রিচার্ডসন উচ্চকোটির সমালোচক, কবি, সংবাদপত্রসেবী ও শিক্ষক ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে লে হাণ্টের সহিত রিচার্ডসনের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রিচার্ডসন সম্বন্ধে শ্রীবিপিনবিহারী সেন বলিয়াছেন,

"An attitude of thorough impartiality was the principal characteristic of the writer. Whenever he took up the pen to write against something, it was against measures, not men ; against folly, not individuals ; against crying evils of society, not persons guilty of continuing them."[১]

রিচার্ডসনের শিক্ষায় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে নূতন প্রেরণা ও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। তাঁহার সেক্সপীয়র নাটক পড়াইবার পদ্ধতি সর্বত্র উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া মেকলে বলিয়াছিলেন,

'I can forget everything of India, but your reading of Shakespeare.'[২]

তাঁহার ধর্মভাবসম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন,

"কাপ্তেন সাহেবের খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না।"[৩]

রিচার্ডসনের শিক্ষায় ছাত্রেরা সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করিয়া দেশের সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুগ অন্বেষণের যুগ, দুঃসাহসিক কর্মের যুগ, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নূতন প্রয়াসের যুগ।

রক্ষণশীল হিন্দুরা সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু ইংরেজী শিখিয়া স্বধর্মের আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করাকে তাঁহারা সমর্থন করিতেন না। রক্ষণশীল দলের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশে অনেক মনীষী উত্তমরূপে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু স্বধর্ম আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, ভোলানাথ সেন, কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি হিন্দুরা উত্তমরূপে ইংরেজী

১। বিপিনবিহারী সেন : National Magazine, September 1900, page 350.

২। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত : কলিকাতা ১৯০৮ : পৃ ২২

৩। ঐ : পৃ ২৪

শিখিলেও হিন্দুসমাজের পূজাপার্বণ করিতেন, নাস্তিক বনিয়া যান নাই। চন্দ্রিকা লিখিয়াছেন,

"......এ বৎসর শ্রীশ্রী৺শারদীয় পূজা শুনিতে পাই শ্রীযুতবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পূজা পূর্ব রীত্যনুসারে সুসম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র ২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহারা ইস্ মিস্ ঠিস্ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা অর্থাৎ দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবু হইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিখিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক।......

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম পিতৃকর্ম ত্যাগ করিতে হয় এ মত নহে।"[১]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'ও এই মতাবলম্বী ছিল। ইংরেজী শিখিয়া হিন্দুছাত্রেরা যেন ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না পরে, হিন্দুর আচার-ব্যবহার ত্যাগ না করে এই জন্য প্রভাকর কলেজ কর্তৃপক্ষকে সচেতন হইতে বলিত। উক্ত পত্রে এক পত্রলেখক লেখেন,

"অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এই মত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায়... .."[২]

কিন্তু হিন্দু কলেজের পক্ষসমর্থনকারীরও অভাব ছিল না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী একজন 'সমাচার দর্পণে' লেখেন,

"......যাহা হউক এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দু কালেজ স্থাপিত হওনের পূর্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।"[৩]

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ কলিকাতা ১৯৩৩ঃ পৃ ১৭৪-৫

২। ঐ ঃ পৃ ১৭২

৩। ঐ ঃ পৃ ১৬৭

কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের উৎকণ্ঠা অমূলক নহে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতা পুত্রের শিক্ষাপ্রাপ্তির পরের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,

"......পুত্রটি ঘরের কর্ম কখন ২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছুকালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার-ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsense কহে......"[১]

'সংবাদ প্রভাকরে'ও একটি হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতার মানসিক দুঃখের কথা লিখিত হয়। পিতা পুত্রকে লইয়া কালীঘাটে গেলে কালী দর্শন করিয়া পুত্র যাহা করিলেন তাহাই লিখিত আছে।

"......উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মর্ণিং ম্যাডম্......তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে কি ঝকমারি করো তোরে হিন্দু কালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতিমান সমুদায় গেল...... ।"[২]

রক্ষণশীল দলের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নব্যবঙ্গের শিক্ষিত যুবকদের আচার-ব্যবহারের প্রতি বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালিয়ানার কবি, খাঁটি বাঙ্গালা দেশের কবি। মাতৃভাষার প্রতি পরাঙ্মুখ ইংরেজীনবীশদের তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে মাতৃসম মাতৃভাষাকে যাহারা ঘৃণা করে তাহারা নরাধম। 'বড়দিন' কবিতায় দেখি,

"ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতের বুলি।
লিছু যাও কেলাম্যান্ নেটিব বেঙালী ॥"[৩]

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ পৃ ১৬৫
২। ঐ ঃ পৃ ১৭১
৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রেঃ বসুমতী সাহিত্যমন্দিরঃ পৃ ১২৫

ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি গুপ্ত-কবির উক্তি স্মরণীয়। ইয়ং বেঙ্গলের গোমাংস আহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কবি বলিয়াছেন,

"খাবার দ্রব্য অনেক আছে,
তাই নিয়ে মা চলুক খানা।
ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না॥"[১]

ইয়ং বেঙ্গলের অনাচার, বিধর্মী নাস্তিক মনোবৃত্তিকে গুপ্ত-কবি কটাক্ষ করিয়াছেন,

'সোনার বাঙাল করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কানে লাগায় ফোঁস-ফোঁসনা।
এরা না "হিঁদু", না "মোছোলমান",
ধর্ম ধনের ধার ধারে না।
নয় "মগ" "ফিরিঙ্গী", বিষম "ধিঙ্গী"
ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিত্মার বিত্মাসাগর
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।'[২]

এই সব অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে এই বিষয়ে একজন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখেন,

"এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যত্তপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ববৎ জাতিমালার এক কাছারি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে : পৃ ১৩৫
২। ঐ : পৃ ১৩৫

উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন ২ আচার-ব্যবহার ধর্মযাজন না করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক।

অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম রক্ষাকরণপূর্বক পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক ব্যাটারদিগের তামাসা দেখুন।"[১]

বাঙ্গালা সাহিত্যে পাশ্চাত্যভাবের আনয়ন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচলনের জন্য ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজীশ্রেণী খোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত হইলে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লিখিত হয়,

"আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভ অবধি রহিত কাল পর্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন।"[২]

এই যুগে কয়েকবার ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দু কলেজে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান নিয়মাবলীতে দেখা যায় যে হিন্দু কলেজের নিয়ম ছিল যে, ইহাতে কেবল সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু সন্তানগণই শিক্ষা পাইবেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হীরা বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হইলে হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। কাউন্সিল জেদ ধরিলেন যে গণিকার সন্তান হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করা হইবে না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্তপরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে চিৎপুর সিঁদুরিয়া পটীর রামগোপাল মল্লিকের বাটীতে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পরিচালন কমিটির সভাপতি হইলেন রাধাকান্ত দেব। পৃষ্ঠপোষক হইলেন মতিলাল শীল এবং

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ কলিকাতা ১৯৩৩ঃ পৃ ১৭১

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ কলিকাতা ১৯৩৩ঃ পৃ ৬

পরিচালন কমিটিতে রহিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ দেব প্রভৃতি। কাপ্তেন রিচার্ডসন ইহার অধ্যক্ষ এবং নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। রাণী রাসমণি এই কলেজটির উন্নতিকল্পে দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে কলেজটি স্কুলে পর্যবসিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে হিন্দু কলেজের স্কুলবিভাগে শুধু হিন্দুসন্তানই ভর্তি হইবে; কিন্তু কলেজবিভাগ সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য খোলা থাকিবে।

এই ঘটনার পূর্বেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেবের সহিত হিন্দু কলেজের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল। তাহার কারণটি এই। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাস বসু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কলেজ কমিটির তিনজন দেশীয় সদস্যের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব কৈলাস বসুকে কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করিবার দাবী করেন। সংখ্যা স্বল্পতা হেতু তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য হয়। ইউরোপীয় সদস্যদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য হিন্দু সমাজের মনোভাব গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনাও সম্ভব হইল না। ইহার প্রতিবাদে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজের গভর্ণর পদ ত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে গুরুচরণ সিংহ নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা এই বিষয় কমিটিকে জানাইলে ইউরোপীয় ও দেশীয় সদস্যদের মতানুসারে গুরুচরণকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রসঙ্গে কলেজের মূলনীতি লইয়া শিক্ষা কমিটির প্রেসিডেণ্ট বেথুন এবং রাধাকান্ত দেবের মধ্যে দীর্ঘকাল তুমুল বাদানুবাদ চলে। পরিশেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন রাধাকান্ত কলেজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

দেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদান লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয়। উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে চিকিৎসাবিদ্যার অবস্থা জানিবার জন্য কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। রক্ষণশীল দলের রামকমল সেন ঐ কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন। নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ঐ কমিশন স্থির করেন যে, এদেশীয়দের ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা আবশ্যক। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মেডিকেল কলেজ খোলা হয় এবং ডাক্তার ব্রামলি ইহার প্রধান অধ্যাপক হন। ১৮৩৭

খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে হেয়ার ইহার সম্পাদকপদে বৃত হন। তাঁহার উৎসাহে কলেজের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করিলে হিন্দু সমাজের মধ্যে ধর্মনাশের আশঙ্কায় তুমুল আন্দোলন হয়। বিশেষ করিয়া প্রগতিশীল দলের নেতৃবৃন্দের সহায়তায় পরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের পথ সুগম হইয়াছিল।

স্ত্রীশিক্ষা লইয়া রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকের সহায়তায় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়া চর্চার এক উত্তম সুযোগ করিয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগণও বেথুনকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বেথুন স্কুল স্থাপনের অল্পদিন পরেই রাধাকান্ত দেব নিজ গৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ২৯শে মে ১৮৪৯ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন,

"কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়। আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের একজন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গলা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন।"[১]

রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার আপনার দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি বিনাবেতনে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন এবং পাঠ্যপুস্তকের অসুবিধা দূর করিবার জন্য 'শিশুশিক্ষা' প্রণয়ন করেন।

রক্ষণশীল দলের একটি অংশ স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিলেও মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক প্রভৃতি জাতিনাশের ভয়ে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করেন নাই। ২৯শে এপ্রিল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' 'জ্ঞানান্বেষণে'র উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়,

"ইহা অবশ্য কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ পৃ ৪৪৭-৮

হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্মসভা কেবল এক দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগের ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ করেন অতএব তাঁহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণকে স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।"[১]

শিবনাথ শাস্ত্রী তদানীন্তন মনোভাব সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" মহানির্বাণতন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ী যখন রাজপথে বাহির হইত তখন লোকে যথেষ্ট কটূক্তি করিত। নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—বাপ্‌রে বাপ্‌ মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষে আছে! এক "আন" শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।"[২] স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল দলের উৎকণ্ঠা সুন্দরভাবে গুপ্ত-কবির কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন,

"আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত-ধর্ম কোর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটাচাম্‌চে ধোর্‌বে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ পৃ ৭১
২। শিবনাথ শাস্ত্রীঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজঃ কলিকাতা ১৯০৪ঃ পৃ ১৯৬

ও ভাই ! আর কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"[১]

এই সময়ের পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় তদানীন্তন ধর্মান্দোলনের ছাপ রহিয়াছে। সুতরাং এইপত্রপত্রিকার একটি আলোচনা অপরিহার্য।

ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান দুইটি মুখপত্র হইতেছে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন 'জ্ঞানান্বেষণে'র প্রথম সংখ্যার "অনুষ্ঠানে" পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিত ছিল,

"এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোন-রূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনু মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন ২ জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।"[২]

দক্ষিণারঞ্জন নামে সম্পাদক থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এই পত্রের সম্পাদকীয় কার্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। বলা বাহুল্য এই প্রগতিশীল পত্রটি রক্ষণশীল দলের নেতা 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা বিষয় লইয়া আক্রমণ করিত। ইহাতে রক্ষণশীল দলের সমর্থক 'সম্বাদ তিমিরনাশক' তর্কবাগীশ মহাশয়কে কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছিল,

"………সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্মিকবর শ্রীযুত

১। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে : পৃ ১৩৩

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নূতন সং : কলিকাতা ১৯৪৮ : পৃ ৪০

চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে……”[১]

‘জ্ঞানান্বেষণে’র গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সাপ্তাহিক ‘সম্বাদ ভাস্করে’রও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এই পত্রের পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। তর্কবাগীশ মহাশয় কিছুকাল ‘সম্বাদ ভাস্করে’র সম্পাদনও করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য ‘সম্বাদ ভাস্কর’ প্রকাশ করিতে থাকেন। ‘সম্বাদ ভাস্কর’ দেশের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন করিত এবং রক্ষণশীল দলের পরাক্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পায় নাই। ‘সম্বাদ ভাস্কর’ স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ, বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিধবা রাণী বসন্তকুমারীকে বর্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চসাহেবের সম্মুখে যে সিভিল ম্যারেজ নামক বিবাহ করেন তাহাতে ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্চায) সাক্ষী থাকেন।

ইয়ং বেঙ্গলের অপর মুখপত্র ‘বেঙ্গাল স্পেক্টেটর’ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এই ইংরেজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহা পাক্ষিকপত্রে পরিণত হয় এবং পর বৎসর মার্চ মাস হইতে সাপ্তাহিক-রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। রক্ষণশীল দলের দুইটি প্রধান মুখপত্র ছিল ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘সমাচার চন্দ্রিকা’। ইহা ব্যতীত অনেকগুলি ছোট বড় সংবাদপত্র পত্রিকা এই সময় জন্ম লাভ করিয়াছিল। ইহাদের উপর তদানীন্তন ধর্মান্দোলনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ‘সংবাদ রত্নাবলী’, ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’, ‘নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা’, ‘দুর্জনদমন মহানবমী’, ‘হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়’, ‘হিন্দুবন্ধু’, ‘সত্যধর্ম প্রকাশিকা’, ‘ধর্মমর্ম প্রকাশিকা’, ‘সর্বশুভকরী

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নূতন সং : কলিকাতা ১৯৪৮ : পৃ ৪০

পত্রিকা', 'ধর্মরাজ', 'বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা', 'অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা', 'হিন্দুরত্নকমলাকর', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এই পত্রপত্রিকাগুলি হিন্দুধর্মাচারের সমর্থন করিয়াছিল।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহা সাপ্তাহিক হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পরিচালনা করিয়াছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল ধর্মসভার মুখপত্র ছিল।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ও সাহায্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী 'সংবাদ প্রভাকর' নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে এই পত্র বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অগস্ট 'সংবাদ প্রভাকর' বারত্রয়িকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দৈনিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করিলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক হন। এই পত্রিকা হিন্দুধর্মনাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতি রক্ষণশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি এই পত্রে লিখিতেন। তবে ব্রাহ্মসমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতির সহিতও প্রভাকরের হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল।

২৪শে জুলাই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ রত্নাবলী'র প্রথম সংখ্যা মহেশচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রকৃত সম্পাদনা করিতেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এই পত্রটি আটমাস তিনদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ইহা পুনরায় প্রকাশিত হয়।

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্র ৭৩ বৎসর জীবিত ছিল।

নাস্তিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নন্দকুমার কবিরত্নের সম্পাদনায়

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী মথুরামোহন দাসগুহের সম্পাদনায় 'দুর্জনদমন মহানবমী' নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া প্রায় চার বৎসর চলিয়াছিল। এই পত্র স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মান্তরগ্রহণ, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, স্বধর্মদ্বেষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছিল।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিষ্ণুসভাসম্পাদক হরিনারায়ণ গোস্বামী 'হিন্দু ধর্ম চন্দ্রোদয়' নামক পত্র প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক বৎসর এই পত্র জীবিত ছিল।

উমাচরণ ভদ্র ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে 'হিন্দুবন্ধু' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র খ্রীষ্টধর্মের প্রতিপক্ষে ছিল।

গোবিন্দচন্দ্র দে'র সম্পাদনায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'সত্যধর্ম প্রকাশিকা' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কোন্নগর ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভার মুখপত্র স্বরূপ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা' প্রকাশিত হইতে থাকে। সনাতন হিন্দুধর্মের সারভাগ প্রকাশ করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তারকনাথ দত্তের সম্পাদনায় যে 'ধর্মরাজ' নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বধর্মপোষণ করত খ্রীষ্টধর্মদোষণ। হরিভক্তি স্থাপন করিবার জন্য ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেহালায় যে হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা গঠিত হয় তাহার মুখপত্র হিসাবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে 'বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীভাগবতী সভার মুখপত্র 'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। সনাতনধর্মের অভাব সম্ভাবনায় কতিপয় ইষ্টনিষ্ঠ ধর্মিষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ লোকের উৎসাহে শ্রীশ্রীভাগবতী সভার জন্ম হইয়াছিল। এই সভায় প্রথমে বেদান্তানুগত শাস্ত্রপাঠ, তৎপরে বক্তৃতা ও তদন্তে হরিসংকীর্তন হইত। প্রতি রবিবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে প্রদোষসময় পর্যন্ত সভা চলিত। এই পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় লিখিত ছিল,

"এতৎ পত্রিকার মুখ্য প্রয়োজন 'সম্বন্ধ তত্ত্ব' স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ

স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলাবিশিষ্ট নরাকৃতি পূর্ণব্রহ্ম। 'অভিধেয়তত্ত্ব' তদ্রাগানুগা ভক্তি। 'প্রয়োজন তত্ত্ব' ব্রজবাসি জনানুগত প্রীত্যনুগতপ্রীতি। ইহা শ্রুতিস্মৃত্যনুগত যুক্তি দ্বারা লিখিত হইবে।"[১]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'হিন্দুরত্নকমলাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই ইহার প্রকৃত পরিচালক হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তর্কবাগীশ মহাশয় প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের কার্যকলাপকে তিনি সমর্থন করিতেন। কিন্তু শেষকালে তিনি যে হিন্দুধর্ম রক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে জানা যায়। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তর্কবাগীশ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উক্ত পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার এক স্থলে আছে,

"...কাল বলে বিজাতীয় ধর্মপাল ভূপালগণ হিন্দুরাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুধর্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দুকুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দুধর্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম দুর্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন,...এই পত্র হিন্দুধর্মপক্ষের পক্ষরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব সাধারণ ধর্মপরায়ণ হিন্দুমহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন,..."[২]

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর সম্পাদন ব্যাপারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সাহায্য করিতেন।

উপরিউক্ত পত্রপত্রিকাগুলি হইতে 'সর্বশুভকরী' মাসিক পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহা প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। ইহা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কৌলীন্যব্যবস্থা, বিধবা বিবাহপ্রতিষেধ, অল্পবয়সে বিবাহ প্রভৃতি কতিপয় অতিবিষম অশেষ দোষাকর কুৎসিত নিয়মনিরাকরণের জন্য 'সর্বশুভকরী' নামে একটি সভা স্থাপিত হয় এবং তৎসমুদায়ের দোষ সবিস্তর প্রকটিত করিবার জন্য 'সর্বশুভকরী

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নূতন সংস্করণঃ কলিকাতা ১৯৪৮ঃ পৃ ১৪৮

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)ঃ নূতন সংস্করণঃ কলিকাতা ১৯৪৮ঃ পৃ ১৫০-১

পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে থাকে। মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সর্বশুভকরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের "বাল্যবিবাহের দোষ" এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় মদনমোহনের "স্ত্রীশিক্ষা" নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,

"ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্বশুভঙ্করী" নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।"[১]

এই যুগে যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ স্বধর্মাচাররক্ষায় একান্তভাবে যত্নবান হইয়াছিলেন তাহার নেতৃস্থানীয় ছিলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) ধর্মমতের দিক দিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি হিন্দু কলেজের একজন অধ্যক্ষ হন এবং আমৃত্যু এই পদে কার্য করেন। ডিরোজিওকে কলেজ হইতে অপসারণের প্রচেষ্টায় দেশীয় অধ্যক্ষদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রামকমল সেন।

ধর্মমতের দিক দিয়া অত্যন্ত গোঁড়া হইলেও শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে তিনি সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক চিকিৎসা বিদ্যার অবস্থা পর্যালোচনার জন্য যে কমিটি গঠন করেন রামকমল তাহার বিশিষ্ট সভ্য হন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীগুলি তুলিয়া দিয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রামকমল সেন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। তিনি একাদশী পালন ও প্রত্যহ পূজা করিতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও রামকমল অন্তর্জলীপ্রথাকে সর্বতোভাবে রদ করিতে চাহিয়াছিলেন। চড়কপূজার অর্থহীন বিভীষিকাময় পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগিত না। এ বিষয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

"The first person who condemned in Calcutta the

১। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত : কলিকাতা ১৯০৮ : পৃ ৩৩

practice of carrying the dying to the river was Ram Mohun Roy. The practice of plunging a dying person into water in the hope that the soul purified by the Ganga may ascend to heaven, was condemned by Ram Comul, who called it "Ghut Murder."[১]

রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেব সাহেবদের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের আচারব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই।

উভয়ের ধর্মমত সম্পর্কে প্যারীচাঁদ লিখিয়াছেন,

'Sir Raja Radhakant said to an American Missionary—"My religion is Sálokya, to be in the same place (world) with God; Sámipya, to be drawing ever nearer to God; Sájujya, to be joined in perfect communion with God; and Nirvána to be lost in God". Ram Comul must have thought and felt in the same way, and it is thus evident that the religion they professed was pure monotheism, although they countenanced idolatry to prevent the mass from taking to atheism.'[২]

ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু হইলেও ভবানীচরণ পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সপক্ষে ছিলেন। তবে ঐ শিক্ষাবিস্তারের সূত্রে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের তিনি একান্ত বিরোধী হন।

ভবানীচরণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবদ্বিজপূজনে এবং স্বধর্মযজনে তাঁহার অচলা মতি ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। ধর্মদ্বেষী দেবনিন্দুক নাস্তিকদের সহিত তিনি বাক্যালাপও করিতেন না। তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন।

১। Peary Chand Mittra: Life of Dewan Ram Comul Sen: Delhi 1928, page 57.

২। Ibid, page 59.

এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে স্বধর্ম ও স্বভাষানুরাগী করিতে ভবানীচরণের বিশেষ উদ্যোগ ছিল। তাঁহার 'নববাবুবিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়' ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'নববিবিবিলাস' ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'দূতীবিলাস' গ্রন্থ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত এক পত্রে তদানীন্তন সমাজে ভবানীচরণের ব্যঙ্গপুস্তকগুলির প্রভাবের উল্লেখ আছে।

রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচার রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াই রাধাকান্ত ক্ষান্ত হন নাই। যে সমস্ত হিন্দু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে রাধাকান্তের সভাপতিত্বে পতিতোদ্ধার সভার প্রথম অধিবেশন হয়। কিন্তু এই পতিতোদ্ধার প্রচেষ্টার বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুনের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই পতিতোদ্ধার আন্দোলন সম্পর্কে লেখেন, "One of the most important events that has occurred in India in the present Century."

রাধাকান্ত মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় মাদকসেবন নিবারণ সভা (Bengal Temperance Society) স্থাপিত হয়। রাধাকান্ত এই সভার প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হইয়া সভার সম্পাদককে এক পত্র লেখেন।

"Hailed with joy the inauguration of their Society, promised to take the deepest interest in its progress, and to give his cordial concurrence to all measures it may adopt for the eradication of the dreadful vice, and the reclaiming of those who have succumbed to its influence—Taken from Raja Radhacanta Deb's letter to the Secretary, Bengal Temperance Society."[১]

ধর্মবিষয়ে রাধাকান্তের সঙ্কীর্ণতা ছিল। তিনি রামমোহনের সতীদাহ-

---

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বিদ্যাসাগর তৃতীয় সংঃ এলাহাবাদ ১৯০৯ঃ পৃ ৩৩৬

নিবারণ আন্দোলন এবং বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে রাধাকান্ত চির-উদার ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদব্যাপারে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে তাঁহার 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থ প্রকাশে সহায়ক হন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় একই সময়ে রাধাকান্ত নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ রাধাকান্ত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে এক পত্রে লেখেন,

"......আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখবৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।"[১]

রাধাকান্ত রক্ষণশীল পরিবারের প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া দেশাচারের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রাচীনের সহিত নবীনের সংঘর্ষে প্রাচীনের পক্ষপাতী রাধাকান্ত নিজের পরাজয়ের মধ্য দিয়া ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংহত করিবার জন্য রাধাকান্তের মত প্রাচীনের স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে রাধাকান্ত সমসাময়িক অনেকের তুলনায় দেশের কল্যাণসাধনে অনেক বেশী তৎপর ছিলেন। শুধুমাত্র পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। রাধাকান্তের যে স্মৃতিসভা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন,

"To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century ; as unfair, indeed, as it would be to disparage the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this

১। যোগেশচন্দ্র বাগল : রাধাকান্ত দেব ৪র্থ সং : কলিকাতা ১৯৫১ : পৃ ৩০

respect can only be compared with his own contemporaries. Judged by a such a standard, the Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age".[১]

রাধাকান্তের ধর্মমতসম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

"In religion, the views of the Rajah Radhakant Deb may be best described by saying he was a consistent and orthodox Hindu. Like several other enlightened men of other enlightened times he clung to the creed in which he had been cradled. But it was a creed not calculated to make human nature richer and higher, but poorer and smaller than it was originally constituted. He did not outgrow the prejudices of the nursery".[২]

নিজের ধর্মমত সম্পর্কে অত্যন্ত গোঁড়া হইলেও রাধাকান্ত অপরের ধর্মমতের বিষয়ে সহনশীল ছিলেন না একথা ঠিক নহে। তবে হিন্দুর ধর্মের উপর অপর ধর্মের আক্রমণকে রোধ করিবার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সকল কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাধাকান্ত বৃন্দাবন গমন করেন এবং এইখানেই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল তাঁহার দেহান্ত ঘটে। বৃন্দাবন অবস্থানকালে তিনি পদাবলী গ্রন্থ দুইভাগে প্রকাশ করেন।

অপর ধর্মের প্রতি রাধাকান্তের মনোভাবের কথা তাঁহার জীবনীতে লেখা আছে

"Although he is a strict adherent of the esoteric doctrines of Hinduism, he is tolerant to the faith of others; he believes and has often declared it openly, that whatever may be the different outward forms of religion

১। A Brief Account of the Life and Character of Radhakant Deb: Calcutta 1880: page 54.

২। Kissory Chand Mittra: Radhakant Deb in The Calcutta Review No. XC: page 323.

amongst the different nations of the earth, they all worship in effect the one and the same God; that a sincere and strict observance of the doctrines of morality, combined with a firm belief in an All-wise, All-powerful and All-merciful Deity, cannot but lead to ultimate happiness".[১]

খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইংরেজী সভ্যতায় আক্রান্ত চিরকালের বাঙ্গালীত্বের রক্ষা-বুদ্ধির সুযোগ্য কবিওয়ালা ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)।

ঈশ্বর গুপ্ত মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে নানা মহৎ গুণের সমাবেশ থাকিলেও তাঁহার চরিত্রটি যে অকলঙ্ক ছিল তাহা নহে। তিনি মদ্যপান করিতেন। তাঁহার রচনার মধ্যেও এই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

"ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে,
দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে॥
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও।
ছুঁয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও॥"[২]

ইউরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার সংস্পর্শে এদেশের সমাজে নানা বাস্তবসমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী এই সকল সমস্যার দ্বারা বিপর্যস্ত হইতেছিল। ইয়ং বেঙ্গলের দল পাশ্চাত্যের মহিমাকীর্তন করিতেন এবং এদেশীয় সব কিছুকেই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এই চিত্তচাঞ্চল্যের সুযোগ লইয়া মিশনরীরা ছলে বলে কৌশলে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে তৎপর ছিলেন। সেই সঙ্গে সমাজে রক্ষণশীল দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়।

ডাঃ সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন,

"আসন্ন পরিবর্তনের আশঙ্কায় নূতনকে উপহাস ও পুরাতনকে ধরিয়া রাখিবার যে ব্যাকুলতা, তাহা ছিল সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের আগ্রহের বিরুদ্ধে সমাজ-সংরক্ষণের চেষ্টা। এই স্থিতিশীল মনোভাবই ছিল ঈশ্বর গুপ্তের তৎকালীন

১। A Rapid Sketch of the life of Raja Radhakanta Deva Bahadur with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning by the editors of the Raja's Sabdakalpadrum : Calcutta, 1859 : page 31.

২। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী : পৃ ৩২৩

রক্ষণশীল হিন্দু কি ভীতির চক্ষে দেখিতেন এই উল্লেখগুলিই তাহার প্রমাণ। 'নববর্ষ' কবিতায় দেখি,

"ধন্য রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল॥
... ...
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥"[১]

'বড়দিন' কবিতায় গুপ্ত-কবি লেখেন,

" "এ, বি" পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাদা-গাদা ডেস্কের উপরে॥"[২]

ইয়ং বেঙ্গলের অনাচারদর্শনে ঈশ্বর গুপ্ত আন্তরিক ভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ইউরোপীয়দের অনুকরণে তাঁহারা গোমাংস-সুরা প্রভৃতি পানাহার করিতেন, ইউরোপীয় বেশভূষা পরিতেন, এবং প্রচলিত রীতিনীতিকে উপহাস করিতেন। হিন্দুয়ানী এক সঙ্কটাবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিল।

"ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত॥
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে॥
বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব জশু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে॥"[৩]

ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করেন নাই। তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনেরও বিপক্ষে ছিলেন। এই আন্দোলনের স্রষ্টা বিদ্যাসাগরকে তিনি বহু স্থলেই খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। বিধবাবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য রাজপুরুষদের প্রতিও গুপ্তকবি ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁহার মতে

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী : পৃ ১১৪
২। ঐ : পৃ ১২৫
৩। ঐ : পৃ ১৩৬

প্রতিষ্ঠার কারণ। কিন্তু প্রাচীন আদর্শের শেষ কবি হইলেও, তিনি ছিলেন যুগসন্ধির কবি ; তাই তাঁহার মধ্যে নূতন আদর্শেরও কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়।"[১]

ডফ প্রমুখ মিশনরীদের কার্যকলাপকে ঈশ্বর গুপ্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

"বিদ্যাদান ছল করি মিশনরি ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥
শিশু সবে ত্রাণকর্তা জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পড়ে ডুব দেয় টবে॥"[২]

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্মানুরক্তি দেখিয়া ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন,

"যেখানেতে বালকের বিপরীত মতি।
সেখানেই মিশনরি বলবান অতি॥
... ...
তুমি ত সুবোধ চণ্ডী বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর মাল্‌সা ভোগ ফেলে?
হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে?
উদরে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে॥
... ...
পূর্ববৎ হিন্দু হও যিশুমত খণ্ডি।
হাড়ি ঝী চণ্ডীর আজ্ঞা ঘরে আয় চণ্ডী॥"[৩]

স্বধর্মে ফিরিয়া আসিবার এই আহ্বান সেই যুগে প্রতিটি রক্ষণশীল হিন্দুর আহ্বান।

গুপ্ত-কবি বহু কবিতায় ডফকে আক্রমণ করিয়াছেন। ডফের কার্যকলাপকে

১। ডাঃ সুশীলকুমার দে : দীনবন্ধু মিত্র : কলিকাতা ১৯৫১ : পৃ ১৬—৭
২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী : পৃ ১১৮
৩। ঐ : পৃ ১২০

অধিকাংশ হিন্দুর প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর প্রমুখ মুষ্টিমেয় লোকের কথা শুনিয়া সরকার বিধবাবিবাহ-আইন পাশ করাতে অধিকাংশ লোকের দাবী ও স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে।

'অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের "কুলতরী"
অকূলেতে কূল পেলে না।
কুলের তরী থাকলে কূলে,
কুলের ভাবনা আর থাকে না।
... ...
তখন কর্তারা কেউ শুনলেন না ত,
লক্ষ লক্ষ হিঁদুর মানা।
এরা বাঘেরে করিলেন শীকার,
কাঁধে করি ইঁদুর-ছানা॥
... ...
"কালবিল" কাল্‌বিল করেছেন,
হিঁদুর তাতে ঘোর যাতনা।
তুমি রাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে,
ছিঁড়ে ফেলো আইনখানা।'[১]

কিন্তু রাধাকান্ত দেবের মত ঈশ্বর গুপ্ত কৌলীন্যপ্রথার সমর্থন করেন নাই।

"কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥
... ...
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার॥"[২]

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী : পৃ ১৩৫
২। ঐ : পৃ ১২১

রামপ্রসাদ সেন ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা করিয়াছিলেন আর ঈশ্বর গুপ্ত করিয়াছিলেন পিতৃভাবে।

"তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥
পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥"[১]

ঈশ্বর গুপ্তের মতে ধর্ম ঈশ্বরভক্তিতে, পানাহারত্যাগে নহে। তাই তিনি সন্ন্যাসী, নিরামিষাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। তিনি হিন্দু ছিলেন। কোন উপধর্মকে তিনি হিন্দুধর্ম বলিতেন না। তিনি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের রক্ষক ও পূজক ছিলেন।

এক সময় ঈশ্বর গুপ্ত আদি-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যও ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। তিনি ব্রাহ্মদিগের সহিত একত্রে বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিতেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নাই।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) নানাভাবে এই যুগে হিন্দুধর্মসংরক্ষণে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভূদেবের পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এক জন অতিপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার মতে তন্ত্রই কলির বেদ এবং তন্ত্রে শক্তিসঞ্জীবনের উপায় আছে। "তর্কভূষণ মহাশয় নিজে শবসাধনাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। বিজয়াদশমীর দিন কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কপালে একটি সিদ্ধির ফোঁটা লাগাইতেন মাত্র।"[২] পিতৃদেবের প্রভাব

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী : পৃ ১৩
২। সংক্ষিপ্ত ভূদেবজীবনী ১ম সং : কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত : চুঁচুড়া ১৯১১ : পৃ ৩

ভূদেবের জীবনের উপর গভীরভাবে পড়িয়াছিল। সনাতনধর্মের জীবন্ত প্রতিরূপ স্বরূপ পিতৃদেবের নিকট হইতে ভূদেব তাঁহার ধর্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সেই সময় ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে সংস্কৃতভাষায় অশ্রদ্ধা ও স্বধর্মে ভক্তিহীনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইংরেজী শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের প্রতি বিদ্রূপ করাকে সুশিক্ষার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নৈষ্ঠিক ও পণ্ডিত পিতার প্রভাবে স্বধর্ম ও স্বজাতির প্রতি ভূদেবের ভক্তি কোনদিন বিচলিত হয় নাই। এ বিষয়ে ভূদেবজীবনীতে আছে,

"তাঁহার পিতা তৎসন্নিধানে থাকিয়া সনাতন ধর্মের গূঢ় তাৎপর্য সকলের সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে ইংরেজী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশসকল অপেক্ষাও উচ্চতর ভাব সকল সংস্কৃতশাস্ত্র রত্নাকর হইতে বাহির করিয়া দেখাইতেন তাহাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব তাঁহার স্বধর্মবিশ্বাসকে এবং জাতীয় মর্যাদার বোধকে কখনই অধিকক্ষণের জন্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।"[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত সভাসমিতিতে তর্কভূষণ মহাশয় যাতায়াত করিতেন। সার্ এডওয়ার্ড রায়েন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে তর্কভূষণ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু সভ্যেরা তাঁহাকে দেশাচার এবং দেশধর্মের বিরুদ্ধে মতবাদ লিখিতে বলায় তিনি কর্মে ইস্তফা দেন।

হিন্দু কলেজে ধর্মহীন শিক্ষার ফলে ভূদেবের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় মিশনরীদের খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের প্রবল চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ খ্রীষ্টধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য রচিত পুস্তকাদি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। ভূদেববাবুরও বিশ্বাস একবার বিচলিত হইয়াছিল। চণ্ডীচরণ সিংহ নামে যে ছাত্র ভূদেবের সহিত খ্রীষ্টানী পুস্তকসকল পাঠ করিতেন তিনি পরে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন। ইংরেজী শিক্ষার প্রথমাবস্থায় উলাষ্টন সাহেব এবং মিশনরী বিবি উইলসনের সহিত ভূদেবের সংস্রব হয়। তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে ভূদেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই মিশনরীদের প্রভাব তিনি এড়াইতে পারিলেন না। মিশনরীদের প্রভাবে ভূদেব পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী হইলেন। যেদিন

১। সংক্ষিপ্ত ভূদেবজীবনী : পৃ ১০-১

তাঁহার মধ্যে এই অবিশ্বাস জন্মিল সেই দিন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি অন্যান্য দিবসের ন্যায় নিত্যকার্য ঠাকুরের আরতি করিলেন না।

তর্কভূষণ ভূদেবের আচরণের এই কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতে বলিলেন। পথে পিতাপুত্রে কথাবার্তা হইত। পিতার ধর্মালোচনার প্রভাবে ভূদেবের মন হইতে খ্রীষ্টানী বিষ নামিয়া গেল। ভূদেব এই সময় ডেভিড হিউম রচিত প্রবন্ধমালা, টম পেন, গিবন প্রভৃতির পুস্তক পাঠ করেন। এই সকল পুস্তক অধ্যয়ন তাঁহাকে খ্রীষ্টানী প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। তর্কভূষণ শেষে ভূদেবকে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিতেই সকল মোহান্ধকার কাটিয়া গেল এবং ভূদেব হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি খ্রীষ্টান মিশনরীগণ কর্তৃক হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ভূদেবের বিবাহের পর তর্কভূষণ মাতার দ্বারাই পুত্র এবং পুত্রবধূকে মন্ত্রদান করাইয়াছিলেন। তন্ত্রবিদ্যার অনেক গূঢ়ার্থ তিনি ভূদেবকে বলিয়া দিয়াছিলেন। ভূদেবের তান্ত্রিক নাম আনন্দনাথ। "সন্ধ্যা-বন্দনার এবং তন্ত্রোক্ত পূজাদির অর্থগ্রহ হইয়া এবং ভক্তিভাবে পুরশ্চরণ করিয়া ভূদেববাবুর মনে যে ভাব দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর সর্বত্র এবং নিজের আচার-প্রণালীর সকল বিষয়েই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ক্রমশঃ প্রকৃত হিন্দুয়ানীর কোমলতা, দৃঢ়তা এবং উদারতায় সম্পূর্ণভাবে পরিষিক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।"[১]

ভূদেব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান হইলেও কি মুসলমান, কি ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত অপর জাতীয় কাহারও প্রতি কখনো তাঁহার কোনরূপ বিরাগ ছিল না। তর্কভূষণেরও উদার হৃদয়ে পরধর্মবিদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না। পুত্রের মুসলমান ছাত্রেরা বাড়ীতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে সযত্নে বসাইতে ও জল খাওয়াইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। ভূদেববাবু মুসলমানদের প্রতি বরাবর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,

"আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন।

১। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব চরিত ১ম ভাগ : কলিকাতা ১৯১৭ : পৃ ১০৮

তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম "উও ইয়ে হায়" আমার বোধ হইল যেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোন প্রাচীনঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

......মুসলমানদিগের ভারত রাজ্যশাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব প্রদেশ সাধারণ-প্রায় হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। হর্ম্যশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহাঋণগ্রস্ত।"[১]

ভূদেবের মধ্যে পাশ্চাত্য স্বদেশভক্তির ও উদ্যমের এবং প্রাচ্য ধর্মপ্রবণতার এক শুভসম্মিলন দৃষ্ট হয়। ভারতধর্মমহামণ্ডলের প্রথম স্থাপনাকালে তিনি ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্মসম্বন্ধে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ঐ সময়ে তিনি মহাত্মা বলরাম স্বামীর নাম উল্লেখও করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ফণ্ডও সেই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত। ধর্মোন্নতি ভিন্ন ভারতের কোন প্রকার প্রকৃত উন্নতি ঘটিতে পারে না।

সার্ আলফ্রেড ক্রফ্‌ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্‌সেলার স্বরূপে কনভোকেশন বক্তৃতাস্থলে ভূদেববাবু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"A man of wide culture, familiar with all the main developments of European thought and holding liberal views on many social subjects, he was a Hindu of Hindus in all that concerned the regulation of his own life and the doctrines of his religion. In the efficacy of the doctrines of the Vedantic Philosophy he had a profound belief both as a system of philosophy and as a rule of faith. In it he claimed to find full satisfaction for all his spiritual needs."[২]

ইংরেজ জাতির প্রতি ভূদেব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাহাদের কাছে হিন্দুদের

১। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ সামাজিক প্রবন্ধ ৬ষ্ঠ সংঃ কলিকাতা ১৯৩৭ঃ পৃ ১৬
২। সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনীঃ পৃ ৫৬-৭

কি শিক্ষা করা প্রয়োজন তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তখনকার নব্যশিক্ষিতদের ন্যায় ইংরেজদের সব কিছু অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন,

"......ইংরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল হয়।"[১]

কিন্তু নব্যশিক্ষিত যুবকদের নিকট সর্ববিষয়েই ইংরেজ আদর্শ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

'কয়েকবর্ষ গত হইল ইংরাজীতে অতিব্যুৎপন্ন কোন বন্ধুবরের বিরচিত "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজকে আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এই মাত্র দেখাইয়াছেন, যে উহা ইংরাজদিগের ধর্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকারের মনের মানদণ্ড ইংরাজ।......ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে।'[২]

পিতার উপদেশে এবং জীবনবৃত্তান্তের প্রভাবে ভূদেবের হৃদয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি চিরকাল শ্রদ্ধা জাগরূক ছিল। অন্তর্বিচ্ছিন্ন সমাজ যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইতে পারে এই আশাও তিনি পোষণ করিতেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় ভাগের (চুঁচুড়া, ১৯০৫) তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃ ১৭৪-২০৫) ইহার আলোচনা আছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরের এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবুর লেখা কতকগুলি গান ও কবিতা বাহির হয়। 'কালীপূজা' শীর্ষক একটি কবিতায় ভূদেবের তান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

২৬।২।৮৩ তারিখের দৈনন্দিনলিপিতে ভূদেব লিখিয়াছিলেন,

"তন্ত্র পড়িলাম। এই শাস্ত্রে অত্যুচ্চ জিনিসের উপরে এত মন্দজিনিসের

১। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ সামাজিক প্রবন্ধঃ পৃ ৮৫

২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ সামাজিক প্রবন্ধঃ পৃ ৮৮-৯

আবরণ দেওয়া আছে যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগের দ্বারা তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া লইতে হয়, সদ্‌গুরু ব্যতীত তন্ত্রের প্রকৃতজ্ঞান একপ্রকার অসম্ভব।"[১]

ব্রাহ্মদিগের প্রতি ভূদেব প্রসন্ন ছিলেন না। ক্রফ্‌ট সাহেব ভূদেবকে লিখিয়াছিলেন যে, যুবকদের চরিত্রোন্নতিকল্পে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একটি করিয়া পাক্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। "এইরূপ সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বক্তৃতা সম্বন্ধে ভূদেব অন্যসময় বলিয়াছিলেন :—হিন্দু ভদ্রলোক-দিগের চরিত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে স্বসমাজ মধ্যে অতীব উচ্চ আদর্শে গঠিত হইত। ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রমত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আলিঙ্গন করিলেন ; দৃঢ় চরিত্রের মূল—সমাজশাসন, পিতৃশাসন, শাস্ত্রশাসন কর্তন করিলেন ; এক্ষণে পরানুকরণের পথে সাপ্তাহিক সার্মণ বা ধর্মবক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকল দোষ কাটাইবেন ! !"[২]

বিদ্যাসাগরের প্রতি ভূদেব যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হইলেও তাঁহার বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় আন্দোলনে সমাজে ক্ষতির আশঙ্কা করিতেন। তিনি মনে করিতেন, বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন, ইহা তাহার বিপরীত ব্যবস্থা। ভূদেব মনু পরিত্যাগ করিয়া পরাশরকে ধরা সংস্কার বলিয়া মনে করেন নাই। নিবৃত্তিমার্গ ও সংযমের পথই যে শ্রেষ্ঠ পথ—এই কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। বৈধব্য পালন করিলে সংসার পবিত্র হয় এই তাঁহার মত ছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের চেষ্টাকে তিনি বিদ্যাসাগরের পক্ষে 'চাঁদে কলঙ্ক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

বাল্যবিবাহকে সমর্থন করিয়া ভূদেব লিখিয়াছেন, "যে দেশে বয়োধিক হইলে বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহবন্ধন শিথিল এবং দম্পতীপ্রণয় অন্ধ-অনুরাগমূলক বলিয়া অচিরস্থায়ী।"[৪]

কিন্তু ভূদেব বহুবিবাহের সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিজে পত্নীর মৃত্যুর পর পুনর্বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার মতে '...দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহে

১। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব চরিত ২য় ভাগ : কলিকাতা ১৯২৩ : পৃ ৩২৮
২। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব চরিত তৃতীয় ভাগ : কলিকাতা ১৯২৭ : পৃ ৩০৬-৭
৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ : চুঁচুড়া ১৯০৫ : পৃ ১২৭
৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : পারিবারিক প্রবন্ধ : হুগলী ১৮৮২ : পৃ ৫

অসুখ এবং অপবিত্রতা ;—অপরিগ্রহে অসুখ মাত্র ; সুখ কোন পক্ষেই নাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির।"[১]

ভূদেব স্বধর্মপালন, স্বদেশপ্রীতি, সদাচার এবং সাত্ত্বিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রচারক ছিলেন। তাঁহার মতে সনাতনধর্মের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

ধর্মান্দোলনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সর্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর দেড়শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন হয়। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পাইত। বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথমে কায়স্থ এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ দিলেন।

সংস্কৃতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হইলেও বিদ্যাসাগর পণ্ডিতদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের দাস ছিলেন না। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ ভক্তি যে পাশ্চাত্য জ্ঞানার্জনের অন্তরায়—এই কথা তিনি মনে করিতেন। সুবিধার জন্য নিজের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেও শাস্ত্র যে সর্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়াছে একথা একেবারেই মনে করিতেন না। এই দিক দিয়া ইয়ং বেঙ্গলের সংস্কারপ্রয়াসী দলের সহিত বিদ্যাসাগরের নিকট সাদৃশ্য আছে। রামমোহনের সহিত আবার এদিক দিয়া বৈসাদৃশ্যও রহিয়াছে। রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনই সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন ; বরং প্রাচ্য দর্শনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান ছিল। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই উদার দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। শুধু ব্যবহারিক মূল্যের মাপকাঠিতে প্রাচ্য দর্শনকে মাপিয়া বিদ্যাসাগর প্রাচ্যদর্শনের মূল্য নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতের বেশভূষার অন্তরালে বিদ্যাসাগরের নব্য ইউরোপীয় মনোভাব বিস্ময়জনক।

১। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : পারিবারিক প্রবন্ধ : পৃ ১০২

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনের সহিত বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হইতে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের পর হইতে এই বিদ্যালয় সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সিসিল বীডন এই কমিটির সভাপতি এবং বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদক হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত ডেস্‌প্যাচে বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ছোটলাট ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা কামনা করিলে বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে সচেতন করিবার জন্য বিদ্যাসাগর বেথুন বিদ্যালয়ের গাড়ীর দুই পার্শ্বে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'—মহানির্বাণতন্ত্রের এই শ্লোকাংশ ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা দেশের সমাজসংস্কারে অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরই প্রধান। রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনের অনুরূপ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। এই দুই আন্দোলনই দেশ-বিস্তৃত চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। এই দুই আন্দোলনের যাঁহারা প্রবল বিরোধিতা করেন তাঁহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবই প্রধান। এই দিক দিয়া ইতিহাসে রাধাকান্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পূর্বে বঙ্গদেশ ও তাহার বাহিরে দুই একস্থানে বিধবাবিবাহ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিদ্যাসাগরই প্রথম এই প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করেন। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

"ভারতের সুপবিত্র ক্ষেত্রে অনেক মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, ঋষিরা কত শতবার বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভারতীয় সম্রাটগণ বহুবার রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের এই মৃতপ্রায় অধ্যাপক

মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অভ্যুদিত হইয়া সমগ্র ভারতব্যাপী যে মহা-আন্দোলনপূর্ণ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা মিলে না।"[১]

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণসংগ্রহ-প্রচেষ্টার পশ্চাতে কারুণ্য-প্রাবল্যই কাজ করিয়াছে। তাঁহার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে শাস্ত্রানুরাগ নাই। শাস্ত্র-শাসিত জনচিত্তকে নিজের মতানুবর্তী করিবার জন্যই নিজের মতানুযায়ী শাস্ত্রীয় প্রমাণসংগ্রহে তিনি উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্য সহচরীর বৈধব্যের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াই বিদ্যাসাগর শাস্ত্রপ্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। কেননা শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অন্ধমোহ ছিল না। বস্তুতঃ তাঁহার দয়াপ্রবৃত্তির স্রোতে তাঁহার পৈতৃক ধর্ম, তাঁহার শাস্ত্র-শ্রদ্ধা সবই ভাসিয়া গিয়াছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণজীবনের সর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।[২]

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না' নামক ২২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এই পত্রিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা প্রচারের পর চারিদিকের পণ্ডিতসমাজ ইহার প্রতিবাদে বহু প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশ করিলে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। মুর্শিদাবাদের বৈদ্যপ্রধান গঙ্গাধর কবিরাজ তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হন।

বিদ্যাসাগর স্বয়ং আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ইংরেজীনবীশ বন্ধুদের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া 'Marriage of Hindu Widows' নামে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

ইংরেজীশিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হিন্দুসন্তানেরাই বিদ্যাসাগরকে বিশেষভাবে সমর্থন করে। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ পুস্তিকার প্রতিবাদ-সমূহ প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না' নামক দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের প্রতিবাদে যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ি মহাশয়ের পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য।

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বিদ্যাসাগর তৃতীয় সংঃ এলাহাবাদ ১৯০৯ঃ পৃ ২২০-১
২। বিহারীলাল সরকারঃ বিদ্যাসাগরঃ কলিকাতা ১৮৯৫ঃ পৃ ৬৫৯

বিধবা-বিবাহ পুস্তকের প্রথম প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম। তাঁহার উদ্ধৃতি অনুসারে পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম। পরাশর কলিযুগের বিধবাদের পক্ষে তিনটি বিধি দিয়াছেন—বিবাহ, ব্রহ্মচর্য ও সহগমন। রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমন পূর্বেই রহিত হইয়াছে। কলিযুগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম হইয়া পড়িয়াছে। অতএব বিধবার পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্ম। বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন,

"যখন পরাশরসংহিতাতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলা কোনক্রমেই শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচার-সিদ্ধ হইতেছে না।……বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে।"[১]

বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন যে বিধবাবিবাহের প্রধান প্রতিকূলতা করিতেছে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের দেশাচার।

"আমি আশা করিয়াছিলাম, কোন সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই এ দেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এ দেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার এক পথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে।"[২]

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশ করিবার পর বিদ্যাসাগর নিজের ও অপরাপর এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর দিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট এই বিষয়ে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদনপত্রের সহিত বিধবাবিবাহ আইনের এক খসড়াও পাঠান হইয়াছিল।

এ দিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ছত্রিশ হাজার সাত শত তেষট্টি জনের স্বাক্ষর যুক্ত একটি বিরুদ্ধ আবেদনপত্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ

১। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, সমাজ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : কলিকাতা ১৯৩৮ : পৃ ৩৬

২। ঐ : পৃ ১৮৫

তারিখে গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করেন। ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও এইরূপ পাল্টা আবেদনপত্র আসে। সর্বসমেত প্রায় চল্লিশটি দরখাস্তে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার ব্যক্তি খসড়ার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পঁচিশটি আবেদনপত্রে পাঁচ হাজার লোক বিলটির সমর্থন করিয়াছিলেন।

এই স্থানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, বিধবাবিবাহের সমর্থকদের সংখ্যা কম হইলেও গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকের সংখ্যা উহাদের মধ্যে বেশী ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রেরিত আবেদনপত্রে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে ছিল। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।[১] অন্যান্য আবেদনপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, বর্ধমানাধিপতি মহাতাপচাঁদ ও নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইয়ং বেঙ্গলের দল, তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতসমাজের অধিকাংশ এবং জমিদারশ্রেণীর অনেকেই বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তালিকার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম বিস্ময়কর। বোধহয় প্রথমে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও বিধবাবিবাহের সমর্থন করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ভারত গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। আইনটি Act XV of 1856, being an Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই স্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, রাধাকান্ত দেবের পূজনীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বিদ্যাসাগরকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা মানিয়া লইয়াছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রদ্বয় বিধবাবিবাহের বিপক্ষে থাকিলেও 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্র ইহাকে সমর্থন করিয়াছিল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে শ্রীরাজকৃষ্ণ

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর : পৃ ২৫৪-৫

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটস্থ ভবনে প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ করেন।

সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা-কন্যা ভবসুন্দরীর সহিত একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ দিয়া তাঁহার চক্ষে বিধবাবিবাহের বৈধতা, শাস্ত্রীয়তা এবং সে কার্যে তাঁহার অনুরাগের চরম প্রমাণ দিয়াছেন।

যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধর্মসভা বিদ্যাসাগরের মতকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাংবৎরিক অধিবেশনে নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় ও অকর্তব্য বলিয়া বক্তৃতা করেন। এদিকে বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করিয়া বেনামীতে কতকগুলি পুস্তক প্রচারিত হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত 'ব্রজবিলাস' প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপের স্মার্ত ব্রজনাথ বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার ৪র্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করেন ইহা তাহার প্রত্যুত্তর। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অগস্ট কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধবাদী ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এই তিন পণ্ডিতের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ প্রণীত 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার নামকরণ হয় 'বিনয়-পত্রিকা'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'ব্রজবিলাস' ও 'রত্নপরীক্ষা' বিদ্যাসাগরের রচনা।

"তখন কলিকাতার লোক এই বই দুখানি পড়িয়া হাসিয়া অস্থির হইত। খুড়োও ছাড়েন নাই, তিনিও জবাব দিতেন, একটা জবাবের নাম—'লাঠি থাকিলে পড়ে না'। কিন্তু হার খুড়োরই হইল; খুড়ো লিখিতেন সংস্কৃতে; বিদ্যাসাগর লিখিতেন বাংলায়; খুড়োর বই কেউ বুঝিতে পারিত না, বিদ্যাসাগরের বই সবাই পড়িত।"[১]

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গের ভূমিকা: কলিকাতা ১৯৩১: পৃ ৬

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সময় যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয় তাহাতে প্রায় ২৫,০০০ লোক স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় আবেদনপত্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর সিসিল বীডনকে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বঙ্গেশ্বর প্রথম উৎসাহ দেখাইলেও পরে কোন উদ্যোগ দেখান নাই।

রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ সমর্থন করিলেও কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহনিবারণ-বিষয়ে উদ্যোগী হয়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রথমে বহুবিবাহ-নিবারণের সপক্ষে থাকিলেও পরে বিপক্ষে মত দেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বলেন যে, বহুবিবাহব্যাপার শাস্ত্রানুমোদিত কার্য। এই বিষয় লইয়া মতানৈক্যের ফলে তারানাথ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন।

ব্রাহ্ম-সমাজসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাব কিরূপ ছিল এ সম্বন্ধে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

'ব্রাহ্ম-সমাজে জাতীয়ভাব সুরক্ষিত হয় নাই বলিয়া তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন।······তিনি ব্রাহ্মসমাজেই জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের আশা ভরসা করিতেন। তাই ইহাকে বিপথে যাইতে দেখিয়া প্রাণে গভীর ক্লেশ পাইতেন। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসুর সহিত কথোপকথনের সময় একবার বলিয়াছিলেন, "আপনারা (আদি ব্রাহ্মসমাজ) একটা গলির মধ্যে পড়িয়াছেন, আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা অন্যদিকে অত্যগ্রগামী ব্রাহ্মেরা চাপিয়া ধরিয়াছে।"'[১]

প্রয়োজন হইলে বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম-সমাজের সপক্ষতা করিয়াছেন। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' পেপার কমিটিতে ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইবার সপক্ষে তিনি মত দিয়াছিলেন।

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর : পৃ ৫৩০

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি ছিল ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। চণ্ডীচরণ লিখিয়াছেন,

"......তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোন এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সূক্ষ্মতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্যজীবনের আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখন পাওয়া যায় নাই।"[১]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন এবং রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের দৌহিত্র ললিত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেন।[২]

প্রকৃত কথা হইতেছে যে, বিদ্যাসাগর ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক ছিলেন সন্দেহ নাই ; তবে তিনি সমাজের কল্যাণের অপেক্ষা কোন ধর্মবিশ্বাসকে বড় করিয়া দেখেন নাই। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন কিনা এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,

"ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী ; এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন ? অচিন্তনীয় বলিতে পার ; কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন ?"[৩]

কোন ধর্মমত, শাস্ত্র-শাসন বা দেশাচার তাঁহার কার্যাবলীকে পরিচালিত করে নাই। বাঙ্গালীর মাতৃসুলভ কারুণ্য দয়া তাঁহার সমস্ত কার্যের মূলে রহিয়াছে। সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে এক পত্রে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন,

"আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"[৪]

১। চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় ঃ বিদ্যাসাগর ঃ পৃ ৫৩৯

২। বিপিনবিহারী গুপ্ত ঃ পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়) ঃ কলিকাতা ১৯১৩ ঃ পৃ ২২৮-৯

৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত ঃ পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়) ঃ কলিকাতা ১৯২৩ ঃ পৃ ১৯৯

৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঃ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ঃ কলিকাতা ১৮৯১ ঃ পৃ ২১০

ইহাই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মূল কথা।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের আন্দোলন খুব ব্যাপক হইয়াছিল। কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলরমণীদের দুর্দশা প্রকট করিবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' (১৮৫৪) প্রণীত হয়। শ্যামাচরণ শ্রীমানী বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করিয়া 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' (১৮৬০) রচনা করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশিমূএল পীর বক্সএর 'বিধবাবিরহ নাটক' (১৮৫৯), রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা-মনোরঞ্জন' (১৮৫৬), বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা-পরিণয়োৎসব' (১৮৫৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই যুগে শাক্তবৈষ্ণব-দ্বন্দ্বের প্রায় অবসান হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে সংহতি আসিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধস্রোত রোধ করিবার জন্য এই সংহতি ক্রমেই দৃঢ় হইতেছিল।

এই যুগে বৈষ্ণব-পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্যকাহিনীও রচিত হইতেছিল। রঘুনন্দন গোস্বামী 'রামরসায়নে' (১৮৩১ ?), 'রামায়ণ কাহিনী' ও 'রাধা-মাধবোদয়ে' (১৮৫৯) রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) কর্তৃক বৈষ্ণব ভাবধারা পুনরুজ্জীবিত হয়। বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে কৃষ্ণযাত্রার যে একটি লুপ্তপ্রায় ক্ষীণধারা ছিল এবং গোপাল উড়ে প্রভৃতির দ্বারা যাহা আদিরসের প্রাচুর্যে কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল কৃষ্ণকমল তাহাতে নবপ্রাণ সঞ্চার করেন। তাঁহার 'স্বপ্নবিলাস' (১৮৬০) প্রভৃতি পালাগুলি বহুদিন ধরিয়া পূর্ববঙ্গে ভক্তির স্রোত বহাইয়াছিল। তাঁহার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় গ্রন্থ 'দিব্যোন্মাদ' বা 'রাইউন্মাদিনী' (১৮৬১)। সমগ্রভাবে তাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি বৈষ্ণব ভাবধারার অনুসরণে নির্মল ভক্তিরসের প্রসাদ। কৃষ্ণকমলের বৈষ্ণবতা সঙ্কীর্ণতামুক্ত ছিল। তাঁহার নিকটে শঙ্করীই কৃষ্ণশোকে বৃন্দাবনে কাত্যায়নী হইয়াছেন। 'স্বপ্নবিলাস' ও 'রাইউন্মাদিনী' ব্যতীত কৃষ্ণকমল 'বিচিত্রবিলাস', 'ভারতমিলন', 'নন্দহরণ', 'সুবলসংবাদ', 'নিমাইসন্ন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণকমলের জীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ববঙ্গেই কাটিয়াছে। তাঁহার ব্রজলীলাত্মক সঙ্গীতবহুল কাব্যগুলি বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের প্রধান কর্মক্ষেত্র ঢাকা। অনেকগুলি অভিনয়োপজীবী

সম্প্রদায় গঠিত হইয়া সমগ্র পূর্ববঙ্গে কৃষ্ণকমলের পদাবলী গাহিয়া বেড়াইত। পূর্বাঞ্চলে 'বড় গোঁসাই' বলিতে কৃষ্ণকমলকে বুঝাইত।

কৃষ্ণকমল মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত 'জনৈক তীর্থগন্তুকাম ব্রহ্মচারীর নিকট গোস্বামী মহাশয় "গিরিধারী" নামে একটি বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন ; "গিরিধারী"র শ্রীচরণে তিনি আত্মবিক্রীত ছিলেন এবং বিগ্রহ সেবায় পরমানন্দ লাভ করিতেন। "গিরিধারী"র দোহাই ভিন্ন কোন কথাই কহিতেন না। "গিরিধারীই" তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও সর্বস্ব।'[১]

কৃষ্ণকমলের রচনায় তাঁহার এই ধর্মমানসের উজ্জ্বল পরিচয় সুস্পষ্ট। দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭) মধ্যেও শাক্তশৈব ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব একেবারেই ছিল না। দাশরথির কৃষ্ণ কখনও রামরূপ ধারণ করিয়াছেন—

"সিংহাসনে রামরূপ, হয়ে বসিলেন বিশ্বরূপ,
রুক্মিণী বামেতে হন সীতে।
হনূমান ত্বরান্বিত, দ্বারকায় উপনীত,
দ্বন্দ্ব ঘটে পুরে প্রবেশিতে ॥"[২]

দাশরথি তাঁহার পাঁচালীতে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব অংশে উভয়ের বিরোধের অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। শাক্ত কালীঘাটে আসিয়া দেখিতেছেন তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামা মা বৃন্দাবনবিহারী শ্যামরূপে বিরাজিত। আবার বৈরাগী বিষ্ণুমন্দিরে আসিয়া দেখিতেছেন তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীহরি শ্যামারূপে বিরাজিতা। তাঁহার মতে কালী কৃষ্ণ অভেদ। ভেদাভেদজ্ঞান সাধনার অন্তরায়।

"উভয়ের মন ! তোরে মন্ত্রণা আমি বলি।
অভেদ শিব রামায়, যা রাধা সা কালী ॥১৪
শুনি বাক্য গুরু-বাক্য করয়ে প্রামাণ্য।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, না ভাবিও ভিন্ন ॥১৫"[৩]

১। কৃষ্ণকমল-গ্রন্থাবলীতে কৃষ্ণকমলের সংক্ষিপ্ত জীবনী : শ্রীকামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত ২য় সং পরিবর্ধিত : কলিকাতা ১৯০৪ : পৃ ১৯

২। দাশরথি রায়। পাঁচালী। প্রথম খণ্ড। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : কলিকাতা ১৯০১ : পৃ ৮১৯

৩। দাশরথি রায়। পাঁচালী। দ্বিতীয় খণ্ড। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : কলিকাতা ১৯০১ : পৃ ১৯৩৫

এই সময় বৈষ্ণবধর্মের স্রোত পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। 'হুতোমপ্যাচার নক্সা' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সিংহ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

"হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাই নি!......গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পূতনাবধ গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন!......এ সওয়ায় গোঁসাইরা অগুর টেকরের (মুদ্দফরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচসিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এঁরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন।"[১]

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ: হুতোমপ্যাঁচার নক্সা (দুই খণ্ড), কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯: পৃ ৫৯-৬০

সাহিত্য

(১৮০১—১৮৬০)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সম্ভাবনা ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে গদ্যসাহিত্যের বিকাশ ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল এবং কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন জীবনবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সমাজসচেতনতা এই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। এই সচেতনতা শুধু পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন ও সংবাদপত্রপ্রকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না; ইহা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত নাটক প্রহসন ও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করিল। ব্যক্তিসচেতনতার প্রথম সুষ্ঠু প্রকাশ মধুসূদন দত্তর কাব্যে।

অনাধুনিক বা প্রাচীন ধারায় এই যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকাব্য ও ব্রতকথা, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণায়ন, বিবিধ পৌরাণিককাব্য, বৈষ্ণবনিবন্ধ ও পদাবলী, বিবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকাকাব্য, ঐতিহাসিক ও লৌকিক ছড়া প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া খেউড়, তরজা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়াকবি, কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা, বাউলগান প্রভৃতিরও সৃষ্টি চলিয়াছিল। এই অনাধুনিক ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যরচনার জের। নবযুগের কোন বিশেষ লক্ষণ ইহার মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আধুনিক ও অনাধুনিক ধারা পাশাপাশি চলিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে প্রথম ধারার প্রবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া প্রথম ধারার সহিত মিশিয়া গিয়া সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছিল। আমরা প্রথমে অনাধুনিক ধারাটির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরে আধুনিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা করিব। একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনাধুনিক ধারাটি প্রধানত পদ্য-বন্ধ এবং আধুনিক ধারাটি প্রধানত গদ্য-বন্ধ।

অনাধুনিক ধারা সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

আলোচনার অসম্পূর্ণতা পরিহার করিবার জন্য এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে। এই আলোচনার কিছু তথ্য উক্ত পুস্তকে নাই।

অনাধুনিক বা প্রাচীন ধারায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যকাব্যের মধ্যে পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' (১৮০৬-৭) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে নন্দকুমার কবিরত্নের 'কালীকৈবল্যদায়িনী' (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ), জগমোহন মিত্রের 'মনসামঙ্গল' (১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ), দ্বিজ কালীপ্রসন্নের 'মনসামঙ্গল' (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ), নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল' (১৮০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম স্মর্তব্য।

রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণায়ন রচনা এই যুগেও চলিয়াছিল। রামকমল দত্তের 'রামায়ণ' (১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ), রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ন' (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ ও পদাবলী এই যুগে রচিত হয়। কৃষ্ণদাসের বাঙ্গালা 'ভক্তমাল' (উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার' উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষের দিকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাতে প্রায় ২৭০০ পদ আছে। তন্মধ্যে প্রায় ৬৫০টি পদ 'পদকল্পতরু'তে পাওয়া যায় না। এই যুগে কমলাকান্ত দাস একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি নিজে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'পদরত্নাকরে'র সঙ্কলন করেন। ইহার ১৩৫৮টি পদের মধ্যে প্রায় কুড়িটি তাঁহার নিজের রচনা। তাঁহার কতকগুলি পদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কমলাকান্তের পদাবলী' নামে শ্রীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্র সঙ্কর্ষণ ভণিতায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেজয় মিত্র 'সঙ্গীতরসার্ণব' নামে স্বরচিত পদের যে সঙ্কলন করেন তাহাতে তাঁহার পিতামহ পীতাম্বর মিত্রের কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হয়। এই যুগে শাক্তপদাবলীসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কমলাকান্ত। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাকে কেন্দ্র করিয়া কমলাকান্তের ভক্তিসঙ্গীতের ধারা উৎসারিত হইতে থাকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি বর্ধমানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তেজশ্চন্দ্র এই তান্ত্রিক সাধককে মন্ত্রগুরুপদে বরণ করিয়া লন। বর্ধমান রাজসভায় এই সঙ্গীতধারা মহাতাব চাঁদ কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রক্ষিত হয়। মহাতাব চাঁদ শাক্ত পদাবলীর মধ্যে ভক্তহৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাতাব চাঁদ কমলাকান্তের যে দুইশতটি পদ মুদ্রিত করেন সেগুলি রামপ্রসাদের রচনার

পার্শ্বেই স্থান পাইবার যোগ্য। কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের অনেক পদ এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।

এই যুগে বহু উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা পদ্যবন্ধে রচিত হয়। অনূদিত গ্রন্থাদি যেমন গদ্যে তেমনি পদ্যেও রচিত হইত। অভয়াচরণ তর্কবাগীশের 'ভূপালকদম্ব', রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের 'Gay's Fable' গ্রন্থের অনুবাদ, নন্দকুমার রায়ের 'ব্যাকরণদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গদ্যপদ্যে রচিত কাব্যও এই সময়ে দেখা যায়। এইগুলি পদ্যকাহিনী এবং গদ্যউপন্যাসের মধ্যবর্তী অবস্থার রচনা। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেম নাটক' (সম্ভবত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ) গদ্যপদ্যে লেখা। আগাগোড়া পদ্যে রচিত রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১৮২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের উপাখ্যানকাব্য 'গোলেবকাঅলি ইতিহাস' (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ), নন্দকুমার কবিরত্নের 'শুকবিলাস' (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ), মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) বিশেষ স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্যবন্ধে রচিত 'দূতীবিলাস' (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'আশ্চর্য উপাখ্যান' (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং গদ্যেপদ্যে লিখিত 'পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা'র (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) নাম করা যাইতে পারে।

এই সময়ে অনেক পৌরাণিক ও লৌকিক ছড়া রচিত হইয়াছিল। দেবদেবীর মাহাত্ম্য ছাড়াও নানা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াও ছড়া জন্ম লাভ করে।

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অনুচরমণ্ডলীর মধ্যে যে কতিপয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কুলুইচন্দ্র সেন অন্যতম। প্রধানত তাঁহার চেষ্টাতেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খেউড়গান ওস্তাদিঢঙে মণ্ডিত ও মার্জিত হইয়া আখড়াই নামে পরিচিত হয়। কুলুইচন্দ্র সেনের আত্মীয় রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) (১৭৪১-১৮৩৯) আখড়াইগীতরচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ-আখড়াইপদ্ধতির সৃষ্টি করিলেন বাগবাজারনিবাসী মোহনচাঁদ বসু।

কবিগানের ধারার মধ্যে এই সময়ে নূতন উদ্দীপনা দৃষ্ট হয়। রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিগানরচয়িতা। তাঁহার বয়স যখন বার বৎসর তখন বিখ্যাত কবিওয়ালা ভবানী বেণে তাঁহার গানগুলি নিজের দলে গাওয়াইবার

জন্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে বাঁধনদারের কাজে লাগান। এই ভবানী বেণের দল হইতে ক্রমে তিনি নিধু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে যোগ দেন। পরে তিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। রাম বসুর উমামূলক সঙ্গীতগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিরহ এককালে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশকে মাতাইয়াছিল। অন্যান্য কবিওয়ালাদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ী বা হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮২৪), নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৩), নীলুঠাকুর (মৃত্যু ১৮২৫) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে কবির গান বাঁধিয়া দিতেন। দক্ষিণেশ্বরবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনেকগুলি কবিগান সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ' (১৮৯৪) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ পাঁচালীরচয়িতা দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭)। কৃষ্ণকমল গোস্বামীও (১৮১০-১৮৮৮) পাঁচালী ও কৃষ্ণযাত্রার পালা রচনা করিয়া ও কীর্তনের ঢঙে গাহিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

দাশরথি রায়ের লালিত্য, বাক্‌চাতুর্য, ছন্দবৈচিত্র্য, কৌতুকপ্রিয়তা প্রভৃতি বিশেষত্ব অনেক স্থলে ভারতচন্দ্রের রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যেহেতু সমসাময়িক কাল নূতন করিয়া হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানে সচেতন হইয়া উঠিতেছিল, সেইজন্য অন্যান্য কবিওয়ালাদের মত দাশরথি রায়কেও প্রধানত ধর্মমূলক আখ্যান উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তবে তাঁহার কাব্যে আদিরসও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। দাশরথি রায়ের পাঁচালী দুই খণ্ডে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০১)। দাশরথি রায়ের রচনার প্রধান গুণ সজীবতা ও সরসতা। লোকচরিত্রের বহু বিচিত্র বিশ্লেষণে দাশরথি রায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শিববিবাহপালায় নিমন্ত্রণ খাইবার পর বিশ্বনিন্দুকের বক্তব্য পরম উপভোগ্য। হরধনুভঙ্গ, দক্ষযজ্ঞ, অক্রূরসংবাদ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি পালায় দাশরথি রায় সমাজজীবনের কতকগুলি আশ্চর্য সত্যকে অপূর্ব নিপুণতার সহিত উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞপালায় শিব ও দক্ষর সম্পর্কনির্ধারণে দাশরথি যে উপমার মালা গাঁথিয়াছেন তাহা তাঁহার কবিত্ব শক্তির উজ্জ্বল পরিচয় দেয়। দাশরথি মূলত সভারঞ্জন কবি। সেই কারণে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল

বেশী। শব্দালঙ্কারের দিকে তাঁহার প্রবণতা সত্ত্বেও তাঁহার গানগুলি কবিত্বের মর্যাদা হারায় নাই।

কৃষ্ণকমলের স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে স্মরণীয়। বহুকাল ধরিয়া প্রবাহিত কৃষ্ণযাত্রার একটি লুপ্তপ্রায় ক্ষীণ ধারাতে কৃষ্ণকমল নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। বলিতে গেলে বৈষ্ণবসাহিত্যের সংস্কৃতনাটকগুলির পরেই কৃষ্ণকমলের দান। তাঁহার রচনা শুধু তত্ত্বমূলক নহে, তাহা কবিত্বেও উজ্জ্বল। সম্ভবত 'স্বপ্নবিলাস' (১৮৬০) তাঁহার প্রথম পালা। ইহাতে একদিকে জননী যশোদা, অন্যদিকে শ্রীরাধা—কৃষ্ণকমলের হাতে বাৎসল্য এবং মধুর রস উভয়ই সমভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যশোদাবিলাপ রামপ্রসাদের পদাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়। 'স্বপ্নবিলাসে'র পরে কৃষ্ণকমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'দিব্যোন্মাদ বা রাইউন্মাদিনী' (১৮৬১) রচিত হয়।

অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্ববিষয়ক গীতের ধারা এই যুগেও লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাউল, দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লেখা অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে।

এইবার আমরা আধুনিক ধারাটির সম্পর্কে আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি—এই আধুনিক ধারাটিই উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের সাহিত্য। গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি ও কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন জীবনবোধের বিকাশই নবযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রথমে গদ্যসাহিত্যের কথা ধরা যাক।

ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের প্রেরণা প্রথমে গদ্যের ব্যাপক ব্যবহারের মূলে কাজ করিয়াছে। সেইজন্য শতাব্দীর প্রথমে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল সেগুলির বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য ছিল না। ক্রমে ধর্মপুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নাটক, প্রহসন, উপন্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে গদ্যের বিকাশের ফলে ইহাতে সাহিত্যের নিবিড় স্পর্শ লাগিল। কতকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াও বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশ ও প্রচারের সহায়তা করিয়াছিল।

শ্রীরামপুরে স্থাপিত ব্যাপটিস্ট মিশন বাঙ্গালা দেশে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বাঙ্গালায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া এবং খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য ও নিবন্ধ লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিতেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্র হইতে

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং বাঙ্গালা গদ্যের পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে 'গসপেল অব সেণ্ট ম্যাথিউ' অংশ মূল গ্রীক হইতে অনূদিত হইয়া 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামে প্রকাশিত হয়। ইহাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা গদ্য-পুস্তক। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ হয়। পরে বাইবেল অনুবাদের অনেকগুলি সংস্করণ প্রচার লাভ করে। শুধু বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রী উইলিয়ম কেরী অন্য অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রামরাম বসুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রামরাম বসু প্রথমে পাদ্রী জন টমাসের বাঙ্গালা শিক্ষক ছিলেন। পরে শ্রীরামপুর মিশনের সহিত যুক্ত হন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি 'জ্ঞানোদয়' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী পাইয়া তিনি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'লিপিমালা' লেখেন। রামরাম বসুর গদ্যরচনায় সাহিত্যের স্পর্শ ছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মে লর্ড ওয়েলেসলির আগ্রহে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। উইলিয়ম কেরী বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা হন। কেরীর আগ্রহ ও উৎসাহে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম যুগে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), গোলক শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতাইতিহাস' (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫) ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থকৌমুদী' (১৮২১) বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের মূল্য বেশী ছিল বলিয়া স্বল্প মূল্যে বিবিধ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির সদস্য তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন 'নীতি কথা' সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন। পুস্তকটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অপর

গ্রন্থের মধ্যে তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯) ও রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' (১৮২০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত সংস্কৃত বিশ্বকোষ 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮২২-১৮৫২) একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটি আট খণ্ডে সম্পূর্ণ।

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা নানা বিষয়ে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগিতা করিয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনরীদের কোন কোন বই সোসাইটির অধীন বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তক হইয়াছিল। উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স কেরী 'বানিয়ান' রচিত 'Pilgrim's Progress' গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তাহার নাম দেন 'যাত্র্যগ্রসরণ'। গোল্ডস্মিথ রচিত 'An Abridgement of the History of England' অবলম্বনে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ব্রিটিশদেশীয় বিবরণ' রচনা করেন।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ইতিহাস ভূগোল জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক অনেক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও চলে।

রামমোহন রায়ের হাতে বাঙ্গালা গদ্যরীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। রামমোহনের প্রথম বাঙ্গালা রচনা 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রামমোহন সত্তরটি মৌলিক বা অনূদিত পুস্তকপুস্তিকা বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন। রামমোহনের গদ্যরচনার সম্মান কতখানি তাঁহার প্রাপ্য সে বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে। ডাঃ সুশীলকুমার দে রামমোহনের ও গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনার আশ্চর্য মিল দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, রামমোহনের নামে প্রচলিত ঐ সকল রচনা গৌরমোহনের লেখা।[১] রামমোহনের নামে প্রচলিত অন্যান্য রচনাও অপর কোন কোন ব্যক্তির রচনা হইতে পারে। সেকালের অর্থশালী ব্যক্তিরা লোক রাখিয়া রচনা লিখাইয়া লইতেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের না হইলেও এই সব রচনার বিষয়বস্তু যে তাঁহার নিজস্ব এ বিষয়ে সমর্থন করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কিশোরীচাঁদ মিত্রের মত প্রামাণিক লেখকের মতে ইংরেজী রচনায় রামমোহন ইংরেজ বন্ধুদের যথেষ্ট

১। শনিবারের চিঠিঃ মাঘ ১৩৪০ সাল (January-February 1934) : পৃ ৪২-৫৬

সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] রামমোহনের বন্ধু ও প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট রামমোহনের কয়েকটি রচনা নিজের বলিয়া দাবী করেন। এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হোরেস হেয়্যান উইলসন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর রামকমল সেনকে এক পত্র লেখেন।[২]

রামমোহনের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বেদান্তসার' ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামমোহনের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (জুন ১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (নবেম্বর ১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (নবেম্বর ১৮১৯), 'পথ্যপ্রদান' (ডিসেম্বর ১৮২৩) ও 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)।

রামমোহনের গদ্যে সংস্কৃতের পণ্ডিতীরীতি অনুসৃত হয় নাই। তাঁহার রচনা বেশ প্রাঞ্জল ছিল এবং তাহাতে ছেদচিহ্ন ও দূরান্বয়ের দোষ ছিল না। বাঙ্গালা গদ্যভাষার সাহায্যে তিনি বাঙ্গালা দেশে দার্শনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

অনেকের মতে রামমোহনই প্রথম বাঙ্গালা গদ্যকে সাহিত্যরূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ কথা ঠিক নহে। রামমোহনের পূর্বে রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যরচনার স্থানে স্থানে সাহিত্যের স্পর্শ আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য নহে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গদ্যরচনাকারদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রমথনাথ শর্মণ ছদ্মনামে ভবানীচরণ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি গদ্যেপদ্যে লিখিত। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ভবানীচরণ 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবত ইহা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে ভবানীচরণ 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) ও 'হিতোপদেশ' (১৮২৩) গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে সর্বত্র শ্লীলতা রক্ষা না হইলেও রসসৃষ্টির একটি স্বাধীন প্রয়াস ছিল। রামমোহনের রচনায় কোথাও কোথাও যে ব্যঙ্গকটাক্ষ দৃষ্ট হয়, ভবানীচরণের রচনায় সেই ব্যঙ্গ তীব্রতর কিন্তু অধিকতর সরসতার সহিত

১। Calcutta Review : Vol. IV No. VIII : page 362.

২। Peary Chand Mittra : Life of Dewan Ram Comul Sen : Delhi 1880 : pages 14-5.

পরিবেষিত হওয়াতে তাহা যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছে। পরবর্তীকালে কলিকাতার বাবুদের লইয়া যে ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা-ধারার সৃষ্টি হয় তাহার প্রথম প্রকাশ ভবানীচরণের রচনায়। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে " 'নববাবুবিলাস' প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবী করে।"[১]

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে মৌলিক পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশই দেশীবিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ বা সঙ্কলন। প্রধানত তুইটি প্রেরণা এই সময়ে সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কাজ করিয়াছে। একটি, বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার এবং দ্বিতীয়টি, পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার প্রসার। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। ইঁহাদের রচনায় ক্রমোন্নত গদ্যের রূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলিয়া এই গদ্যের মধ্যে সত্যকার সাহিত্যরূপ প্রকাশ পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরতিরিশে বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় যাঁহাদের প্রচেষ্টা স্মরণীয় তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠ্যপুস্তকই রচনা করিয়াছিলেন বেশী। অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩), 'চারু পাঠ' (প্রথম ভাগ ১৮৫৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৩) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারই প্রথম সার্থকভাবে বাঙ্গলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন। অক্ষয়কুমার রসস্রষ্টা সাহিত্যিক না হইলেও তাঁহার রচনা ছিল প্রকাশক্ষম, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'। ইহার প্রথম পাঁচ খণ্ড ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, ষষ্ঠ হইতে একাদশ খণ্ড ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং শেষ তুই খণ্ড ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের

১। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ: কলিকাতা ১৯৪৮: পৃ ১৭।

মধ্যে প্রকাশিত হয়। ছেদ-চিহ্নের অধিক ব্যবহার না থাকিলেও কৃষ্ণমোহনের রচনা জড়তাহীন, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্ম-ধর্ম' (১৮৫০), তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' (১৮৫৪) ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭-৫৮) উল্লেখনীয় গ্রন্থ। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫১) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিজ্ঞান ও ইতিহাসবিষয়ক অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) ও 'পুরাবৃত্ত' (১৮৫৮) এবং রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (প্রথম ভাগ ১৮৫৫) বাঙ্গালা গদ্য-নির্মাণের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের জন্মদাতা। বিদ্যাসাগরই প্রথমে বাঙ্গালা গদ্যের স্বাভাবিক তাল ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছেদ-চিহ্নের বাহুল্য। বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯), 'শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ বা বোধোদয়' (১৮৫১), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬) ও 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কথ্যভাষামূলক গদ্যরীতিকে আশ্রয় করিয়া প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করিলে বাঙ্গালা গদ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নূতন দিগন্ত দেখা গেল। সেই সঙ্গে মৌলিক কাহিনী রচনার প্রয়াসও অঙ্কুরিত হইল।

এই যুগে নাটক ও প্রহসন রচনার ব্যাপক প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। প্রথম মৌলিক নাটক 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে সংস্কৃত নাটকরচনাপদ্ধতি ও ইংরেজী নাটকরচনারীতির মিশ্রণ দেখা যায়। ইহার পর হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক' (১৮৫৩) ও 'কৌরব-বিয়োগ নাটক' (১৮৫৮), নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক' (১৮৫৫), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান নাটক' (১৮৫৮) ও 'মালতী-মাধব নাটক' (১৮৫৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের প্রধান নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁহার প্রথম নাটক 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) বাঙ্গালা নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে

ও কৌতুকরসের সঞ্চারে স্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার অপর উল্লেখযোগ্য নাটক 'রত্নাবলী' (১৮৫৮)। রামনারায়ণের পরেই উমেশচন্দ্র মিত্রের স্থান। তাঁহার 'বিধবাবিবাহ নাটক' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) ও 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা নাটকের ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইল। মধুসূদনের প্লটরচনার দক্ষতা, পরিচ্ছন্ন রচনাভঙ্গি ও বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সঞ্চার তাঁহার নাটকগুলিকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়াছে। 'পদ্মাবতী' একটি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ রোমান্টিক নাটক।

মধুসূদনের প্রহসন দুইটি—'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয়রহিত প্রহসন।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকরচনার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। এই নাটকটিতে নীলকরসাহেবদের অত্যাচারের বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বগতোক্তির বাহুল্য ও দীর্ঘ বক্তৃতাবলী, প্লটের কেন্দ্রগত ঐক্যহীনতা এবং সর্বোপরি মৃত্যুর ঘনঘটা নীলদর্পণের শিল্পগত সুষমা বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিলেও এই নাটকের প্রধান গুণ বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র-চিত্রণ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, কতকগুলি সাময়িক পত্রের প্রকাশ এই যুগে বাঙ্গালা গদ্যরীতির বিকাশে সাহায্য করিয়াছিল। কতকগুলি সংবাদপত্রের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রটির নাম ছিল 'দিগ্দর্শন' এবং শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ইহার প্রকাশক ছিলেন। ইহার সম্পাদনা করিতেন জেশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

'দিগ্দর্শন' প্রকাশের পর মাসখানেক যাইতে না যাইতেই ব্যাপটিস্ট মিশন 'সমাচার-দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার-দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন জে. সি. মার্শম্যান। মার্শম্যান নামে সম্পাদক হইলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনের ভার এদেশীয় পণ্ডিতদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও তারিণীচরণ মিত্র এই পত্র সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশের প্রায় সমকালে কলিকাতায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছেন যে, 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের পর এক পক্ষ কালের মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়।[১] এই পত্রটি এক বৎসর চলিয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় 'Brahmunical Magazine. The Missionary & the Brahmun No. 1 ব্রাহ্মণসেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ সং ১' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। এক বৎসরের মধ্যে ইহার অন্যূন আটশত গ্রাহক হইয়াছিল। ধর্মের আলোচনায় এই পত্রিকার কথা বলা হইয়াছে।

সংবাদপত্রের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরের' একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ধর্মের আলোচনায় এই পত্রিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রভাকর একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। সেকালের বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, অক্ষয়কুমার দত্ত, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি লেখকের প্রাথমিক রচনা 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরবর্তী যুগে অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হইয়াছেন।

এই যুগের আর একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ'। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, 'জ্ঞানান্বেষণ' ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র ছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। প্রথমে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্পাদকীয় কার্য সম্পন্ন করিতেন। দক্ষিণারঞ্জনের পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক পত্রিকাটির পরিচালনা করেন এবং পত্রিকাখানিকে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায়

১। The Friend of India : September 1820 : pages 134-35.

প্রকাশ করা হয়। রামগোপাল ঘোষ এই পত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রচার রহিত হয়।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'সম্বাদ ভাস্কর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই পত্রের পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্চায)। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর সম্পাদক হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী গৌরীশঙ্করের প্রচেষ্টায় 'সম্বাদ ভাস্কর' অর্ধসাপ্তাহিকে এবং পর বৎসর বারত্রয়িক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে থাকেন।

এই যুগের আর একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। ধর্মের আলোচনায় এই পত্রিকার বিষয় বলা হইয়াছে।

'সংবাদ প্রভাকরে'র পরেই এই যুগের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'। 'সংবাদ প্রভাকর'কে কেন্দ্র করিয়া যেমন একটি লেখকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও এক শক্তিশালী সাহিত্যিকমণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। এক সময় এই পত্রিকার সাতশত জন গ্রাহক ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন।

এই পত্রিকা সম্পর্কে মনিয়ের উইলিয়ম লিখিয়াছেন,

"It had its organ in a monthly periodical, called the Tattva-bodhinī patrika. This journal was started in August, 1843, and was well edited by Akhay Kumār Datta, an earnest member of the theistic party. Its first aim seems to have been the dissemination of Vedāntic doctrine, though

its editor had no belief in the infallibility of the Veda, and was himself in favour of the widest catholicity. He afterwards converted Debendra nāth to his own views".[১]

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাখানি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এবং মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র প্রথম সর্গ এই পত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কালী-প্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সম্পাদক হন। মাত্র আটটি সংখ্যা সম্পাদন করিবার পর পত্রিকাখানির অকালমৃত্যু ঘটে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদের বিখ্যাত উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' এই মাসিক পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সোমবার চাঁপাতলা হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। এই পত্রই প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকৃত আলোচনার সূত্রপাত করে। আধুনিক সাহিত্যের ধারায় আমরা কেবলমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য গদ্য পুস্তক ও পত্রিকাদির নাম করিয়াছি। এই পুস্তক ও পত্রিকাগুলি নবযুগের চিন্তা ও ভাবধারার বাহন ছিল। এই পুস্তক ও পত্রিকাদি সম্পর্কে অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাই এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না।

এই যুগে বাঙ্গালা কাব্যেও আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন আদর্শের শেষ কবি ও নূতন আদর্শের আদি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত যুগ-সন্ধির কবি। তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু সাধারণ বাঙ্গালী ও প্রাত্যহিক বাঙ্গালী জীবনের তুচ্ছ বস্তু বা ব্যাপার। দেশপ্রীতি তাঁহার কাব্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিল। তিনি কাব্যকে লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত-প্রবর্তিত আধুনিকতার বিকাশ ঘটে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

১। Monier Williams : Religious Thought and Life in India, Part I : Part II : London 1883 : page 492.

কাব্যে। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেম রঙ্গলালের কাব্যে তীব্রতর হইয়া উঠিল। তাঁহার কাব্যের মূলসুর দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের চিত্ত জয় করিয়াছিল। রঙ্গলাল গুপ্ত-কবির শিষ্য হইলেও গুরুর অপেক্ষা এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছিলেন। রঙ্গলালের ভাষা গুপ্ত-কবির ভাষার তুলনায় অধিকতর মার্জিত।

মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যকে নূতন রূপ দান করিলেন। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা কাব্যে নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিলেন। কাব্য পয়ারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়, কেননা ইহা নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল। এই যুগসন্ধিস্থলে ঈশ্বর গুপ্ত অস্তমিত এবং মধুসূদন নবোদিত। ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান ঘটিয়াছে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় হইতেই আধুনিক সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষা

(১৮০১—১৮৬০)

পাশ্চাত্য ধরণের স্কুলপ্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন ও প্রকাশ প্রভৃতির ভিতর দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হয়। এই শিক্ষার মধ্য দিয়াই জাতীয় জীবনে ইওরোপীয় প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সংস্কার করিবার প্রবল প্রেরণা দেখা দেয়। এই সময় চারি প্রকারের স্কুল ছিল,—১। হিন্দু প্রাথমিক স্কুল বা পাঠশালা, ২। হিন্দু বিদ্যার্জনের স্কুল বা টোল, ৩। মুসলমান প্রাথমিক স্কুল এবং ৪। মুসলমান বিদ্যাকেন্দ্র বা মক্তব। সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ অশিক্ষিত ছিল বলিলেও চলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারসম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সার্ চার্লস গ্রাণ্টের নেতৃত্বে বিলাতে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া এবং ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া এদেশের সর্বত্র শিক্ষার বহুল প্রচার করা। এই আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন উইল্‌বারফোর্স।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম পিটের উদ্যোগে ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট বা ভারত আইন জন্ম লাভ করে। ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে তুলিয়া লইয়া বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের উপর ন্যস্ত করা হয়। বাণিজ্যব্যাপারে কোম্পানী সম্পূর্ণ স্বাধীন রহিল, কিন্তু তাহাদের সমস্ত কাগজপত্র, ডেস্‌প্যাচ ও আদেশাবলী অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের নিকট প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইল। এই আইনের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বা পাদ্রীদের অবাধ গতিবিধির সম্বন্ধে কোন কথাই থাকিল না।

দেশীয় বিদ্যাচর্চার অবনতি রোধ এবং ইংরেজ ও দেশবাসীদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় এক আরবী শিক্ষার কলেজ বা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৮২

খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পূর্বে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা পরিচালনের কোন ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই।[১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অগস্টের মিনিটে (minute) মার্কুইস ওয়েলেসলী এই কলেজস্থাপনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস ৪ঠা মে হইতে ধরিবার কারণও ঐ মিনিটে উল্লিখিত ছিল।

"The Governor-General considered the college at Fort William to be the most becoming public monument, which the East India Company could raise to commemorate the conquest of Mysore, he has accordingly dated the law for the foundation of the college on the 4th of May, 1800, the first anniversary of the reduction of Seringapatam."[২]

সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষাদান করাই এই কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত এ দেশীয় সাহিত্য ও ভাষার জ্ঞান না থাকিলে রাজকার্য যথাযথ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নহে, ওয়েলেসলী একথা বিশ্বাস করিতেন। এক কথায় সরকারী কর্মচারীদিগের শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিবার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম হয়। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সৃষ্টি হঠাৎ কোন আবেগময় আদর্শ হইতে হয় নাই। এ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানের অভাবের জন্য প্রথমে ইংরেজ কর্মচারীদের খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত এবং তাহারা অধীনস্থ এ দেশীয় কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি (যাহা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণঃ কলিকাতা ১৯৪৯ঃ পৃ ৪১৯

২। Thomas Roebuck : The Annals of the College of Fort William, From the Period of its Foundation, by His Excellency the Most Noble Richard Marquis Wellesley, K.P. on the 4th May, 1800, to the Present Time : Calcutta 1819 : page xxiv (introduction).

প্রকাশিত হয়) অনুযায়ী স্থির হয় যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে কতকগুলি বিশেষ চাকরিতে নিযুক্ত হইতে গেলে একটি পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। পরীক্ষার বিষয়ে কতকগুলি কার্যের জন্য বাঙ্গালা, পার্সী ও হিন্দুস্থানী ভাষাশিক্ষা আবশ্যক বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।

কলেজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা বিভাগ খোলা হয় নাই। কোম্পানীর জুনিয়র সিভিলিয়ানদের জন গিলক্রাইস্টের (John Gilchrist) পার্সী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতাবলী শুনিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সিভিলিয়ানদের পরীক্ষাগ্রহণের পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই যে রিপোর্ট লেখা হয় তাহার একস্থলে গিলক্রাইস্টের যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য ছিল। জি. এইচ. বার্লো (G. H. Barlow), জে. এইচ. হ্যারিংটন (J. H. Harrington) প্রমুখ পাঁচজন এই রিপোর্ট লেখেন। গিলক্রাইস্ট সম্পর্কে তাঁহারা বলেন,

"We cannot conclude this report without expressing our sense of the merits of Mr. Gilchrist. That gentleman has been assiduously employed, for several years, in forming a Grammar and Dictionary of the Hindoostanee language, the universal colloquial language throughout India, and therefore of the most general utility".[১]

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর অধীনে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগ খোলা হয়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেরী কলেজের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতন পাইতে থাকেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ পান। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি এবং রামরাম বসু সহকারী পণ্ডিত হন। কেরীর উৎসাহে কলেজের পণ্ডিতগণ পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়নে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন। অনেক বাহিরের লোকও পুস্তক প্রকাশে কলেজ কর্তৃপক্ষের অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ গোলক শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা বিভাগে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত

১। Ibid : page 7.

হয়। এ বিষয়ে সাহিত্যের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল পুস্তকপ্রণয়নের ফলে বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশের পথ সুগম হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সিভিলিয়ানদের সর্বাঙ্গীণভাবে শিক্ষায় উপযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও বাঙ্গালা তথা এ দেশীয় সাহিত্যের অগ্রগতির বর্ণাঢ্য ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোবাক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"The advantages which have thus indisputably been afforded by the establishment of the College, and the efficacious aid which it has contributed to the administration of justice and government in British India, are of so great a magnitude, as to throw a shade over consequences of a less important, though in a literary and national point of view, no less honourable a character, resulting from the institution ; and the cultivation of Oriental Literature, and the exaltation of the British character among the nations of Europe, may fairly be ascribed to this source."[১]

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ কলেজটি উঠাইয়া দিবার নির্দেশ দেন। কিন্তু ওয়েলেসলীর শক্তিশালী হস্তক্ষেপের জন্য ইহা অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। অতঃপর ওয়েলেসলীর ভারত ত্যাগের পর কলেজটি আয়তনে প্রায় অর্ধেক হইয়া যায়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী এক ঘোষণায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

"We are rid of Fort William College. An order from the Government of Bengal, dated the 24th January, announces with peremptory conciseness, that the 'College

---

১। Ibid : page vii (preface).

is abolished' and India has one anomaly the less. Intended by Lord Wellesley to be the Oxford of the East, it was cut down by the Court of Directors, and has for years had an existence only in the Gazette."[১]

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়াতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। পরে চাকরিক্ষেত্রে মনোনয়নের পরিবর্তে সরাসরি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে এই কলেজের আবশ্যকতা শূন্যের কোঠায় গিয়া দাঁড়ায়।

জনসাধারণের মধ্যে ইওরোপীয় শিক্ষার প্রসার প্রধানত মিশনরীদের প্রচেষ্টাতে আরম্ভ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুরে মিশনের পত্তন ঘটে। ১১ই জানুয়ারী হইতে মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রীদের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল বাঙ্গালায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া ও খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এ বিষয়ে বলা হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীরামপুরে আসিয়া কেরী তাঁহার সহকর্মীদের সহায়তায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বালকদিগের জন্য প্রথম অবৈতনিক দৈনিক স্কুল এবং তাহাদের ধর্মশিক্ষার জন্য ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম সাণ্ডে স্কুল স্থাপন করেন।

ধর্মের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুরের ভ্রাতৃসঙ্ঘ একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা একটি কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প প্রচার করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। এই বিদ্যামন্দির এবং ইহার উপযোগী আসবাব প্রভৃতির জন্য প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা লাগে। এই টাকার মধ্যে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ২,২৫,০০০৲ টাকা দান করেন। কেরী এই কলেজের প্রিন্সিপাল হন। এই কলেজের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সনন্দ আইনে (Charter Act of 1813) ভারতবর্ষের কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের

১। Allen's Indian Mail for 1854 : p. 123. Priya Ranjan Sen-এর Western Influence in Bengali Literature, 2nd edition (Calcutta 1947) গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

উন্নতি সাধন ও ভারতীয় পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দানার্থ দশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও সুলভ বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্মপুস্তক রচনা ও ছাপান ইহার নিয়মের বহির্ভূত ছিল। ধর্মের আলোচনায় এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার কিছু পরেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সোসাইটি গঠনের উদ্দেশ্য—জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করিবার জন্য কলিকাতায় যে সব বিদ্যালয় আছে তাহাদের সাহায্য দান ও উন্নতি বিধান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালনার ভার ছিল সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ বি. বেলী, উইলিয়ম কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের উপর। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষ সভায় ২৪ জন সদস্য ছিল। তন্মধ্যে ১৬ জন ইওরোপীয় ও ৮ জন ভারতীয়। উইলিয়ম কেরী ও ডেভিড হেয়ার প্রথম হইতেই অধ্যক্ষ সভার সদস্য ছিলেন। রাধাকান্ত দেব ও ই. এস. মন্টেগু যথাক্রমে ভারতীয় ও ইওরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্সকে দেশীয় পাঠশালা বিভাগের সম্পাদক এবং গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে বেতনভোগী পণ্ডিতদের কর্মে নিয়োগ করা হয়।

রাধাকান্ত কলিকাতাকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগের মধ্যে অবস্থিত পাঠশালাগুলির ভার একজন করিয়া তত্ত্বাবধায়কের হস্তে অর্পণ করেন। রাধাকান্ত নিজে একটি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন। অপর তিনটি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দুর্গাচরণ দত্ত, রামচন্দ্র ঘোষ ও নন্দলাল ঠাকুর।

সোসাইটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন। কলিঙ্গায় শ্রীরামপুর মিশনের এবং টালায় ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের যে বিদ্যালয় দুইটি ছিল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি তাহাদের ভার গ্রহণ করিল। বিভিন্ন অঞ্চলে কমিটি যে

চারিটি বিদ্যালয় স্থাপন করে তাহাদের মধ্যে আরপুলি পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করিতেন ডেভিড হেয়ার।

সোসাইটির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল—সোসাইটির স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সে সময় উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল হিন্দু কলেজ। ছাত্রপ্রতি পাঁচ টাকা মাসিক বেতনে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ সোসাইটির কুড়িজন ছাত্রকে কলেজে ভর্তি করিয়া লইতে সম্মত হন। পরবর্তী কালে প্রতি বৎসর ত্রিশজন ছাত্র কলেজে অধ্যয়নের সুবিধা লাভ করিয়াছিল।

প্রথম পাঁচ বৎসর সোসাইটি সরকারের নিকট হইতে এক কপর্দক সাহায্যও পায় নাই। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাভাবে কর্তৃপক্ষ আদর্শ বিদ্যালয়গুলি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। একমাত্র আরপুলি পাঠশালা ডেভিড হেয়ারের হাতে রহিয়া গেল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটি এই স্কুলের আংশিক ব্যয় বহন করিত। অবশিষ্ট ব্যয় বহন করিতেন ডেভিড হেয়ার।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক সাহায্য প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্ট পরবর্তী মে মাস হইতে মাসিক পাঁচশত টাকা সাহায্যদানে স্বীকৃত হন।

দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতিবিধানই সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাধাকান্ত দেব এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

পাঠশালার ছাত্রদের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। সর্বসমেত ৩,৭৮৭ জন ছাত্রের মধ্যে ২৫২ জন পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হয়। চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষা হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল। ইহার পর দুই বৎসর যাবৎ বার্ষিক পরীক্ষা হয় নাই। পঞ্চম বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী। বার্ষিক পরীক্ষা বরাবর শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের ভবনে লওয়া হইত।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সোসাইটির নানা ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিতে আরম্ভ করে। সোসাইটির অর্থ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানীতে গচ্ছিত ছিল। ঐ কোম্পানী ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল দেউলিয়া হইয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে সোসাইটির গচ্ছিত ৩,৯৩৭ টাকা নষ্ট হইয়া যায়। জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানীর পতনের পর সোসাইটির টাকা ম্যাকিন্টস কোম্পানীতে গচ্ছিত থাকে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে

এই কোম্পানীও দেউলিয়া হইয়া গেলে অর্থাভাবে সোসাইটির কার্য একরূপ বন্ধই হইয়া যায়। পটলডাঙ্গা স্কুল পরিচালনা ও হিন্দু কলেজে সোসাইটির ছাত্রদের বেতনের জন্য ব্যয় ব্যতীত দেশীয় পাঠশালা সমূহে সকল সাহায্যই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আরপুলি পাঠশালা তুলিয়া দিয়া ইহার ইংরেজী বিভাগটি পটলডাঙ্গা স্কুলের সহিত যুক্ত করা হয়।

স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় রিপোর্টে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ব্যতীত আরো তিনটি প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায়।[১] একটি প্রতিষ্ঠান হইতেছে কলিকাতা ডিওসেসান (Diocesan) কমিটির সহিত সম্পর্কিত স্কুল ব্রাঞ্চ। ইহা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অগস্ট স্থাপিত হয়। ইহা ইওরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হইত। দ্বিতীয়টি ঢাকা স্কুল সোসাইটি। ইহা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর স্থাপিত হয়। তৃতীয়টি হইতেছে মুর্শিদাবাদ স্কুল সোসাইটি। ইহা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন জন্ম লাভ করে।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তদানীন্তন স্কুল কলেজে স্কুল বুক সোসাইটির পুস্তকের খুব চাহিদা ছিল।

"The Government Schools at Chinsurah, the various schools established at Calcutta, Barrackpore, Burdwan, Moorshidabad, Benares, Agra, and Dinapore, and the Hindoo College, and particularly the numerous schools under the superintendence of the Calcutta School Society, have all a regular demand for its elementary and other works".[২]

এই সময় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েকটি পাঠশালা ও স্কুল স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'বেল' পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পাদ্রী রবার্ট মে চুঁচুড়ায় নিজের বাড়ীতে একটি অবৈতনিক

১। The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings: Second year, 1818-19: Calcutta 1819: pages 25-6.

২। The Third Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings (1819-20): Calcutta 1820-21: page 26.

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমদিন ১৬ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। অগস্ট মাসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাওয়ায় তদানীন্তন চুঁচুড়ার কমিশনার গর্ডন ফোর্বেস দুর্গের মধ্যে ঐ স্কুলের জন্য একটি প্রশস্ত ঘর ছাড়িয়া দেন। অক্টোবরের প্রথমেই ছাত্রসংখ্যা ৯২ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মিঃ মে চুঁচুড়ার অনতিদূরে একটি গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ১৬টি স্কুল স্থাপন করেন এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫১।[১]

মের কৃতিত্বের কথা গর্ডন ফোর্বেস গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনিলে গভর্ণমেণ্ট পাঠশালার সাহায্যার্থে প্রতি মাসে ৬০০ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হন। স্থির হয় যে, ফোর্বেস গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পাঠশালাগুলির দেখাশুনা করিবেন।

দুর্গের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা বলিয়া মে কেন্দ্রীয় স্কুলটিকে চুঁচুড়ার অনতিদূরে স্থানান্তরিত করেন। গভর্ণমেণ্ট মের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া মাসিক সাহায্য ৬০০ টাকার স্থলে ৮০০ টাকা করিয়া দিলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে মের মৃত্যু হইলে তাঁহার কার্যে ছেদ পড়িল। তাঁহার মৃত্যুকালে তৎপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,০০০।[২]

মের মৃত্যুর পর স্কুলগুলির ভার গ্রহণ করেন মিঃ পিয়ার্সন এবং তাঁহার সাহায্যকারী হন মিঃ হার্লে।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষা সমাজ মের স্কুলগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলগুলির পরিচালনার ভার Incorporated Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts নামক সমিতির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই শিক্ষা সমাজ স্কুলগুলির ভার পুনরায় গ্রহণ করে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে হুগলী কলেজ

১। Charles Lushington: The History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity: Calcutta 1824: p. 146.

২। Charles Lushington: The History, Design and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity: Calcutta 1824: pages 151-2.

ও ব্রাঞ্চ স্কুল স্থাপিত হইলে সরকারী শিক্ষা সমাজ মের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি বন্ধ করিয়া দেয়।

ধর্মের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ক্যাপ্টেন জেমস স্টুয়ার্ট এক বৎসরের মধ্যেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে দশটি পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত চার্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা শাখা এই পাঠশালাগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জেটার ও ডীয়ার নামক দুইজন পাদ্রী এই পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রামমোহন রায় নিজ ব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এখানে নিয়মিত ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

রামমোহনের স্কুলের অনুরূপ একটি স্কুল পরিচালনা করিতেন জগমোহন বসু। ভবানীপুরের এই স্কুলটি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সময়ের শিক্ষার আন্দোলন প্রধানত হিন্দু কলেজের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের একটি পরিকল্পনা করিয়া হিন্দু প্রধানদের হাতে দিলে ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে অনুরোধ জানান। হাইড ঈস্টের আমন্ত্রণে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন হিন্দুগণ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন।

দ্বিতীয় সভা আহূত হয় পরবর্তী ২১শে মে। এই সভায় স্থির হয় যে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের নাম হইবে হিন্দু কলেজ। দশ জন ইওরোপীয় এবং কুড়ি জন হিন্দু সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। ইওরোপীয় সদস্য ছিলেন সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জন হার্বার্ট হারিংটন, ডবলিউ. সি. ব্লাকিয়ার, জে. এইচ. টেলর, হোরেস হেম্যান উইলসন, এন. ওয়ালিচ, উইলিয়ম ব্রাইস, ডি. হিমিং, টমাস রোবাক ও ফ্রান্সিস আর্ভিন। হিন্দু সদস্যদের নাম হইতেছে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, পণ্ডিত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাজা রামচাঁদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চৈতন্যচরণ

শেঠ, রাধাকান্ত দেব, রামরত্ন মল্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল। ফ্রান্সিস আর্ভিন ইওরোপীয় সম্পাদক এবং দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দেশীয় সম্পাদক হইলেন।

ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কলেজ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বহু অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও পরিচালনার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্ বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন জন্মলাভ করে। এই সরকারী শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি হন জন হার্বার্ট হ্যারিংটন এবং সম্পাদক ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার এই সভার উপর পড়ে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইলে সরকার ২৪,০০০ টাকার অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু সর্ত হয় যে, সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজ পরিদর্শন করিতে পারিবেন। শিক্ষাসভার সম্পাদক ডাঃ উইলসনকে কলেজের প্রথম ভিজিটর নিযুক্ত করা হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার কলেজের অধ্যক্ষসভার সদস্য হন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দু কলেজ ঐ বাড়ীতে উঠিয়া আসে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী বহুবাজারের ৬৬ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হইয়াছিল।

হিন্দু কলেজে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রধান স্থান দেওয়া হইত। ইহার ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৭০, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১০, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২৩, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩৩, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪২১ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০৯।[১] ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা চারিশতেরও অধিক ছিল বলিয়া জানা যায়।

হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার প্রধান স্থান ছিল। এই ইংরেজী শিক্ষাদানের

১। F. W. Thomas: The History and Prospects of British Education in India: Cambridge University 1891: page 27.

ভিতর দিয়াই হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ডেভিড লিস্টার রিচার্ডসন নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের প্রভাব নব্যশিক্ষিত যুবকদের উপর পড়িয়াছিল।

ধর্মতলার ডেভিড ড্রমণ্ড স্কুলে ড্রমণ্ডের নিকট ডিরোজিও যে শিক্ষা পান তাহাই পরবর্তী জীবনে তাঁহার স্বাধীন চিন্তার আদর্শ গঠন করিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। ড্রমণ্ডকে অনেকে ডেভিড হিউমের মতাবলম্বী নাস্তিক স্কচ বলিয়া জানিত। ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, সদাশয়তা, প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডিরোজিও সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন।

ডিরোজিওর প্রেরণাতেই ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ডিরোজিও তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উন্নত চিন্তায় পরিপূর্ণ সাহিত্য ও ইতিহাসের এক স্বর্ণসিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

"He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon—to live and die for truth—to cultivate and practise all the virtues, shunning vice in every shape. He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation, and the way in which he set forth the points stirred up the minds of his pupils. Some were impressed with the excellence of justice, some with the paramount importance of truth, some with patriotism, some with philanthropy".[১]

ডিরোজিওর ছাত্রেরা প্রচলিত রীতিনীতিকে পদদলিত করিয়া বেড়াইতেন।

১। Peary Chand Mittra : David Hare : Basumati Sahitya Mandir edition : Calcutta 1949 : p. 31.

ধর্মের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ডিরোজিও ছাত্রদের লইয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। এবিষয়েও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ডেভিড হেয়ার এই সমস্ত সভায় নিয়মিত যোগদান করিতেন এবং পরে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ হইতে পদত্যাগ করিলে ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন চীফ জাস্টিস সার্ এডওয়ার্ড রায়েন, কর্ণেল বেনসন, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডব্লিউ. এইচ. মিল প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিরাও মধ্যে মধ্যে এই সভাতে যোগদান করিতেন। সভ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ছাত্রদের অবাধ স্বাধীনতায় হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত সভাসমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া এক নোটিশ বিজ্ঞাপিত হইল। দেওয়ান রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু ম্যানেজারেরা ডিরোজিওকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ার ডিরোজিওকে একজন অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক বলিয়া অভিমত দিলেন। ডাক্তার উইলসনও ডিরোজিওর সপক্ষে মত ব্যক্ত করিলেন। তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে ডিরোজিওকে কলেজ হইতে সরানই স্থির হইল। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ডিরোজিও তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির উত্তর দিয়া উইলসনকে একটি পত্র লেখেন। ডিরোজিও অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন। ডিরোজিওর মতে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি, যে বাড়ী বাড়ী সংবাদ পরিবেশন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, সেই অপবাদগুলি রটনা করিয়াছিল। সে ডিরোজিওর ভগিনী এমেলিয়ার সহিত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের গুজবও প্রচার করিয়াছিল।

কলেজ হইতে পদত্যাগ করিবার পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার ডিরোজিও কলেরায় মারা যান।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্রথম অগ্রণী হন ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি। এই সোসাইটি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি কলিকাতায় প্রথম

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' গ্রন্থের ১ম ভাগে দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথনের একস্থলে আছে,

"উ।...কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশালা নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এইক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটি স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।"[১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ প্রকাশে রাধাকান্ত দেব যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করে। গৌরমোহন এই পুস্তকে দেখাইয়াছিলেন যে, স্ত্রীশিক্ষাতে শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক কোন দোষ নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রীলোকদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মিশনরীরাই প্রথম ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করে।

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি জুভেনাইল স্কুল ছাড়া আরও তিনটি বালিকা বিদ্যালয় কলিকাতার গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে স্থাপন করে। চাঁদাদাতাদের বাসস্থানের নাম অনুসারে এই বিদ্যালয়গুলির নাম ছিল লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অনুরোধে লণ্ডনে ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কুমারী মেরী অ্যান কুককে এদেশে প্রেরণ করে।[২] কিন্তু স্কুল সোসাইটির তখন এমন আর্থিক অবস্থা ছিল না যাহাতে তাহার কর্তৃপক্ষ কুককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন। তখন চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাঁহাকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কার্যে নিযুক্ত করে।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কুকের প্রচেষ্টায় আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কুকের আশাতীত সাফল্যের উল্লেখ করিয়া প্রিশিলা চ্যাপমান লিখিয়াছেন,

---

১। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার: স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৯৩৭: পৃ ১০

২। Peary Chand Mittra: David Hare: p. 62.

"At the end of four months from Jan. 12, 1822 Miss Cooke's efforts had been so far blessed, and attended with more favourable results than she had anticipated. The number of girls then on the school list, was two hundred and seventeen ; about two hundred in daily attendance."[১]

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪০০ জন।

Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity নামক প্রতিষ্ঠান ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্থাপিত হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে চার্চ মিশনরী সোসাইটি অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের পরিচালন ভার লেডীস সোসাইটির হস্তে তুলিয়া দেন।

এই সময় চার্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী আইজাক উইলসন কুমারী কুককে বিবাহ করেন।

লেডীস সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণে সিমুলিয়ায় মহাসমারোহে সেণ্ট্রাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল মিস্টার ও মিসেস উইলসন ৫৮ জন বালিকা লইয়া সেণ্ট্রাল স্কুলের কার্যারম্ভ করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সেণ্ট্রাল স্কুলে প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়।

বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ডেভিড হেয়ারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সুতরাং ডেভিড হেয়ারের সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ঘড়ির ব্যবসা করিতে এদেশে আসেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ই. গ্রের হস্তে ব্যবসার ভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি জনহিতকর কার্যে নিজেকে নিয়োগ করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হেয়ারের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু কলেজের জন্মের সূচনা হয়। হেয়ার প্রথমে হিন্দু কলেজের পরিদর্শক এবং পরে ইহার একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির সহিত

৩। Priscilla Chapman : Hindu Female Education : London 1839 : p. 81.

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য তিনি সিমলা স্কুল, আরপুলি পাঠশালা এবং পটলডাঙ্গা স্কুল স্থাপন করেন।

বাঙ্গালার নবজাগরণের ইতিহাসে হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডিরোজিওর পরেই হেয়ারের প্রভাব পড়িয়াছিল। হেয়ার প্রাচ্য-প্রতীচ্য রক্ষণশীল-প্রগতিশীল সকল মনোবৃত্তিরই ভাল অংশের গ্রাহক ছিলেন। হেয়ার তাঁহার সময়ের কোন আন্দোলন হইতেই দূরে ছিলেন না। কিন্তু কোন দলগত উত্তেজনার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া ফেলেন নাই। প্রগতিশীল দলের নেতা রামমোহন এবং রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকান্ত উভয়েই হেয়ারকে বন্ধুভাবে পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই দলগত আন্দোলনের মধ্যে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই।

প্রগতিশীল দলের প্রতি হেয়ার যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামমোহনের আত্মীয় সভার সহিত তিনি যুক্ত হন। ডিরোজিও-প্রতিষ্ঠিত একাডেমিক এসোসিয়েশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ডিরোজিওর পদত্যাগের পর হেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। এই এসোসিয়েশন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোনমতে টিকিয়া ছিল। হেয়ার ইয়ং বেঙ্গলের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মাধবচন্দ্র মল্লিকের জোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে ডেভিড হেয়ারের সম্বর্ধনার আয়োজন করিবার জন্য দুইটি সভা আহূত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর দিবসে আহূত সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী দিবসে আয়োজিত দ্বিতীয় সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক সভাপতি হন। কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ, দক্ষিণারঞ্জন, রাধানাথ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পরে স্থির হয় যে, সকলে চাঁদা করিয়া হেয়ারের একটি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন। হরচন্দ্র ঘোষ এই সম্বর্ধনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হেয়ারের জন্মদিনে হেয়ার স্কুলে দক্ষিণারঞ্জনের নেতৃত্বে হেয়ারের অসংখ্য ছাত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটি কৃতজ্ঞতাসূচক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রতিকৃতির জন্য চিত্রকরের সম্মুখে বসিতে অনুরোধ জানান। ঐ অভিনন্দনপত্রে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছাড়া আরও ৫৬৪ জনের স্বাক্ষর ছিল। দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় য়ুরেশিয়ান চিত্রকর

চার্লস পোট্ কর্তৃক হেয়ারের তৈলচিত্র অঙ্কিত হয়। উহা হেয়ার স্কুলে রক্ষিত আছে।

হেয়ারের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হইতেছে যে, তিনি এ দেশে শিক্ষার প্রকৃত অভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষান্দোলনে এদেশে দুইটি দল ছিল। মেকলে প্রমুখ ব্যক্তিরা ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয়দের শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। মিশনরীগণ, কোম্পানীর তরুণ কর্মচারিবৃন্দ এবং রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ভারতীয়েরা মেকলের দলে যোগ দেন। অপর পক্ষ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্যের পঠনপাঠন ব্যবস্থারও পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার বাহনরূপী ভাষার বিষয়ে আবার ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত হন। হেস্টিংস, মিণ্টো প্রমুখ একদল সংস্কৃত ও আরবী ভাষার সপক্ষে ছিলেন। মুনরো, এলফিনস্টোন প্রমুখ একদল মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষাকে সমর্থন করেন। ডেভিড হেয়ার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। এই সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র বলিয়াছেন,

"Hare formed a correct estimate of the educational wants of the Hindus and determined that there should be English education, Vernacular education, and the supply of good English and Vernacular books, on the progressive scale. He, therefore, directed his attention in the supply of these desiderata"[১]

পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মুখ্যত হেয়ারের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু কলেজের জন্ম হয়। আবার মাতৃভাষায় জ্ঞানলাভের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য হেয়ার স্কুল সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। মাতৃভাষা ও ইংরেজীতে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচারের জন্য স্থাপিত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিরও তিনি অন্যতম কর্মকর্তা হন। হিন্দু কলেজের উন্নতি হইলে ইহার শিশুশিক্ষার শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করিয়া সেটিকে একটি বাঙ্গালা পাঠশালা রূপে

১। Peary Chand Mittra : David Hare : p. 5.

স্থাপন করা হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন হেয়ার এই পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উডের শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচে নব্যশিক্ষার দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং সেই সঙ্গে হেয়ারের শিক্ষাদর্শেরও যাথার্থ্য প্রমাণ লাভ করে। ইহার পর হইতে এই শিক্ষাদর্শ ই অনুসৃত হইতেছে। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রাধাকান্ত দেবও এই শিক্ষাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন সকালে কলেরা রোগে হেয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে একটি মহৎ ও প্রেরণা-দায়ক প্রভাবের তিরোধান ঘটে।

এইবার পুনরায় হিন্দু কলেজের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই সময় ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলন বিশেষভাবে প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কোন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, প্রাচ্য, না প্রতীচ্য? এই প্রশ্ন লইয়া কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভ্যদের মধ্যে তুমুল বিরোধ বাধে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের এ্যাক্‌টের দ্বারা কমিটির হস্তে ১০,০০০ পাউণ্ডের স্থলে ১০০,০০০ পাউণ্ড শিক্ষা বাবদ খরচ করিবার জন্য দেওয়া হয়। এই টাকা কি করিয়া খরচ করা হইবে? কমিটির সদস্যদের মধ্যে পাঁচজন প্রাচ্য শিক্ষার সপক্ষে ও অপর পাঁচজন বিপক্ষে মত দেন।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড মেকলে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। এই সময় চারিদিকে 'ইংরেজী শিক্ষা চাই', 'ইংরেজী শিক্ষা চাই' রব উঠিয়াছে। প্রাচ্য শিক্ষার পুস্তকের বাবদ এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মেকলে তাঁহার বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন,

"'These books', he writes, 'find no purchasers. It is very rarely that a single copy is disposed of. Twenty-three thousand folios and quartos fill the libraries or rather the lumber rooms of this body. The Committee contrive to get rid of some portion of their vast stock of oriental literature by giving books away. But they cannot give so fast as they print. About 20,000 rupees a year are spent in adding fresh masses of waste-paper to a hoard, which,

I should think, is already sufficiently ample. During the last three years about 60,000 rupees have been expended in this manner. The sale of Arabic and Sanskrit books during those three years has not yielded quite 1,000 rupees. In the meantime the school-book society is selling seven or eight thousand English volumes every year, and not only pays the expenses of printing, but realizes a profit of 20 percent on its outlays'".[১]

এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণ লোক ইংরেজী শিক্ষাকে কিরূপ আগ্রহের সহিত চাহিতেছিল। এই সময় কলিকাতার মুখ্য কলেজগুলিতে ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা হইতে থাকে। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। হিন্দু কলেজে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রধান স্থান দেওয়া হইত। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন তাঁহাদের ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের রিপোর্টের একস্থানে লেখেন,

"In addition to the measures adopted for the diffusion of English in the provinces, and which are yet only in their infancy, the encouragement of the Vidyalaya, or Hindu College of Calcutta, has always been one of the chief objects of the Committee's attention. The consequence has surpassed expectation. A command of the English language and a familiarity with its literature and science have been acquired to an extent rarely equalled by any schools in Europe. A taste for English has been widely disseminated, and independent schools, conducted by

১। F. W. Thomas: The History and Prospects of British Education in India: Cambridge University 1891: p. 26.

youngmen reared in the Vidyalaya, are springing up in every direction".[১]

বিশেষ করিয়া ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যেই ইংরেজী শিখিবার স্পৃহা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহারা কালিদাসের স্থলে সেক্‌সপীয়রকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বাইবেলের কাছে বেদবেদান্তকে নস্যাৎ করিয়া দিলেন, 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র নীতিউপদেশকে অত্যন্ত সেকেলে বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন।

ইংরেজী শিখিবার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের কথা ট্রিভেল্যানও বলিয়াছেন,

"A loud call arose for the means of instruction in it, and the subject was pressed on the Committee from various quarters. English books only were in any demand : upwards of thirty-one thousand English books were sold by the school-book society in the course of two years, while the education committee did not dispose of Arabic and Sanskrit volumes enough in three years to pay the expense of keeping them for two months."[২]

দেশে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বুঝিয়া মেকলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী এক মন্তব্যপত্র লিপিবদ্ধ করেন। ঐ বৎসর ৭ই মার্চ তারিখে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক উক্ত মন্তব্যপত্রে স্বাক্ষর দেন। এই বিধি অনুসারে স্থির হয়, যে লক্ষ টাকা এদেশীয় শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতেছিল তাহা তদন্তর শুধু ইওরোপীয় সাহিত্যবিজ্ঞানাদির জন্য ব্যয়িত হইতে থাকিবে এবং ইংরেজী ভাষাতেই সমুদায় শিক্ষাদান করা হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা জয়ী হইলেও বিরোধের শেষ হইল না। মাতৃভাষার সমর্থকগণের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষাপন্থীদের বিবাদ দেখা দিল।

১। Charles E. Trevelyan : On the Education of the People of India : London 1838 : p. 8.

২। Charles E. Trevelyan : On the Education of the People of India : London 1838 : p. 9.

এই সময় বড়লাট বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অ্যাডাম তদানীন্তন শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধান করিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ও ২৩শে ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তিনখণ্ডে তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন।

ইওরোপীয় শিক্ষার প্রচার সমর্থন করিলেও অ্যাডাম ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার অসুবিধাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

"It is impossible for me fully to express the confirmed conviction I have acquired of the utter impracticability of the views of those, if there are any such, who think that the English language should be the sole or chief medium of conveying knowledge to the natives."[১]

অ্যাডাম মেকলে প্রমুখ শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণের 'filtration theory'-র নিন্দা করিয়াছিলেন। ইঁহারা মনে করিতেন যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভদ্র ব্যক্তিদের সন্তানগণ শিক্ষিত হইলে ক্রমে অজ্ঞ দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিবে। অ্যাডামের ধারণা ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করিতেন যে, গ্রামকে আমাদের ইউনিট ধরিয়া লইতে হইবে। যেমন গ্রাম হইতে থানা, থানা হইতে মহকুমা, মহকুমা হইতে জেলা, জেলা হইতে বিভাগ, বিভাগ হইতে প্রদেশ, সেইরূপ শিক্ষাও নিম্নস্তর হইতে ক্রমে উচ্চস্তরে বিস্তৃত হইতে থাকিবে। তাঁহার মতে গ্রামের পাঠশালাই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান করা একান্ত কর্তব্য।

"The leading idea, that of employing existing native institutions as the instruments of national education, has been already suggested'; and if their adaptation to this purpose had not been so much overlooked, it would have

১। Anathnath Basu : Reports on the State of Educaton in Bengal (1835 & 1838) by William Adam : University of Calcutta 1941 : p. 308.

seemed surprising that they were not the very first means adopted for its promotion."[১]

অ্যাডাম 'filtration theory'-র বিরোধিতা করিয়াছেন। নিম্নস্তরের শিক্ষা ভাল না হইলে উচ্চস্তরের শিক্ষা ভাল হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন,

"On the contrary, the efficiency of every successive higher grade of institution cannot be secured except by drawing instructed pupils from the next lower grade, which, consequently by the necessity of the case, demands prior attention."[২]

অ্যাডামের ধারণা ছিল যে, দেশীয় গ্রাম্য পাঠশালাগুলির উন্নতিবিধান করিলেই প্রকৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে। দুঃখের বিষয় অ্যাডামের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের স্থলে কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় এক আদেশ পত্র আসে। জন স্টুয়ার্ট মিল ঐ আদেশপত্র রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

এই আদেশপত্রের মুখ্য বিষয়গুলি হইতেছে—(১) শিক্ষাবিভাগ নামে রাজকার্যের একটি আলাদা বিভাগ গঠন; (২) প্রাদেশিক রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; (৩) সরকারী স্কুল ও কলেজগুলির উন্নতিবিধান ও তাহাদের সংখ্যা বর্ধন; (৪) মিডল স্কুল নামে কতকগুলি স্কুল স্থাপন; (৫) বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ ও বাঙ্গালা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং (৬) প্রজাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহায্যদান।

১৮৩৫ ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আদেশপত্র বাঙ্গালা দেশে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ইংরেজী শিক্ষার সুফল ফলিতে আরম্ভ হয়।

১। Anathnath Basu : Reports on the State of Education in Bengal by William Adam. : পৃ ৩৫৭

২। ঐ : পৃ ৩৫৮

পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ এবং ইয়ং বেঙ্গলের উপর ইহার ফল বর্তাইয়াছিল সর্বাপেক্ষা বেশী।

ইংরেজী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ডিরোজিওর পরেই কাপ্তেন রিচার্ডসনের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক এবং পরে প্রিন্‌সিপাল হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে রিচার্ডসন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের কর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হন। জে. ই. ডি. বেথুনের সহিত মতানৈক্যের ফলে তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া ক্রমে মেট্রোপলিটান একাডেমি, গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনরী ও ডেভিড হেয়ার একাডেমি নামক বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজের (হিন্দু কলেজের পরিবর্তিত নাম) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একমাত্র কন্যাকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

রিচার্ডসনের শিক্ষায় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে নূতন প্রেরণা ও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। রিচার্ডসন উচ্চকোটির সমালোচক, কবি, সংবাদপত্রসেবী ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সেক্‌সপীয়রের নাটক পড়াইবার পদ্ধতি সর্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত হইয়াছিল। পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য হিন্দু কলেজের Principal থাকা কালে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'Selections from the British Poets' নামক একটি উৎকৃষ্ট সঙ্কলন প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'Literary Leaves' প্রকাশিত হইয়াছিল। রিচার্ডসন দীর্ঘকাল ধরিয়া 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও 'লিটারেরি গেজেটে'র সম্পাদনা করেন। কিছুদিন তিনি 'বেঙ্গল হরকরা'রও সম্পাদক ছিলেন।

ডিরোজিওর মত রিচার্ডসনের মধ্যেও একটি টাইটানিক শক্তি ছিল। এই শক্তির প্রচণ্ডতার আদর্শরস শিষ্যমণ্ডলী আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই ইয়ং বেঙ্গলের জন্ম হইয়াছিল।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে একাডেমিক এসোসিয়েশন হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। ডেভিড হেয়ার সভাপতির পদে বৃত হন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে সভাপতি করিয়া Society for the Acquisition of General Knowledge অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা নামে একটি সভা স্থাপন করে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে হইতে সভার কার্য আরম্ভ হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবারে সভার অধিবেশন হইত। ডি. এল. রিচার্ডসন যুবকদের অতিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা পছন্দ করিতেন না। সত্য বলিতে কি ইয়ং বেঙ্গল গুরুদেরও কল্পিত সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের শিক্ষার ফলে ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি হয়। ইয়ং বেঙ্গল যেন এভারেস্ট। তাহার শীর্ষেই প্রথম নবজাগ্রত চেতনার সূর্যালোক পড়িয়াছিল। এই আলোই ক্রমে দেশের চিত্তক্ষেত্রের সমতলে নামিয়া আসিয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের পরেই ডেভিড হেয়ারের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের উদ্দামতা ও বিক্ষোভ ক্রমে শান্ত সংহত ও আত্মস্থ হইয়া জাতির রসচেতনায় স্থান পাইল এবং ক্রমে সাহিত্যেও সমাজে নানা কল্যাণের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজের কলেজবিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয় এবং স্কুলবিভাগ হিন্দু স্কুল নাম পরিগ্রহ করে।

হিন্দু কলেজের উন্নতিবিধান ছাড়া জনশিক্ষাকল্পে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রথম চেষ্টা করেন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮)। তিনি বিভিন্ন জেলায় একশত একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করান। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল এই বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলে শিক্ষা সমাজ ইহাদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ডক্টর এফ. জে. মৌএট (Dr. F. J. Mouat)-এর এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কলিকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালীদের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মেডিকেল কলেজ হলে মিলিত হন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর স্প্রেঙ্গার (Dr. Sprenger), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, ডক্টর মৌএট ও রেভারেণ্ড লঙ এক দীর্ঘ আলোচনায়

যোগদান করেন। ইহার ফলে ঐ তারিখে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট চর্চার জন্য বেথুন সোসাইটি নামক একটি সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি এদেশে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে অন্যতম অগ্রগণ্য উদার-হৃদয় বেথুন ঐ বৎসরের ১২ই অগস্ট পরলোকগমন করেন। এই উজ্জ্বল ব্যক্তিপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই সমিতির নামকরণ বেথুন সোসাইটি করা হয়। বিদ্যাসাগর, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সোসাইটির সভ্য হন। মৌএট সোসাইটির সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন।

মেডিকেল কলেজে এই সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। দেবেন্দ্রনাথ এই সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠা-সদস্য ও কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মিশনরীদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেও সাধারণভাবে ইওরোপীয়দের প্রতি কোন বিশেষ প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতেন না। আর এই মিশনরীদের প্রতি বিদ্বেষ সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে যে সকল ক্ষেত্রে নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মিশনরীরা আক্রমণ করিয়াছে। তাহা না হইলে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি খুবই সহনশীল ছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সোসাইটির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে যে গ্রন্থসভা গঠিত হয় তাহার সভ্যত্রয় ছিলেন মেজর জি. টি. মার্শাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ডফ বেথুন সোসাইটির সভাপতির পদে বৃত হন এবং বহু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ডাঃ ডফ ভারত ত্যাগ করেন, তখনও এই সোসাইটি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ কার্পেন্টারের ভারত পরিদর্শনের কালেও ইহা জীবিত ছিল দেখা যায়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেও সোসাইটির বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজে' প্রকাশিত হইত। সোসাইটির প্রথম দিককার প্রায় পূর্ণ বিবরণ 'The Proceedings of the Bethune Society for the Sessions of 1859-60, 1860-61'-এতে পাওয়া যায়।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে স্কুল

বুক সোসাইটির সহযোগী ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি (পরে সোসাইটি) গঠিত হয়। সোসাইটির প্রথম সম্পাদক হন প্র্যাট্। তাঁহার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল (E. B. Cowell) সম্পাদক পদে বৃত হন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের পাঠোপযোগী ইংরেজী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া স্বল্পমূল্যের পুস্তকাদি প্রণয়ন করা। কর্তৃপক্ষ সমাজের নির্দেশানুসারে লিখিত গ্রন্থের স্বত্বের জন্য দুইশত টাকা পারিশ্রমিক দিতেন। এই সমাজের আনুকূল্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের 'শিল্পিক দর্শন' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই সোসাইটি প্রকাশ করে। এই সমাজের সহিত প্যারীচাঁদ মিত্র ও রেভারেণ্ড লঙ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ-পুস্তকাবলীর মধ্যে হরচন্দ্র দত্তের 'লর্ড ক্লাইব' (১৮৫২), এডবার্ড রোএর 'মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ লেম্বসটেলের কতিপয় আখ্যায়িকা' (১৮৫৩), জন রবিন্‌সনের 'রবিন্‌সন ক্রুসোর জীবনচরিত' (১৮৫২), রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের 'পল এবং বর্জিনিয়ার জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৬), আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের 'বৃহৎ কথা দুইখণ্ড' (১৮৫৭) বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

এই সময় দেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদান লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্মের আলোচনায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে শিক্ষান্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরের দিন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে প্রিন্‌সিপালের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন হয়। বিদ্যাসাগর প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া দিয়া সপ্তাহান্তে রবিবার ছুটির দিন ধার্য করিলেন। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পাইত। বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম কায়স্থ এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকে

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের অধিকার দিলেন।[১] তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ডেপুটিগিরি দিতে সম্মত হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে প্রবেশ-দক্ষিণা এবং পুনঃ প্রবেশ-দক্ষিণা দুই টাকা ধার্য করা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি মাসিক একটাকা বেতনের ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়।

হিন্দু সাহিত্যের অনুশীলন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার, এই দুই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আনয়ন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলনের জন্য ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী শ্রেণী খোলা হয়। কিন্তু ইহা আট বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শিক্ষাপরিষদের প্রচেষ্টায় এই শ্রেণী পুনঃস্থাপিত হইলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর ইংরেজী বিভাগে একটি সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করেন। পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জে. আর. ব্যালাণ্টাইন শিক্ষাপরিষদের আমন্ত্রণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসেন।

ব্যালাণ্টাইন তাঁহার পরিদর্শন-রিপোর্টের শেষে লেখেন,

"ভারতীয় পাণ্ডিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমান, তাহা ঘুচাইবার জন্যই আমি এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছি।......কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় মিল, কোথায় অমিল, তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ যে সন্তোষজনক নয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি এবং সেইজন্যই নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গঃ কলিকাতা ১৯৩১ঃ পৃ ৮

অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি…। (অনূদিত)"[১]

বিদ্যাসাগর ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালীকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি ব্যালাণ্টাইনের অনুমোদিত অধিকাংশ পুস্তকের প্রচলনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের মতে যে লোক সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে তাহার কাছে সত্য দ্বিবিধ এই ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যে বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয় তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার সম্ভাবনা।

শিক্ষা পরিষদ্ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনকে সমর্থন করাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মৌএটকে একটি আধাসরকারী পত্র লেখেন। এই পত্র লেখার ফলে বিদ্যাসাগর নিজের প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণের অধিকার লাভ করেন। এই প্রণালী যে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে।

"The course of instruction at the Sanskrit College adapted, as it has of late been, to modern ideas and to purposes of practical utility, is being successfully carried on and administered by its able Principal, Pandit Ishwarchandra Sharma, and is producing results, the effects of which upon the education of the lowest classes cannot be overrated. (Report for May 1855—April 1856)"[২]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সার্ হেনরী হার্ডিঞ্জ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যাহাতে জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার প্রথম প্রয়াস পান। তিনি বঙ্গ

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১৮২৪-৫৮) প্রথম খণ্ডঃ কলিকাতা ১৯৪৮ঃ পৃ ৫৩

২। ঐ ঃ পৃ ৫৯-৬০

বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে মাসিক ১৮৬৫ টাকা ব্যয়ে ১০১টি পল্লীপাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই পাঠশালাগুলির শিক্ষকনির্বাচনের ভার কাপ্তেন মার্শাল ও বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাঙ্গালা দেশে ছোটলাট পদের সৃষ্টি হইলে ফ্রেডারিক. জে. হ্যালিডে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ শিক্ষা পরিষদের সদস্যরূপে হ্যালিডে বাঙ্গালায় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত একটি মিনিটে প্রকাশ করেন। ছোটলাট হইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত প্রণালীকে বড়লাটের অনুমোদনের জন্য ১৬ই নভেম্বর পাঠাইয়া দেন। হ্যালিডের মিনিটের মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের মন্তব্য। শিক্ষাপরিষদের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, সার্ জেমস্ কোলভিল প্রভৃতি—বিদ্যাসাগরকে তত্ত্বাবধায়ক করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

হ্যালিডে ছোটলাট হইয়া বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়-গুলির স্থান নির্বাচনের ভার দেন। বিদ্যাসাগর ২১শে মে হইতে ১১ই জুন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই ছোটলাটের নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার্ চার্লস উড ভারতের শিক্ষা বিষয়ক চার্টার নামক বিখ্যাত পত্রখানিতে স্বাক্ষর দেন। পর বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে বাঙ্গালায় কাজ আরম্ভ হইল এবং শিক্ষা পরিষদের স্থলে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন জন্মগ্রহণ করিল। এই ডেসপ্যাচে ইংরেজী শিক্ষার সহিত মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ছোটলাটের বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হইতে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার অতিরিক্ত এই কাজে মাসে দুইশত টাকা করিয়া বেতন পাইতে লাগিলেন।

পাঠশালায় শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সৃষ্টি করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ভার অক্ষয়কুমার দত্তের উপর এবং নিম্নশ্রেণীর ভার মধুসূদন বাচস্পতির উপর পড়ে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী

এবং মেদিনীপুর এই চারিটি জেলার প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করিয়া স্কুল স্থাপনে সমর্থ হন।

এইবার শিক্ষান্দোলনে বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে আসা যাক।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অর্থাভাবে স্কুল সোসাইটির কার্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একরূপ বন্ধ হইয়া যায়।

শারদাপ্রসাদ বসু হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ শ্যামপুকুরস্থ নিজ ভবনে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই বিদ্যালয়টির সংস্কার হয়। এই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা তালতলানিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলেকজাণ্ডার ডফ, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, আশুতোষ দেব, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাকে অর্থসাহায্য করিতেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরপুলিতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। মাধবচন্দ্র মল্লিক ব্যতীত ভুবনমোহন মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন ও রাধানাথ পাল ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। মহারাজা কালীকৃষ্ণ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, উইলিয়ম অ্যাডাম প্রভৃতি ইহাকে আর্থিক সাহায্য দিতেন।

হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে আরও দুইটি স্কুলের একটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্তৃক স্থাপিত হয়। অপরটি গোবিন্দচন্দ্র বসাকের চেষ্টায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মলাভ করে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেহারীলাল সেট হিন্দু লিবার‍্যাল একাডেমি নামে এক অবৈতনিক ইংরেজী স্কুল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ স্থাপন করেন।

ভোলানাথ বসু কর্তৃক ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোতে ওরিয়েণ্টাল ফ্রি স্কুল নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিন্দু চেরিটেবল ইনস্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। মহারাজা কালীকৃষ্ণ ইহার সভাপতি ছিলেন।

গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনরী ভবনে ডবলিউ. এস. পারকিন্‌স ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নেটিব ইনফ্যাণ্ট স্কুল নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন

করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল নামে একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই যুগের একটি প্রধান বিদ্যালয় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। ইহা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম হইতেই এই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পাঠশালা প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। ইহার অর্থ সামর্থ্য এমন ছিল না যাহাতে ইহা কলিকাতার অন্যান্য স্কুলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সেইজন্য ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত হয়। অক্ষয়কুমারের পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব না হওয়াতে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হন।

খ্রীষ্টান মিশনরীগণ তাহাদের স্থাপিত পাঠশালায় বিদ্যাদানের মধ্য দিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিত। হিন্দুগণ যাহাতে স্বধর্মে থাকিয়া ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে পারে তাহার নিমিত্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। এখানে পারমাথিক ও বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ দেওয়া হইত।

এই পাঠশালার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৭ জন। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ভাগ্যবিপর্যয় উপস্থিত হয়। কার ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের আথিক অনটনের জন্য এই পাঠশালা বন্ধ হইয়া যায় এবং ডফ ফ্রি চার্চ মিশনের পক্ষে ঐ একই স্থানে একটি মিশনরী স্কুল স্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন,

"The Chundrika informs us that the School of the Tattwabodhini Sabha, that is of the Vedanta Association, having been closed at Bansberiya, the Free Church Mission is about immediately to open a seminary there for instruction in English and Bengalee. We believe it has already commenced."[১]

১। The Friend of India : 6 April, 1848.

বিদ্যাদান-ছলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টাকে রোধ করিবার চেষ্টা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের মূলে ছিল। এই চেষ্টার আর একটি প্রকাশ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়স্থাপনে। এই চেষ্টারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে হিন্দু বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা হয়। এই বিদ্যালয় স্থাপনের যে কমিটি হয় রাধাকান্ত দেব তাহার সভাপতি হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (Hindu Charitable Institution) স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে আর্থিক দুর্গতির জন্য বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে হীরা বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে ভর্তি করা হইলে হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। এ আন্দোলন সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশেষে স্থির হয় যে, হিন্দু কলেজের স্কুলবিভাগে শুধু হিন্দু সন্তানই ভর্তি হইবে, কিন্তু কলেজ বিভাগ সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য খোলা থাকিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারী কর্ম হইতে পদত্যাগ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজ নামে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন গণ্যমান্য লোক দ্বারা শঙ্কর ঘোষ লেনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহারা বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যয়কে স্কুলটি পরিচালনা করিবার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করিতে সম্মত হইলে তাঁহাদের লইয়া যে একটি কমিটি গঠিত হয় তাহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত ঐ স্কুলটির পরিচালনা করে। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়টির পরিচালনার সমস্ত ভার বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের উপর পড়ে। প্রতিষ্ঠাতারা অবসর গ্রহণ করিলে যে নূতন কমিটি গঠিত হইল বিদ্যাসাগর তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

হিন্দু বালকগণকে ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই বিদ্যালয়ের নূতন নাম হইল হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও হরচন্দ্র ঘোষের

মৃত্যুতে এবং অপর তিনজন সদস্যের পদত্যাগের ফলে স্কুলটির পরিচালনের সমস্ত ভার বিদ্যাসাগরের উপর আসে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়।

এই সময় যে সকল মিশনরী শিক্ষাবিস্তারের কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ ডফ অন্যতম। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভা ভবনের একটি ঘর ভাড়া লইয়া ডাঃ ডফ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই একটি স্কুল খোলেন। এই স্কুলটি শীঘ্রই জেনারেল এসেমব্লিস ইনস্টিটিউশন নামে খ্যাত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব পার্শ্বে বর্তমান বাটীতে উঠিয়া আসে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে এসটাবলিশড চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে বিভেদ ঘটিলে ও ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের সৃষ্টি হইলে ডফ ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী) এই কলেজটি ডফ কলেজ নামে আখ্যাত হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ডাঃ কেরীকে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫০৲ টাকা পেন্সন দেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে কেরীর দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার দানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ মার্শম্যানের মৃত্যুর পর মিঃ জন ম্যাক ও মিঃ জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যানের উপর শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর কলেজের গুরুদায়িত্ব পতিত হয়। তাঁহাদের চেষ্টায় কলেজের প্রভূত উন্নতি ঘটে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে শ্রীরামপুর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হয়।

কলিকাতায় রোমান ক্যাথলিক জেস্থইট সম্প্রদায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল স্থাপন করে।

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী জেমস্ লঙের অধ্যক্ষতায় চার্চ মিশনরী সোসাইটি কর্তৃক সেণ্ট পল্‌স স্কুল স্থাপিত হইয়া এদেশে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়।

উপরিউক্ত স্কুল কলেজ ছাড়াও কলিকাতা ও মফঃস্বলে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের শিক্ষাবিস্তার করিয়াছিল।

এইবার স্ত্রীশিক্ষান্দোলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়ার চর্চার সুযোগ করিয়া দেন। সর্বাগ্রে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়। বেথুন প্রত্যহ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জাস্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুও বেথুনের এই বিদ্যালয়-স্থাপনে সহায়তা করেন। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বেথুন নিজের তহবিল হইতে প্রতি মাসে প্রায় আট শত মুদ্রা ব্যয় করিতেন।

এই সময় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের ভূমিখণ্ড দান করেন। এই ভূমির উপর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটি গবর্ণর সার্ জন লিটলার কর্তৃক বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন মৃত্যুকালে বিদ্যালয়ের জন্য ত্রিশ সহস্র মুদ্রা ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া যান এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বেথুন তাঁহার চরমপত্রে গবর্ণমেণ্টকে লেখেন,

"I give and devise all my interest in the lands, buildings and other property in Calcutta, now intended to be used and occupied as a Female School, to the East India Company and their successors and assigns for ever with my request that they will endow the said institution as a Female School in perpetuity, and honorably connect therewith the name of Babu Dukhina Ranjan Mukherjee in honorable testimony of his great exertions in the cause".[১]

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজগৃহে একটি

১। মন্মথনাথ ঘোষ : রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় : কলিকাতা ১৯১৭ : পৃ ১০৪-৫

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ২৯শে মে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের 'সম্বাদভাস্করে' ইহার উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নিজ নিজ ভবনের বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। ২৯শে এপ্রিল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' 'জ্ঞানান্বেষণে'র উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায় যে, মতিলাল শীল ও হরধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্মসভার ভয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেন।

স্ত্রীশিক্ষান্দোলনে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেথুন বিদ্যাসাগরকে অবৈতনিক সম্পাদক হইতে অনুরোধ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসের পর হইতে এই বিদ্যালয় সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সিসিল বীডন এই কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালিডে শিক্ষাবিস্তারের কার্যে অগ্রসর হন। তিনি বিদ্যাসাগরকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন। শীঘ্রই বিদ্যাসাগর তাঁহার এলাকাভুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ফেলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের নিকট প্রেরণ করিয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০।[১]

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গঃ কলিকাতা ১৯৩১ঃ পৃঃ ৫১

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মের পত্রে ভারত সরকার বলিলেন যে উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই উচিত।

বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শ্রম বিফল হইয়াছে। স্কুলগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠাবধি শিক্ষকেরা বেতন পান নাই। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত শিক্ষকদের মোট বেতন দাঁড়াইয়াছিল ৩,৪৩৯৶৫।

শেষ পর্যন্ত অনেক পত্র আদান-প্রদানের পর ভারত সরকার বিদ্যাসাগরকে এই টাকার দায় হইতে মুক্তি দেন, কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহার্থে কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ডিরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সহিত মতানৈক্যের ফলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী সাহায্যের আশা না থাকিলেও বালিকা বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎসম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিরাশ হইলেন না। বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করিবার জন্য তিনি এক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে দেশবাসীর আগ্রহের কথা সার্ বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত বিদ্যাসাগরের পত্র হইতে জানিতে পারা যায়:

"শুনিয়া সুখী হইবেন, মফঃস্বলের যে-সকল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা-সমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুলও খোলা হইতেছে।"[১]

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ : পৃ ৫৮

সমাজ

(১৮০১—১৮৬০)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে সমাজে নানা দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কুসংস্কারের প্রাধান্য হওয়াতে অনেক কুপ্রথা প্রশ্রয় পাইতেছিল। মুসলমান রাজশক্তির পতন হওয়ায় এবং নূতন রাজশক্তি তখনও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারায় সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে বিশৃঙ্খল ছিল।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এই সময় এদেশে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে বিশেষ আগ্রহী হইয়াছিল। তাহারা সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণে সচেষ্ট ছিল। এই দিক দিয়া পাদ্রীরা দেশের একটি বিশেষ উপকার সাধন করে। তাহারাই প্রথমে গভর্ণমেণ্টকে কুপ্রথা দূর করিবার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গঙ্গাসাগরে সন্তান-উৎসর্গ রহিতকরণ। মিঃ জর্জ উডনি যাঁহার গৃহে মিঃ কেরী মদনবাটীতে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন প্রতিবৎসর গঙ্গাসাগরে যে সন্তান উৎসর্গ হইত তাহার প্রতি লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ওয়েলেসলি কেরীকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করিতে বলেন। কেরী তাঁহার রিপোর্টে এই নৃশংস প্রথা অবরোধ করিতে বলিলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দেশীয় প্রথায় হস্তক্ষেপের ঘটনা এই প্রথম।

"This was the first instance of any interference by the British Government with religious observances of the natives, and the first vindication of the principles of humanity in opposition to the superstitious feelings of the people". ১

এই যুগে সামাজিক আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা সতীদাহপ্রথা নিবারণ। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন রামমোহন রায়।

১। John Clark Marshman: The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward, Vol. I: London 1859: pages 158-9.

রামমোহনের পূর্বে গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে মাঝে মাঝে এই প্রথা নিবারণের চেষ্টা দেখা যায়। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালের শেষভাগেও সতীদাহপ্রথা নিবারণের চেষ্টা হয়। কিন্তু রামমোহনই প্রথম এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

সতী, সতীদাহ, সহমরণ এই তিনটি শব্দই একার্থবাচক। এই সম্পর্কিত ধর্মপুস্তকাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রথা হিন্দুর ধর্মসাধক অবশ্য করণীয় কর্মের মধ্যে কখনও গণ্য হয় নাই, ইহা দেশপ্রচলিত একটি প্রথা বা রীতি বিশেষ। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণে ইহা এক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হিন্দুসমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই ব্যাধি দীর্ঘ দেশ ও কাল ব্যাপী হইলেও ইহা কখনও সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে আদৃত হয় নাই। সর্বজনমান্য মনু ও মনুকল্প স্মৃতিকারগণের কেহই ইহাকে বিধবার একমাত্র অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিধি দেন নাই। স্মার্তরাজ রঘুনন্দন ইহার উচ্চমহিমা কীর্তন করাতে ইহা বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। স্মার্ত-শিরোমণি রঘুনন্দনের এই মহিমাকীর্তনের মূলে একটি বিশিষ্ট কারণ আবিষ্কার করা কঠিন নহে। স্মার্তচূড়ামণি যখন নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশে মুসলমানরাজ্য নানা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। শাসনব্যবস্থার শিথিলতার সুযোগে নৈতিক ধর্মভ্রষ্ট আচারহীন ব্যক্তিগণ যথেচ্ছাচার করিত এবং কুমারী ও বিশেষ করিয়া বিধবাদের মানসম্ভ্রম পবিত্রতা অব্যাহত রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ব্যতীত বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথার ব্যাপক প্রচলনে হিন্দুপরিবারের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। একজন পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ করিত, কিন্তু সকল স্ত্রীর প্রতি সমানভাবে কর্তব্যপালন করা অসম্ভব বলিয়া স্বামিসোহাগে বঞ্চিতা নারীর পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষাবশে পতির প্রাণনাশের কারণ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পতির মৃত্যুতে সতী হইবার ভয়ে কেহ পতিহন্ত্রী হইতে সাহস পাইত না। এই সকল নানা কারণে বঙ্গদেশে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল।

মুসলমান-আমলে সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে নানা রাজবিধি প্রচারিত হইয়াছিল দেখা যায়, কিন্তু সে সকল যে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল এমন মনে হয় না। সম্রাট আকবর এই প্রথার একান্ত বিরোধী ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে

ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে সহমরণের বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রবল জনমত এই প্রথার সপক্ষে থাকিবার জন্য ইহার প্রসার রুদ্ধ হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, নবদ্বীপগৌরব রঘুনন্দনের নবস্মৃতিতে সতীদাহের গুণ বিশেষভাবে কীর্তিত হইবার জন্য ধর্মভীরু শাস্ত্রশাসিত বঙ্গদেশে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে বঙ্গদেশে ধর্ম ও সমাজজীবনে নবজাগরণের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইলেও এই মর্মন্তুদ নৃশংস ভয়াবহ প্রথার তীব্রতা কিয়ৎ পরিমাণেও হ্রাস পায় নাই বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতেই ইংরেজগণের এই নিদারুণ সামাজিক প্রথার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল দেখা যায়। মিশনরীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লী এই প্রথাকে সাধারণ নরহত্যা পর্যায়ভুক্ত করিয়া সরাসরি বন্ধ করিয়া দিতে অভিলাষী হন এবং এতদ্বিষয়ে তদানীন্তন সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ নিজামত আদালতের জজ-মহোদয়গণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার নির্দেশানুসারে ডাওডেস্‌ওয়েল সাহেব নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রার গুড সাহেবকে এই মর্মে এক পত্র লেখেন। ডাওডেস্‌ওয়েল সাহেব এই সময় বিচার-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। নিজামত আদালত তাহার বেতনভোগী পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মাকে তাঁহার মতামত দিতে অনুরোধ করিলে তিনি যে উত্তর দেন তাহার একস্থলে লেখেন যে, কোন স্ত্রীলোকের শিশুপুত্র বা কন্যা থাকিলে সে ঐ শিশুর প্রতিপালনের জন্য যদি কোন স্ত্রীলোককে আপনার প্রতিনিধি-স্বরূপ রাখিয়া যাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার সতী হইতে কোন বাধা নাই। কোন উৎকট ঔষধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া কোন নারীকে সহমৃতা হইতে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। যাহাই হউক সেই সময়ে সতীদাহ প্রথা একেবারে বন্ধ করার ব্যাপারে নিজামত আদালত গভর্ণরকে পরামর্শ দিতে পারেন নাই। নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ এই মর্মে অভিমত দেন যে, যদি গভর্ণমেণ্ট এই প্রথা সরাসরি বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে ইংরেজদের নানা প্রকার রাজনৈতিক অসুবিধা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতে হইবে। নিজামত আদালতের পরামর্শানুসারে লর্ড মিণ্টো ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক সার্কুলার বিধিবদ্ধ করেন। এই সার্কুলার অনুযায়ী

বলপ্রয়োগ দ্বারা ও মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া বিধবাকে সহমরণে যাইতে উত্তেজিত বা বাধ্য করা নিষিদ্ধ হয়। গর্ভবতী নারী ও অভিভাবকহীন শিশুসন্তানের জননীকেও সহমৃতা হইতে না দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সার্কুলার বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

মার্কুইস্ অব্ হেস্টিংসের শাসনকালে সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত হয়। লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংসের শাসনকাল ছিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি পতির মৃতদেহের সহিত স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করিবার বিপক্ষে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাতে যুগী জাতীয় বিধবাদের মধ্যে প্রচলিত জীবিত অবস্থায় সমাহিত করিবার প্রথাকে হিন্দুধর্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে, সুতরাং বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এবং উক্তরূপ সহমরণকে সাধারণ নরহত্যা পর্যায়ভুক্ত করিয়া তদনুযায়ী শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদ্দমনে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। এই রেগুলেশন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রণীত হয়।[১]

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দুসম্প্রদায় সতীদাহনিবারণকল্পে লর্ড হেস্টিংসের বরাবর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করে। কিন্তু মুষ্টিমেয় হিন্দু-সন্তানের এই আবেদনে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। সতীদাহনিবারণে হেস্টিংসের আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও ধর্মে হস্তক্ষেপের ধারণায় দেশের লোকের অসন্তোষ বিধান এবং সিপাহীবিদ্রোহের আশঙ্কায় তিনি এই প্রথাকে সমূলে বিনাশ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিলাতের জনসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি না পাইলে এই দৃঢ়মূল প্রথাকে উৎপাটিত করিবার মত সাহস ও দৃঢ়তা কোন ভারতীয় গভর্ণরের পক্ষে লাভ করা কঠিন। সেইজন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বড় বড় শহরে বহু সভাসমিতি স্থাপন করিয়া ইংরেজ জাতির সকরুণ মনোযোগ এই বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বেডফোর্ড নগরে সর্বপ্রথম এ বিষয়ে এক মন্ত্রণাসভার অধিবেশন বসে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরার নিকট ক্রেল নামক স্থানে এক সভা হয় এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সভার উদ্যোগে বহু স্থানে বহু সভাসমিতির

১। কুমুদনাথ মল্লিক : সতীদাহ : কলিকাতা ১৯১৪ : পৃ ৩৬-এ রেগুলেশনটি উদ্‌ধৃত হইয়াছে।

অধিবেশন চলে। এই সকল সভা একবাক্যে মহাসভাকে (পার্লামেণ্ট) সতীদাহ প্রথা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ জানায়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লর্ড আমহার্স্টের শাসনকাল। এই সময় হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সতীদাহ বিষয়ে রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড আমহার্স্টের পূর্বে এ বিষয়ে যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাদের এই আইনের অন্তর্গত করা হয়। বারাণসীর প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট হ্যামিণ্টন সাহেব উক্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত করিয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট আইনটি ঘোষণা করিয়া দেন। লর্ড আমহার্স্ট ভারতের তদানীন্তন অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরস্-এর এই মর্মে পত্র লেখেন যে, সতীদাহ প্রচলিত থাকিবার জন্য দেশের মধ্যে যে অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতেছে তাহা নিবারণ করিতে তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলের যদি আশঙ্কা না থাকিত তবে তিনি একদিনের জন্যও এই কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতেন না।

লর্ড আমহার্স্টের পর লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি সরকারী কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র সিপাহীবিদ্রোহের আশঙ্কায় পূর্ববর্তী গভর্ণরগণ এই প্রথা একবারে বন্ধ করিয়া দিতে সাহসী হন নাই। তিনি বিভিন্ন প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান সৈনিক কর্মচারীর মতামত সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারেন যে, এই ব্যাপারে পূর্বসূরীদিগের আশঙ্কা এবং তজ্জনিত আপত্তি ভিত্তিশূন্য। তদুপরি এই সময় নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ এই প্রথা রহিত করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান। উক্ত আদালতের পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে যে একজন বিচারপতি সতীদাহের পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন না, তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি অপর চারিজনের সহিত একমত হওয়াতে বেণ্টিঙ্কের বিশেষ সুবিধা হইল। দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের এই সহযোগিতা সতীদাহনিবারণ আন্দোলনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিল। জে. পেগ্‌সের 'The Suttee's Cry to Britain' (১৮২৮) পুস্তকখানিও দেশের জনমতগঠনে বিশেষ কার্যকরী হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সতীদাহনিবারণকল্পে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেন রামমোহন

রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের পত্নী অলকমণি বা অলকমঞ্জরী ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল সহমৃতা হন। রামমোহন তখন রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই ঘটনায় সতীদাহ-নিবারণ বিষয়ে রামমোহন বিশেষ উৎসাহী ও আগ্রহশীল হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

রামমোহন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' লেখেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের সাপ্তাহিক 'সমাচার-দর্পণে' এই পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা হয়। ধর্মের আলোচনায় একথা বলা হইয়াছে।

কিন্তু রামমোহনের পূর্বেই সহমরণ যে শাস্ত্রসম্মত নহে এই মত এদেশের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে ব্যক্ত করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা সহমরণপ্রথা সমর্থন করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র ও রামগোপাল মল্লিক বেণ্টিঙ্কের নিকট গভর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হইয়া সতীদাহ প্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত দেন।

'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্র হইতে নীত 'সমাচার দর্পণে'র ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অগস্টের সংখ্যায় লিখিত আছে,

"২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট নামক সমাচার পত্রেতে এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নবুমেণ্ট এই ক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন।...

এই বিষয় শ্রীযুতের যদি অধর্ম কিম্বা অশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে তবে এ

অধীনদিগের প্রতি অনুমতি করিলে শাস্ত্রোক্ত যে সকল প্রমাণ ও প্রয়োগ আছে তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে।”[১]

‘এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি’ যে রামমোহন রায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৩রা ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় লিখিত আছে,

“অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নাম মাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কি প্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেননা তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্মকর্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না।”[২]

রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রচেষ্টা সফল হইল না। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

সতীদাহ নিবারণ আইন জারি হইলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী রক্ষণশীল হিন্দুরা স্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপন করে। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহনিবারণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা।

ভবানীচরণ সর্বতোভাবে সহমরণনিবারণ আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ‘সম্বাদ কৌমুদী’ এই আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করিলে তিনি ঐ কাগজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ প্রকাশ করেন।

‘সম্বাদ তিমিরনাশক’ হইতে ২১শে জানুয়ারী ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ‘সমাচার দর্পণে’ উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়,

“দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড, তৃতীয় সং: কলিকাতা ১৯৪৯ : পৃ ২৮৮-৯

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড তৃতীয় সং : পৃ ২৯০

ধর্মহানি এবং হিন্দু সমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্গুনে চন্দ্রিকানামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকার ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।"[১]

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ধর্মসভা সতীদাহনিবারণ আইন রোধ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ রক্ষণশীল দলেরই একটি শক্তিশালী অংশ এই ঘৃণ্য নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী রামমোহন টাউন হলে এক সভা করিয়া বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে ধর্মসভার একটি কল্যাণকর ভূমিকা ছিল। এই ধর্মসভা ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাকে বহু ক্ষেত্রে প্রশমিত করিয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রভাবেই ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। প্রধানত ধর্মসভার গোঁড়া ও ক্ষমতাশালী হিন্দুরা তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ প্রচার করিলে ২৫শে এপ্রিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকেই কলেরায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর বিশেষ করিয়া কাপ্তেন রিচার্ডসনের নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়।

রিচার্ডসনের শিক্ষার মধ্যে একটা প্রবল স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত করিবার শক্তি ছিল। তাঁহার শিষ্যগণ এই স্বাধীনতাকে বহুক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত করিয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা রাধানাথ শিকদার মনে করিতেন যে, গো-মাংস ভক্ষণ না করিলে জাতির উন্নতি নাই। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

"Radhanath Sikdar had an ardent desire to benefit his country. His hobby was beef, as he maintained that beef-eaters were never bullied, and that the right way to

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)ঃ কলিকাতা ১৯৪৮ঃ পৃ ১৮

improve the Bengalees was to think first of the physique or perhaps physique and moral simultaneously."[১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিক গো-মাংস আহারের ফলে চর্মরোগের জন্য তাঁহার মৃত্যু হয়।[২]

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজী ভাবাপন্ন হওয়াতে ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকট হইয়া উঠে। অনেকে সংশয়বাদী হইয়া পড়েন, আবার অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া নাস্তিক মতাক্রান্ত হন। রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মে আশ্রয় নেন। অপরদিকে ডফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ মিশনরীদের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃবৃন্দ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের অবশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ধর্মান্তরিত না হইলেও প্রচলিত হিন্দুধর্মের রীতিনীতির উপর আস্থা হারাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাকে রোধ করিবার জন্য রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিরা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও তাহার রীতিনীতি সংরক্ষণে যত্নবান হন। এই সময় হিন্দু সমাজের অপর এক অংশ, যাহা ইয়ং বেঙ্গলের শ্রেণীভুক্ত নহে, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির কোন কোন অংশের পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল। এই প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের অংশটি সকল আন্দোলনেই ইয়ং বেঙ্গলের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের মধ্যেও কেহ কেহ প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন কোন ব্যাপারকে সমর্থন করে।

ইয়ং বেঙ্গলের মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া ছাড়া আর একটি ঘটনা হিন্দু সমাজে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ইহা 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম' নামে পরিচিত।

হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত বিবি আনার নামক একজন পরমা সুন্দরী মুসলমানীকে উপপত্নী রাখিয়া তাহার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। ইহার ফলে

১। Peary Chand Mittra : David Hare : page 36.

২। Thomas Edwards : Henry Derozio : Calcutta 1884 : p. 132.

তিনি জাত্যন্তরিত হইলে তাঁহার পক্ষের লোকেরা তাঁহাকে সমন্বয় করিয়া জাতিতে তুলে। ইহার জন্য হিন্দু সমাজ ভয়ানক আন্দোলিত হয়। একপক্ষে শোভাবাজারস্থ রাজগণ, অপরপক্ষে রামদুলাল সরকার প্রভৃতি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা ছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে রামদুলাল বলিয়াছিলেন যে, জাতি তাঁহার বাক্‌সের ভিতর। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন,

"এই হেঙ্গাম সময়ে একটি গীত রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে আছে,—"গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী"। সেই প্রথম এই রব উত্থিত হয়, এখনও সেই রব শ্রুত হওয়া যাইতেছে।……

কালী প্রসাদী হেঙ্গাম এবং হিন্দু কালেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া ঐ বিষয়ে বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন অনেক পরিমাণে প্রবর্তিত করিয়াছে।"[১]

মদ্যপান গোমাংসাহার প্রভৃতি অনাচারের সহিত বেশ্যাসক্তি, লাম্পট্য ইত্যাদি ব্যভিচারের স্রোত এই সময় প্রবল হয়। তথাকথিত বাবুশ্রেণীর মধ্যে এই ব্যভিচার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। সমাজের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও এই নৈতিক অধঃপতন কলঙ্কিত করিয়াছিল।

এই কারণেই রিচার্ডসন হিন্দু কলেজ হইতে অপসারিত হন।

এই সকল নৈতিক অধঃপতনকে রোধ করিবার জন্য যাঁহারা লেখনী ধারণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার স্থষ্টিকর্তা। তিনি সতীদাহনিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি আন্দোলনের বিরোধিতা করিলেও ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা বা বাবুদের নৈতিক অধঃপতনকে তিনি একেবারেই সমর্থন করেন নাই।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার কলিকাতায় সুরাপান নিবারণের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন। প্যারীচরণের এই আন্দোলনে বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতি যোগদান করেন। ইহার তিন চার বৎসর

১। রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) : কলিকাতা ১৯৫১ : পৃ ৩৪-৫

পূর্বে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। ইহারও বহু পূর্ব হইতে সুরাপান নিবারণের সপক্ষে একটি জনমত গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেকে প্রথম জীবনে সুরাপান করিলেও পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে পরিমিত সুরাপান করিতেন। কার ঠাকুর কোম্পানীর পতনের পর তিনি সুরাপানে বিরত হন। কেবল পীড়ার সময়ে ডাক্তারের আদেশে পরিমিত সুরা পান করিতেন। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন,

"দেবেন্দ্রবাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরাপান করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন। কেবল পীড়ার সময় ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহার করেন নাই (১৮৯০)।"[১]

ব্যক্তিগত ভাবে অক্ষয়কুমার অতি অল্পদিন ব্যতীত বরাবর মৎসাদি ভক্ষণ ও ঔষধার্থে নির্ধারিত পরিমাণে সুরাপান করিলেও তিনি নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ও মদ্যপানের বিপক্ষে ছিলেন।

রাধাকান্ত দেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতিও মদ্যপানের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। রাধাকান্ত সুরাপাননিবারণ আন্দোলনের বিষয়ে পাদ্রী ডাল সাহেবকে সাহায্য করেন।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন বিধবাবিবাহ প্রচলন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বঙ্গদেশ ও তাহার বাহিরে দুই একস্থানে বিধবা বিবাহ দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিদ্যাসাগরই প্রথম এই প্রচেষ্টার সফলতা লাভ করেন। বিদ্যাসাগর তাঁহার এই প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ, ইয়ং বেঙ্গল ও প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের সমর্থন পাইয়াছিলেন। এমন কি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এক অংশও তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিল। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। এই স্থলে ইহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকার প্রতিবাদসমূহ প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাসাগর কর্তৃক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না' নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারিত হয়।

১। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত : পৃ ৫৭

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় বিহারীলাল সরকার তাহার একটি স্থন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

"বিচার ফলে যাহা হউক, বিধবা-বিবাহের প্রচলন-প্রসঙ্গে একটা তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ সমগ্র বঙ্গভূমি বিচলিত হইয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, স্ত্রী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই মুখে দিবারাত্র এতৎ সম্বন্ধে অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে প্রকৃতই একটা বিস্ময়-বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষে-বিপক্ষে কত রকম ছড়া, গান রচিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পথে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্রই নানারূপ গান গীত হইত। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে, কৃষক লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে, তাঁতি তাঁত বুনিতে বুনিতে গান গাহিত। শান্তিপুরে বিদ্যাসাগর পেড়ে নামক একপ্রকার কাপড় উঠিয়াছিল। তাহার পাড়ে এই গান লেখা ছিল,—

'স্থখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে!
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভ দিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম;
মনের স্থখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥' "[১]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই।

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
... ...
'পরাশর' প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ॥

১। বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর: কলিকাতা ১৮৯৫: পৃ ৩২২-৩

... ...

সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে।
ছুড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা ॥
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে।
কে পড়িবে "সৎবাপ", মায়ের কল্যাণে ॥"[১]

কিন্তু দাশরথি রায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা, কেননা বিধবা-বিবাহ ঈশ্বরের কার্য।

"তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে ॥"[২]

বিধবা-বিবাহের কথায় শান্তিপুরের এক রমণীর উক্তিতে দাশরথি ঈশ্বর গুপ্তকে কটাক্ষ করিয়াছেন।

"ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে, নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,—
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি ॥"[৩]

'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশ করিবার পর এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিজের ও অপরাপর এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। এই আবেদনপত্রের সহিত বিধবা-বিবাহ আইনের একটি খসড়াও পাঠান হয়। ধর্মের আলোচনায় এ বিষয়ে বলা হইয়াছে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইয়ং বেঙ্গলের দল, তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত সমাজের অধিকাংশ এবং জমিদার শ্রেণীর অনেকেই বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিয়াছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়।

এই সময় 'সমাচার-চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রধান

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) বসুমতী সং : পৃ ১১৬-৭
২। ৺দাশরথি রায় : পাঁচালী। দ্বিতীয় খণ্ড : কলিকাতা ১৯০১ : পৃ ১৯৫৬
৩। ঐ : পৃ ১৯৫৯

সংবাদপত্র ছিল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভাস্করের সম্পাদক ছিলেন। চন্দ্রিকা ও প্রভাকর বিধবাবিবাহের বিপক্ষে থাকিলেও ভাস্করে বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থিত হয়।

বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হইবার পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটস্থ ভবনে প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবা বিবাহ করেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। বিধবা বিবাহের বিপক্ষ দল রটনা করে যে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়াতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা ও কলিকাতার ধর্মসভা বিদ্যাসাগরের মতকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রবলভাবে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে যখন বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া বহু লোকের স্বাক্ষর যুক্ত একটি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'সংবাদ প্রভাকরে' ঘোষণা করেন যে, যাঁহারা বিধবাবিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাদের প্রত্যেককে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্গেশ্বর সিসিল বীডন প্রথমে উৎসাহী হইলেও শেষ পর্যন্ত কিছু করেন নাই। ধর্মের আলোচনায় এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে বঙ্গের সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী একটি সমিতি স্থাপনের সম্ভাব্যতা আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হয়। ইহার ফলে সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি নামক একটি সভা জন্মলাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সভাপতি হন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই সভা বহুবিবাহ নিবারণের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্বপ্রথম আবেদন প্রেরণ করে।[১]

১। মন্মথনাথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র : কলিকাতা ১৯২৭ : পৃ ১০৭

এই সভা বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করে। এই সভার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। এই সভা বিধবাবিবাহ বিষয়ের অধিকাংশ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইলেও বিধবাবিবাহ রেজিস্টারী করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয় নাই।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহেরও বিপক্ষে ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হয়। সহবাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইবার প্রাক্কালে সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর যে মতামত জ্ঞাপন করেন তাহা তাঁহার সমাজকল্যাণদৃষ্টির পরিচায়ক। প্রথম ঋতু হইবার পূর্বে স্ত্রীর সহিত সহবাস আইনত অবৈধ করিতে তিনি নির্দেশ দেন।

বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করিয়া এ যুগের শেষের দিকে অনেকগুলি নাটক প্রহসনাদি রচিত হয়। ধর্মের আলোচনায় এই সকল পুস্তকের বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টা বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ এবং বিধবা বিবাহের সমর্থনে ক্ষান্ত হইল না। ইহা লম্পটের কদর্য চরিত্র, নেশাখোরের ঘৃণ্য ও কুৎসিত ব্যবহার এবং শহর ও গ্রামের দলাদলির শোচনীয় পরিণতি উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিল। এই দেশে দলাদলিপ্রথা প্রচলিত থাকাতে যে সকল মহৎ অনিষ্টপাত হইতেছে তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য কয়েকটি পুস্তক রচিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা অঞ্চলে ধনীগৃহের চিত্র লইয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে একটি আখ্যায়িকা রচনা করেন। সুশিক্ষার অভাবে ধনীর সন্তান কি করিয়া উৎসন্নে যায় তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নামে দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থে প্রগতির দোহাই দিয়া উচ্ছৃঙ্খল নব্যসমাজের আচারব্যবহার এবং দ্বিতীয় গ্রন্থে ধর্মের নামে প্রাচীন সমাজের লাম্পট্য চিত্রিত

হইয়াছে। এই অদ্বিতীয় প্রহসন দুইটিতে মধুসূদন একই সঙ্গে বিজাতীয় সভ্যতার বাঁদরামি এবং দেশীয় হিন্দুয়ানীর ভণ্ডামি ও দুর্নীতিকে ধিক্কারের সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

সমাজের জাতিভেদকে লইয়া এই যুগে নানা আলোচনা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদের পক্ষপাতী না হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে, খুব শীঘ্র জাতিভেদ দূর করা সম্ভব নয়, ইহা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে। তাই তিনি প্রথমে উপবীত ধারণের সমর্থন না করিলেও পরে উপনয়নের বিধান দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করিয়াছিলেন, কেননা ধর্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান ছাড়াও ইহা দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া লোকসমাজের উপকার সাধন করে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও মনে করিতেন যে, জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। অসময়ে জাতিভেদ প্রথা রহিত করিলে কি বিষময় ফল হইবে সে সম্বন্ধে ভূদেব লিখিয়াছেন,

"জাতিভেদ প্রথা অসময়ে উঠাইবার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অন্তঃশাসনশক্তি আরও ন্যূন হইয়া পড়িবে, এবং (৩) লোকের স্বভাব হইতে শান্তি-প্রবণতা তিরোহিত হইয়া রাজ্যের সুশাসন কঠিনতর হইয়া উঠিবে।"[১]

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্ত্রীশিক্ষাকে লইয়া এই সময় আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়া চর্চার সুযোগ করিয়া দেন। বেথুন এই কার্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জাস্টিস্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ একদল রক্ষণশীল হিন্দু স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন না করিলেও রাধাকান্ত দেব ইহার পোষকতা করেন। বেথুনের সহিত রাধাকান্তের এ বিষয়ে অনেক পত্রালাপ হয়। একবার বেথুন লিখিয়াছিলেন,

"I am anxious to give you the credit which justly

১। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ সামাজিক প্রবন্ধ ৬ষ্ঠ সং ঃ কলিকাতা ১৯৩৭ ঃ পৃ ২৭২

belongs to you of having been the first native of India, who in modern times has pointed out the folly and wickedness of allowing women to grow up in utter ignorance, and that this is neither enjoined nor countenanced by anything in the Hindu Sastras".[১]

এখানে রাধাকান্তের পোষকতায় প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

এ যুগের অন্যতম নীতিশিক্ষক অক্ষয়কুমার স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করিয়া সেই শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"অতএব, যদি এই মাতৃভাব প্রকাশ করাই তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ হইল, তবে তাহারা যেরূপ শিক্ষা পাইলে, ঐ সমস্ত গুরুতর কর্ম যথাবিধানে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ কি?"[২]

স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বলিয়া তিনি মনে করেন নাই।

অক্ষয়কুমার বিধবা বিবাহের সপক্ষে এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। ইহা ছাড়াও অক্ষয়কুমারের মতে ঈশ্বর উদ্বাহ বিষয়ে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এইগুলি পালন না করিলে মনুষ্যের উদ্বাহসংস্কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয় না। নিয়মগুলি এই:—

১। কন্যা ও পুত্রের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক।[৩]

২। শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে, এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্তী হইলে, পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য নয়।[৪]

১। A Rapid Sketch of the life of Raja Radhakanta Deva Bahadur with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning by the editors of the Raja's Sabdakalpadrum: Calcutta 1859: page 19.

২। অক্ষয়কুমার দত্ত: ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ সং: কলিকাতা ১৮৯৪: পৃ ৭৩-৪

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত: ধর্মনীতি ১ম ভাগ: পৃ ৫৩

৪। ঐ : পৃ ৫৫

৩। পিতৃকুল মাতৃকুল অথবা তত্তৎকুলের কোন শাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।[১]

৪। অসুস্থকায়, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ, ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য নহে।[২]

৫। স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্যের রীতি ও ধর্মবিষয়ক মত একপ্রকার হওয়া আবশ্যক।[৩]

৬। এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য, অধিবেদন অর্থাৎ বহুবিবাহ কোন রূপেই কর্তব্য নহে।[৪]

দম্পতির পারস্পরিক ব্যবহার প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রগতিশীল মনের উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে। তিনি লিখিয়াছেন,

"পত্নীকে আপনার ইন্দ্রিয় সেবার সাধন জ্ঞান করা মূঢ়তা ও অসভ্যতার লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষাদান দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত, ধর্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও কুসংস্কারসকল নিরাকৃত করিয়া তাহাকে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্ন ও অনুরাগ হয় ও করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বর্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামীর পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য।"[৫]

সামাজিক ব্যাপারে অক্ষয়কুমারের চিন্তাবলী সে যুগের এক স্মরণীয় সম্পদ।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশে এক নূতন শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল। সামন্ত যুগের কৌলীন্য ও রক্তসম্পর্কের আভিজাত্য মুদ্রার নিকট পরাজিত হইল। ইংরেজ আমলে উৎপাদনের নানা যন্ত্রপাতি আমদানী হওয়ায় স্থিতিশীল গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং যন্ত্রযুগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনে নূতন জমিদার সৃষ্টি হইল। নূতন শ্রেণীবিন্যাসে দেখা দিল ধনিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী। উপসংহারে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হইবে।

১। অক্ষয়কুমার দত্ত: ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ পৃ ৬৩
২। ঐ : পৃ ৬৫
৩। ঐ : পৃ ৬৮
৪। ঐ : পৃ ৬৯
৫। ঐ : পৃ ৭৭

রাজনীতি
(১৮০১—১৮৬০)

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে রামমোহনই পথিকৃৎ। এবিষয়ে আলোচনার পূর্বে অতীত ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হইবে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লইলেন। সর্ত হইল যে, কোম্পানী ঐ তিন দেশের খাজনা আদায় করিবে ও বাদশাহকে প্রতি বৎসর ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দিবে।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে প্রস্থান করিলে ক্রমান্বয়ে ভেরলস্ট ও জন কার্টিয়ার বাংলার শাসনকর্তা হন। তাঁহাদের উভয়ের শাসনকাল ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর। কার্টিয়ারের শাসনকালে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে। এই মন্বন্তরের সময় বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে বিক্ষোভ দৃষ্ট হয়।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করেন। এই আইনে বাঙ্গালার গভর্ণর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় ভারতীয় অধিকারের গভর্ণর জেনারেল হন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম পিটের উদ্যোগে ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বা ভারত আইন পাশ হয়। ভারতের শাসন ভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের উপর পড়ে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচবিধান করেন। নিয়ম হয় যে, গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হইয়া কোন সংবাদ এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংবাদপত্রে ছাপা হইবে না।

হেস্টিংস ১৮১৭ সালের ১৯শে অগস্ট এই আইন তুলিয়া দেন। তিনি ইহার

পরিবর্তে এমন কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যেগুলি অমান্য করিলে সম্পাদককে জবাবদিহি করিতে হইত। অস্থায়ী বড়লাট জন অ্যাডাম সুপ্রিম কোর্টের সম্মতি লইয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল এক কড়া প্রেস আইন জারি করেন। নিয়ম হইল যে, কাগজ বাহির করিবার পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া সেই হলফনামা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইলে লাইসেন্স মিলিবে। কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ তাহার মুদ্রিত বিবরণ সম্পাদকের নিকট রাখা হইত।

গভর্ণমেণ্ট যখন নানা দিক হইতে এ দেশের অধীনতা পাশ দৃঢ় করিতেছিলেন তখন রামমোহনই প্রথম রাজনৈতিক চেতনার বাণী শুনাইলেন। রামমোহন একটি সুস্থ সবল স্বাধীন জাতি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে এই আকাঙ্ক্ষাই প্রেরণা জোগাইয়াছে। রামমোহন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন,

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and subdivisions among them, has entirely deprived them of political feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise. It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort".[১]

সুতরাং মুখ্যত রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই রামমোহন হিন্দুধর্মমত পরিবর্তনের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পূর্বে বলা

১। The English Works of Raja Rammohun Roy : Panini Office : Allahabad 1906 : pages 929-30.

হইয়াছে যে, তিনি কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' (১২ই এপ্রিল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন নিয়ম হয় যে সংবাদপত্রের প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, তখন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া তিনি মীরাৎ-উল্-আখ্বার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে। এই আইন রেজেস্ট্রীকৃত হইবার পূর্বেই রামমোহন কলিকাতাস্থ কয়েকজন বন্ধুর সহিত ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ ইহার প্রতিবাদ জানান। ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি একখানি আবেদনপত্র বোর্ড অব কণ্ট্রোলের মারফৎ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট প্রেরণ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন 'Memorial to the Supreme Court' (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ) লেখেন। তাঁহার 'Appeal to the King in Council'-কে (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ) মিস কলেট 'the Areopagitica of Indian History' বলিয়াছেন।[১]

শুধু এ ক্ষেত্রেই নহে, রামমোহনের স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষা আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের চিফ জাস্টিস সার্ চার্লস গ্রে তদানীন্তন উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া একটি মোকদ্দমা এই বলিয়া নিষ্পত্তি করেন যে, পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারিবে না। রামমোহন ইহার প্রতিবাদ করিয়া 'Essay on the rights of Hindoos over ancestral property, according to the Law of Bengal' (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। শুধু প্রবন্ধ রচনা করিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হইলেন না, চার্লস গ্রের নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য তিনি বিলাতে আপীল করিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। প্রিভি কাউন্সিল হইতে সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তি রহিত করিয়া দিল। লণ্ডন হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

রামমোহন অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। পূর্বে কালেক্টরেরা অসিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া কোন ভূমি

১। Sophia Dobson Collet: The Life and Letters of Raja Rammohun Roy: London 1900; page 67.

বাজেয়াপ্ত করিলে তাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করা যাইত। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে, কয়েকটি জেলা লইয়া এক একজন বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার নিকটে কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল করা যাইবে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ভূম্যধিকারীদিগকে লইয়া রামমোহন ইহার প্রতিবাদ জানান। গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট রামমোহন একটি আবেদনপত্রও প্রেরণ করেন। তাঁহার 'Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands' ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট এই আবেদন নামঞ্জুর করেন। কিন্তু কি স্বদেশে কি বিদেশে রামমোহন যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহন তাঁহার অন্যতম সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে এ বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট আপীল করেন। ইহাতে ব্রিটিশ জনসাধারণকে সচেতন করিবার জন্য 'Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants' (১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়া প্রচার করা হয়।

রামমোহন জুরিপ্রথা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। রামমোহন উপযুক্তভাবে হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রবর্তনেরও পক্ষপাতী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামমোহন তদানীন্তন দেশবাসীর অবস্থা আলোচনা করেন। তাঁহার 'Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue Systems of India, and of the general character and condition of its native inhabitants, as submitted in evidence to the authorities in England. With Notes and Illustrations. Also a brief Preliminary sketch of the ancient and modern boundaries, and of the history of that country' ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামমোহন উদার ও আন্তর্জাতিক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে একটি সভা হয়। ঐ

সভার উদ্দেশ্য ছিল চীন ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার এবং ইওরোপীয়ানদের ভারতবর্ষে বসবাসের বাধা সকল দূর করিবার জন্য পার্লামেণ্ট মহাসভায় আবেদন করা। ইওরোপীয়ানদের ভারতবর্ষবাসের বাধাসকল দূর করিবার নিমিত্ত সভায় যে প্রস্তাব হয় রামমোহন তাহা সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন। রামমোহন বলেন যে, সুশিক্ষিত, ভদ্র ও ধর্মানুরাগী ইওরোপীয়দের সংস্পর্শে সাহিত্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে স্বাধীন চিন্তা হইতে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম তাহা প্রধানত ইংরেজী শিক্ষা হইতে আসিয়াছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্রের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা পরিস্ফুট হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রধান। ডিরোজিওর শিক্ষায় ও প্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিও জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেন এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতায় স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল পরিচয় ছিল। কাশীপ্রসাদ 'বেঙ্গল এনুয়াল', 'লিটারারী গেজেট' ও 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিনে' লিখিতেন।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্বদেশপ্রিয়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই স্বদেশপ্রিয়তা হইতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করে।

ডিরোজিওর যে সকল গুণ তাঁহার শিষ্যদলের উপর বর্তাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ অন্যতম। ডিরোজিও একজন ফিরিঙ্গী হইয়াও ভারতবর্ষকে গভীর প্রেমের চক্ষে দেখিতেন ও ইহাকে স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা সম্পন্ন ছিলেন। 'The Fakeer of Jungheera' নামক একটি পুরাতন আখ্যানমূলক কাব্যের মুখবন্ধে তিনি যে কবিতাটি লেখেন তাহাতে

তাঁহার গভীর ভারতপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের তদানীন্তন দুর্দশা তাঁহাকে গভীরভাবে ব্যথিত করিয়াছিল।

"To India—My Native Land
My Country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now?
... ...
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish from thee!"[১]

এই স্বদেশানুরাগ তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বর্তাইয়াছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতির প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজের একটি সভায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (Society for Acquisition of General Knowledge) নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠা করা স্থিরীকৃত হয় এবং ঐ বৎসর ১৬ই মে ঐ সভা তাহার কার্য আরম্ভ করে। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ইহার স্থায়ী সভাপতি ও প্যারীচাঁদ ইহার সম্পাদক হন। 'Friend of India' পত্রিকার সম্পাদক Mr. Marshman হিন্দু কলেজের শিক্ষিত নব্যসংস্কারকগণকে উপহাস করিয়া 'Chuckerburty Faction' নাম প্রদান করেন।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা রাজনৈতিক সভা ছিল না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় যে সভা হয় তাহাতে একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার কথা সকলে অনুমোদন করেন। ঐ দিবসেই জ্ঞানোপার্জিকা সভার চিতাভস্মের উপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য ও বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনকে এদেশে আনেন। ইনি রামমোহন রায়ের বন্ধু অ্যাডাম-প্রতিষ্ঠিত বিলাতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। টমসন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির

১। F. B. Bradley-Brit: Poems of Henry Louis Vivian Derozio: Oxford University Press 1923: page 2.

সভাপতি ও প্যারীচাঁদ ইহার সম্পাদক হন। রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব ও কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সোসাইটি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন। রামগোপাল ঘোষ এই দলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুবক্তা সে যুগে দেখা যাইত না। এই সোসাইটির মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। রামগোপাল ঘোষ ইহার প্রবর্তক এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার সম্পাদক হন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। রাধাকান্ত দেব ইহার সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের যোগ্যতাবৃদ্ধি, গ্রেট ব্রিটেন ও ইণ্ডিয়ার সাধারণ স্বার্থসাধন এবং এই অধীনদেশের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশার দূরীকরণ এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই এসোসিয়েশনে একজনও ইওরোপীয়ান সদস্য ছিল না।[১]

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদকের পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ—সভার সদস্যদের মধ্যে একদল মনে করিতেন যে, দুই বৎসরের অধিককাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে একই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত না রাখিয়া অন্যদের এই ভারবহনের সুযোগ দেওয়া সমুচিত। দেবেন্দ্রনাথের সময় সহকারী সম্পাদক ছিলেন দিগম্বর মিত্র।

মাদ্রাজে এই সভার একটি শাখা সভা স্থাপিত হয়। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—এসোসিয়েশনের পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে আবেদনপত্র পেশ করা। এই আবেদনপত্র রচনায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল। এই আবেদন-পত্রে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের শাসননীতির আদর্শে ভারতবর্ষেও স্ব-শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইহার প্রথম ধাপস্বরূপ প্রস্তাবিত ব্যাবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যপদে ভারতীয় গ্রহণের আবেদন জানান হয়। অনেক পরিমাণে ১৮৫৩

১। Bimanbehari Majumdar: History of Political Thought from Rammohun to Dayananda, Vol. I: Calcutta 1934: page 177.

খ্রীষ্টাব্দের এই আবেদনপত্রের প্রভাবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণায় জানাইয়া দেন যে, ভারতবাসীদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং রাজ সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হইবে। ভারতের শাসন ক্ষমতা ভিক্টোরিয়ার হস্তে চলিয়া যায়। ভারতের প্রধান শাসনকর্তার উপাধি হয় ভাইসরয় ও গবর্ণর জেনারেল। বোর্ড অব্ কণ্টোলের স্থলে একজন ভারত সচিব (Secretary of State for India) ও তাঁহার একটি পরামর্শসভা (India Council) নিযুক্ত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে Indian Penal Code ও পর বৎসর ফৌজদারী কার্যবিধি আইন পাশ হয়। ইহার পূর্বেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী পার্লামেণ্টের নিকট হইতে যে সনন্দ লাভ করেন তাহাতেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল। এই সনন্দে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের ক্ষমতা হ্রাস ও বিলাতের মন্ত্রিসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চপদে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনভার একজন ছোটলাটের (Lieutenant Governor) উপর পড়ে। আইনপ্রণয়নের জন্য বারজন সভ্য লইয়া একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব মৃত্যুদিন পর্যন্ত (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সনন্দ লাভ করে। এই সনন্দের ফলে ভারতবর্ষে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয় এবং শিক্ষিত ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার পায়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেসরকারী লোক দ্বারা ভারতবর্ষে চা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে একটি কমিটি গঠন করেন তাহার একজন সদস্য ছিলেন রাধাকান্ত দেব।

গবর্ণমেণ্ট যখন লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির উপর কর বসাইতে মনস্থ করেন, তখন ইহার প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা হয়। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সনাতনী ও সংস্কারপন্থী সকল ভূম্যধিকারীই সমবেতভাবে জমিদার সভা (Zamindary Association) গঠন করে। রাধাকান্ত এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। Zamindary Association-এর পরে নাম হয় Landholders' Society। দশবিঘা পর্যন্ত ব্রহ্মত্র জমির

কর ছাড় দিবার নিয়ম ভূম্যধিকারী সভার (Landholders' Society) উদ্যোগেই সৃষ্টি হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সম্পাদক হন।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামমোহন রায়ের বন্ধু অ্যাডাম ইংলণ্ডে ভারতবাসীর কল্যাণার্থ ভারতসম্পর্কে ইংরেজ সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন।

রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় এবং ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা রামগোপাল ঘোষের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ কথার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বহুখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয়। অনেকে সিপাহীবিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন লইয়া সেইযুগের কাগজপত্র পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের প্রধান চিন্তা-কেন্দ্র কলিকাতায় সিপাহীবিদ্রোহ বিশেষ কোন তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী মুসলমানকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীসম্প্রদায়ের কাছে ইহা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের অকৃতজ্ঞ কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা-প্রিয় বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব, রামগোপাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণও সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে তেমন কোন কৌতূহল প্রদর্শন করেন নাই। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি নেতৃগণ খোলাখুলিভাবে সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে বিরূপমন্তব্যই করিয়াছেন। সিপাহীবিদ্রোহ এ দেশীয় মুসলমানসম্প্রদায়কে যে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহার মূলে ছিল ওহাবী আন্দোলনের সঞ্চিত বিক্ষোভ ও অরাজকতা। এ বিষয়ে উপসংহারে আলোচনা করা হইবে।

কিন্তু ১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীলবিদ্রোহ সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে দারুণভাবে নাড়া দিয়াছিল। যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষীদের মধ্যে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) এবং রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট নীলের কমিশন বসাইয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু লক্ষণীয় কোন ফল হইল না। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশে এই আন্দোলন বিশেষভাবে শক্তিশালী হয় একথা পরে আলোচনা করা হইতেছে। হরিশচন্দ্র

'হিন্দু পেট্রিয়টে' অকুণ্ঠভাবে চাষীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সকল প্রবন্ধাদি রচনা করেন তাহাতে তৎকালীন স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার উজ্জ্বল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তিনি 'রায়তদের বন্ধু' (the friend of the Ryots) আখ্যা লাভ করেন।

ব্ল্যাক এ্যাক্টসের ব্যাপারে রামগোপালের রাজনৈতিক চেতনা প্রকৃষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। যে চারিটি Draft Acts-কে সাধারণভাবে Block Acts বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাদের তিনটি গভর্ণমেণ্ট গেজেটে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর এবং চতুর্থটি ঐ বৎসরের ২১শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। এই চারিটি Draft Acts হইতেছে (I) An Act for abolishing exemption from the jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts, (II) An Act declaring the Law as to the privilege of Her Majesty's European subjects, (III) An Act for Trial by Jury and (IV) An Act for the protection of Judicial officers। দেশীয় কোর্টে ইওরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতাপ্রদানের জন্য বেথুন (Bethune) এই আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। রামগোপাল ঘোষ আইনের চক্ষে দেশীয় ও ইওরোপীয়দের ভেদাভেদ সৃষ্টির প্রতিবাদ জানান। তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত বক্তৃতার পরিশেষে সবলকণ্ঠে অকুণ্ঠভাবে মন্তব্য করেন,

"In conclusion I have only this to remark, that I have noticed with pain, not unmixed with surprise, that men who are confessed reformers and radicals in politics, are now attempting, in order to serve their own party purposes to throw ridicule upon the sacred and indisputable principle of equality before the law. What will Christian men in England of their own political creed, uninfluenced by local prejudices, say of their apostate brethren in the East? Will they admire the spirit of determination which, so many British residents have manifested of preserving unimpaired the advantages which they now enjoy over

the helpless and ignorant natives? Will they approve of the exclusive feeling which prompts the Englishman to refuse to make common cause with the natives of the land for the reformation of abuses? Will they read with complacency the sentiment which dictates the proud assertion that unequals shall not be equals? On the contrary, will not the generous and noble sons of Britain feel ashamed of their countrymen in India, who are anxious to perpetuate an invidious distinction, and preserve their exalted position at the expense of their native fellow subjects? Publicmen in England, I feel persuaded, would rather see the British residents generously cast in their lot with the natives of the land, striving with one united effort to obtain remedies against wrong and oppression."[১]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিলের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র এক সংবাদে জানা যায় যে ঐ বৎসরের ৬ই এপ্রিল ব্ল্যাক এ্যাক্টের ব্যাপারে টাউন হলে এক বিরাট সভা হয় এবং টমসন, রামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিচারবিষয়ে ইওরোপীয়দের স্বতন্ত্র স্থবিধার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। কিন্তু ইহাতে তেমন কোন ফল হয় নাই।

নীলবিদ্রোহ ও সিপাহীবিদ্রোহেরও পূর্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতালদের মধ্যে এক বিক্ষোভ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহা সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। দেশীয় স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে প্রধানত এই বিক্ষোভ হইলেও ইহাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ছিল না তাহা নহে। সাঁওতালসম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিদ্রোহ প্রবলরূপ ধারণ করিলেও ইহা একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া দেশের তদানীন্তন ইতিহাসের উপর কোন

১। Speeches of Ram Gopaul Ghose and his pamphlet on the "Black Acts" and minutes on education together with a short account of his life published by Charu Chandra Mitra Reprinted: Calcutta 1923: page 65.

বিশেষ লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তৎকালীন সচেতন শিক্ষিত সমাজ এই ঘটনায় গভীর কোন আগ্রহ বোধ করে নাই বলিয়াই মনে হয়।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ভূম্যধিকারী সভায় ইংলণ্ডস্থিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সহিত সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ভূম্যধিকারী সভার অস্তিত্বও প্রায় লোপ পায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর প্রধানত রামগোপাল ঘোষের চেষ্টায় ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সভা একান্তভাবে ধনীর স্বার্থসংরক্ষণ করিত।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সার্ চার্লস্ মেটকাফের আমলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ঠিক হয় যে, দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে রাজদ্রোহ ও কুৎসামূলক রচনা ছাড়া অন্য কোন অপরাধের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে না।

এই যুগে স্বদেশপ্রিয়তার অন্যতম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গুপ্তকবি পরম দেশভক্ত ছিলেন। বস্তুত দেশবাৎসল্য তাঁহার রক্ষণশীল মনোভাবকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন,

"মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥' "[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীকে ভালবাসিলেও তিনি ছিলেন ইংরেজদের পরাক্রমে মুগ্ধ,

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে জীবনচরিত ও কবিত্ব (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)ঃ পৃ ২৩-৪

যুদ্ধে ইংরেজের জয়ে উল্লসিত ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধে নামে তাহাদের পরমশত্রু। তাঁহার মধ্যেই প্রথম বাঙ্গালীপ্রীতি ও ইংরেজপ্রীতি যুগপৎ প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজপ্রীতির প্রাবল্যে তিনি নানা সাহেব ও ঝান্সীর রাণীকে লজ্জাকর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন।[১] এই দ্বৈতসত্তার জন্যই তিনি যথার্থ যুগসন্ধির কবি।

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের মূল সুর ছিল স্বদেশ-প্রেম। এই স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। রঙ্গলাল টডের বই হইতে রাজপুত বীরবালা পদ্মিনীর উপাখ্যান তাঁহার কাব্যের বিষয় করেন। ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন,

"'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের এক গূঢ় অনুভূতিকে মূর্ত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। পদ্মিনী উপাখ্যানের (এবং রঙ্গলালের পরবর্তী কাব্যগুলির) আত্যন্তিক মূল্য বেশী নয়। কিন্তু তাহা দ্বারা 'নিশীথিনীর মৌন যবনিকা' অপসারণের প্রথম সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মূল্য আছে।"[২]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' শুধু একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিই নহে, ইহার মধ্যে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় আছে। নর্ম্যাল স্কুলে কার্য করিবার সময় ভূদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই উপন্যাসের 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' গল্প দুইটি 'রোমান্স অব হিস্টরী' (ইণ্ডিয়া) নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর একস্থলে ভূদেব শিবাজীর আরাধ্যা ভবানী দেবীর কণ্ঠে বলিয়াছেন,

"......জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান ; যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।"[৩]

১। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) : বসুমতী সং : পৃ ২০০-২

২। ডাঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডঃ কলিকাতা ১৯৪৩ : পৃ ১৩৮

৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : ঐতিহাসিক উপন্যাস : হুগলী ১৮৬৪ : পৃ ৫৮

ইহা দ্বিতীয় মুদ্রণ বলিয়া মনে হয়, কেননা ইহাতে প্রথমবারের বিজ্ঞাপন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই গ্রন্থটি আছে। ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে' প্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ভূদেব-চরিতকার বলিয়াছেন,

"ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং পুষ্পাঞ্জলি ভূদেববাবুর প্রগাঢ় স্বধর্মভক্তি এবং স্বদেশভক্তি এবং সাধক-সুলভ ভবিষ্য-দর্শন প্রসূত। যখন অঙ্গুরীয় বিনিময় প্রকাশিত হইয়াছিল তখন 'দেশের কথা' অপর কেহই ভাবিতে আরম্ভ করেন নাই।"[১]

রাজনারায়ণ বসুর মধ্যেও গভীর দেশপ্রেম ছিল। এদেশে যাঁহারা জাতীয়তা বোধ জাগরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের অগ্রণীদের মধ্যে রাজনারায়ণ অন্যতম। মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজনারায়ণ কর্তৃক জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা স্থাপিত হয়। এই সভার আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য 'নেশানাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা (চৈত্রমেলা বা জাতীয়মেলা নামেও পরিচিত) স্থাপন করেন। হিন্দুমেলার কার্য-নির্বাহক সভার নাম নেশানাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা। রাজনারায়ণ এই সভার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভার অপর নাম ছিল জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা।

কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তা বিশুদ্ধ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,

"রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-এর বার-আনা বিলাতি, চার-আনা দেশী।"[২]

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল সকল ব্যক্তিই দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। এই যুগ দেশকে সর্ববিষয়ে উন্নত করিবার যুগ।

এই সময় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণে' (১৮৬০) বিস্তৃত সমাজচেতনা ও অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হয়। নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের এক জলন্ত ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া এই নাটকটি স্বদেশে ও বিদেশে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকার মিসেস ষ্টো-এর 'আঙ্কল্ টম্‌স কেবিন' উপন্যাস যেমন দাসত্বপ্রথার

১। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ঃ ভূদেবচরিত প্রথম খণ্ডঃ কলিকাতা ১৯১৭ঃ পৃ ১৯৬

২। বিপিনবিহারী গুপ্তঃ পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়)ঃ কলিকাতা ১৯২৩ঃ পৃ ২০৬

বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া তাহার উচ্ছেদে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তেমনি 'নীলদর্পণ'ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া ইহার দমনে কার্যকরী হইয়াছিল। এই হিসাবে 'নীলদর্পণে'র একটি অনন্যসাধারণ মূল্য আছে। 'নীলদর্পণ' বাহির হইবামাত্রই নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না। মধুসূদন 'নীলদর্পণে'র অনুবাদক এবং পাদ্রী লঙ সাহেব ইহার প্রকাশক হন। নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মামলা আনে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই এই মামলার বিচারপতি সার্ মর্ড্যাণ্ট ওয়েল্স লঙের একমাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিলে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সহস্র মুদ্রা অযাচিতভাবে প্রদান করেন। ক্রমে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ বিলাতে পৌঁছাইলে আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই নীলকরদের অত্যাচার প্রশমিত হইয়া গেল।

স্বদেশপ্রীতি হইতে স্বাধীনতাচেতনার ক্রমোন্মেষ এই যুগে দৃষ্ট হয়। সমাজচেতনা জাতীয়তাবোধের জন্ম সম্ভব করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে জাত এই জাতীয়তা প্রথমে খাঁটি ছিল না। ক্রমে এই জাতীয়তা বিশুদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

এই যুগে মুসলমানসমাজের মধ্যে একটি ব্যাপক আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল। এই আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবদুল ওহাব নামক একজন আরব দেশীয় যোদ্ধা মুসলমানজগতে একটি প্রচণ্ড আন্দোলনের জন্ম দেন। আবদুল ওহাবের নিকট হইতে ভাবধারা গ্রহণ করিয়া যুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলীর শাহ সৈয়দ আহ্মদ্ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে একটি গণআন্দোলন উপস্থিত করেন। ওহাব-পন্থীগণ বলেন যে, সাবেকী পবিত্রতা হইতে বিচ্যুতিই উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানসমাজের অবনতির অন্যতম কারণ। ওহাব-পন্থীগণ মুসলমান সমাজের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং দীর্ঘকাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করেন। আরব দেশে এই আন্দোলন ধর্মসম্বন্ধীয় হইলেও ভারতবর্ষে এই আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজেরা কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করে। ওহাবীরাই বাঙ্গালার প্রথম সন্ত্রাসবাদী। উপসংহারে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

উপসংহার

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশের চিন্তা ও ভাবধারার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা চিন্তা ও ভাবধারার ইতিহাসকে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি এই পাঁচটি বিভাগে ভাগ করিয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পাঁচটি বিভাগের বিচ্ছিন্নতা একেবারেই সত্য নয়। ইহাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং একটি মূলগত ঐক্য আছে। এই মূলগত ঐক্যই ইতিহাসের আত্মা। বলা বাহুল্য একমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্যই পাঁচটি বিভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের আলোচনায় প্রসঙ্গত অন্য বিভাগের সহিত ইহার যোগাযোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্মপ্রাণ এ দেশের সমাজে প্রায় সমস্ত আলোড়নই ধর্মান্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই যুগের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর ধর্মজীবন ও ভাবের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রস্তাব অনুভূত হয়। ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার ফলে অর্থনীতির দারুণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিল এবং ধর্মান্দোলন পূর্বেকার ধর্মান্দোলন হইতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিল।

আমরা দেখিয়াছি প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শেই বাঙ্গালার ভাব ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নবজাগরণ আসিয়াছে। এই নবজাগরণের যে ইতিহাস পাঁচটি বিভাগে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে ঐ বিভাগগুলির কেন্দ্রগত কতকগুলি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নও আমাদের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রশ্ন ও বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করা যাইতেছে।

১॥ প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ইংরেজ আমলে এদেশে যে নবজাগরণ দৃষ্ট হইল সেইরূপ জাগরণ পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই কেন? এই প্রশ্নটি একটু সতর্কভাবে বিচার করা প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশেরই শুধু নয়, সাধারণভাবে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। এই গ্রাম্যজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মকেন্দ্রিকতা, পরিবর্তন-বিমুখতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা। সরল অনায়াসসাধ্য

উৎপাদনপদ্ধতি ছিল আত্মনির্ভর গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। তুর্কী বা মোগল আমলে বাঙ্গালার উপর দিয়া উদ্দাম ঝড় বহিয়া গেলেও এই স্থিতিশীল স্বাবলম্বী গ্রাম্যজীবন ও সভ্যতা বিনষ্ট হয় নাই বলিয়া বাঙ্গালার জীবনে কোন গূঢ় পরিবর্তন হয় নাই। গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামো মোটামুটি এক ছিল বলিয়া মুসলমান ও হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবের উচ্চক্ষেত্রেই হইয়াছে। নবজাগরণের প্রধান ক্ষেত্র কলিকাতা কেন হইল এ বিষয়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। তৃতীয় জর্জের (১৭৬০-১৮২০) রাজত্ব-কালে কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনযন্ত্রের প্রাধান্যে কৃষিপ্রধান সমাজে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া এক নূতন যুগের সূচনা করে। হারগ্রীভ্‌স, আর্করাইট ও কম্পটন অল্প সময়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে বেশী সূতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কার্টরাইটের আবিষ্কৃত পাওয়ার লুম বা কলের তাঁতের জন্য বয়নশিল্পে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। খনি হইতে কয়লা তুলিবার নূতন পদ্ধতির প্রচলনে ইংলণ্ডে লৌহযুগের বিকাশ হইল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জেম্‌স্ ওয়াট নামক একজন স্কট্‌ল্যাণ্ডদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রথম স্টীম ইঞ্জিন বা বাষ্পীয় কল আবিষ্কার করিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম লৌহ-জাহাজ নির্মিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ এবং বাষ্পীয় পোত বা স্টীমারের প্রবর্তন হইল। নূতন নূতন শহর গড়িয়া উঠাতে ইংলণ্ডের চেহারা বদলাইয়া গেল। এই সকল আবিষ্কারের ফলে শিল্পজগতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল তাহাই ইতিহাসে 'শিল্পবিপ্লব' নামে আখ্যাত।

এই শিল্পবিপ্লবের তরঙ্গ বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের তটে আসিয়া আঘাত হানিল। ইংরেজ বণিকেরা বাষ্পীয় জাহাজ, রেলগাড়ী, ছাপাখানা, ধানকল, পাটকল প্রভৃতি এদেশে আমদানী করিল। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন-প্রণালীর গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইল। ঘড়ি, ভেনিসিয়ান কাঁচ, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি এদেশে আসিলে এদেশীয় লোকের সম্মুখে এক নূতন জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। সাবেকী আমলের উৎপাদন রীতি ও গতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনে গ্রামীণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কুটীর-শিল্পের অবনতিতে স্থিতিশীল গ্রাম্যজীবনে প্রবল আঘাত লাগিল। বাষ্পীয় জাহাজ,

কলকারখানা, সেতু, রেল প্রভৃতি সনাতন দেশাচার কুসংস্কার প্রভৃতিকে নির্মম-ভাবে দলিত করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মহিমা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হইল। ছোট উইলিয়ম পিটের মৃত্যুর পর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের বিধানে ইংলণ্ডে দাসব্যবসায় অবৈধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের জাহাজে নিগ্রো চালান দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ হয়। ইহার পর চতুর্থ উইলিয়মের (১৮৩০-৩৭) আমলে উইলবারফোর্স প্রমুখ মানবহিতৈষী মহাপুরুষগণের চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দাসত্বপ্রথা রহিত হইলে সমগ্র পৃথিবীতে মানবমুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। এই সকল নূতন ভাবসম্পদপূর্ণ যন্ত্রযুগের প্রবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই ইংলণ্ডের লিভারপুল, ম্যানচেস্টার প্রভৃতির ন্যায় এদেশেও নগরগড়ার কার্য আরম্ভ হইল। ক্রমে কলিকাতায় নগর গড়িয়া উঠিল এবং গ্রামীণ শিক্ষাসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। গ্রাম্যসমাজজীবনের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার জীবনে এক অভূতপূর্ব ঋতুর আবির্ভাব ঘটিল।

এই সঙ্গে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি ঘটনা বিশ্বের ভাব ও চিন্তাধারার আকাশে পরিবর্তনের মেঘসঞ্চার করে। ইহাদের মধ্যে প্রধান ঘটনাবলী হইতেছে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিরোধ আরম্ভ (১৭৭২), জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৭৭৫), আমেরিকা কর্তৃক স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা (১৭৭৬, ৪ঠা জুলাই), ইঙ্গ-আমেরিকা যুদ্ধ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার ও ভার্সাই-এর সন্ধিস্থাপন (১৭৮৩), প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) 'The Wealth of Nations' গ্রন্থ প্রকাশ (১৭৭৬) ও ইহাতে অবাধ বাণিজ্যনীতির (Free Trade) সমর্থন, ব্যাস্টিল বিদ্রোহ (১৭৮৯), ফরাসী বিপ্লবের প্রকাশ (১৭৯৩), ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের সংগ্রাম, ওয়াটারলুর যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটনের হস্তে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পরাজয় (১৮১৫), যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্টের পদে জর্জ ওয়াশিংটনের নির্বাচন (১৭৮৯), প্রভৃতি। এই সকল ঘটনাবলীর সহিত ভলটেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) 'Candide', রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) 'The Social Contract' (১৭৬২), 'Confessions' ও 'Discourse on Inequality', ইমানুয়েল কাণ্টের (১৭২৪-১৮০৪) 'Critique of Pure Reason' (১৭৮১) ও 'Critique of Practical Reason' (১৭৮৮),

ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) 'Principle of Morals' ও 'Treatise on Human Nature' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বের চিন্তা রাজ্যে নূতন ঝড় বহাইয়া দেয়। ইহার পর মানবসমাজের ভাবধারা যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁহাদের মধ্যে অগস্ট কোম্‌তে (১৭৯৮-১৮৫৭), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩), হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩), চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। কোম্‌তের 'System of Positive Polity,' মিলের 'On Liberty', 'Subjection of Women' ও 'Considerations on Representative Government', স্পেনসারের 'Principles of Sociology', 'Justice', ও 'The Man versus the State', ডারউইনের 'The Origin of Species by Means of Natural Selection', মার্ক্সের 'Das Kapital' প্রভৃতি গ্রন্থ মানবের জ্ঞানরাজ্যের নূতন দ্বার খুলিয়া দিল। মানবসমাজ নূতন আশা আনন্দ ও সম্ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এই বোধ ও জাগরণ বাঙ্গালার অন্তরে প্রবেশ করিল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বাঙ্গালার সমাজজীবনে নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছিল এবং যন্ত্রযুগের বিকাশে সংস্কৃতির কেন্দ্র গ্রাম হইতে শহরে সরিয়া আসিল এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার ফলে নূতন ভাবাদর্শের সংঘাতে দেশে চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে অপূর্ব আলোড়ন ও নবযুগ উপস্থিত হইল। এত গভীর আলোড়ন জাতির জীবনে আর কখনও আসে নাই বলিয়া জাতি অস্থির উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া উঠিল। এই নূতন যুগের বাণী হইল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শাস্ত্র ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবমনের মুক্তি, ব্যষ্টির মুক্তি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণকে উচ্চস্থান দান, জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, নারীসমাজের জাগৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যম, স্বাধীনতা ও মানবতার সামঞ্জস্যবিধান, বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের সেতুনির্মাণ প্রভৃতি।

নবজাগরণের সৃষ্টি ও প্রচণ্ডতার যে কারণ নির্দেশ করা হইল তাহা ছাড়া প্রচণ্ডতার আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে কখনও খুব একটা দৃঢ়সংবদ্ধ রাজনৈতিক শাসন গড়িয়া উঠে নাই। তুর্কী অভিযানের ফলে গৌড়সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াও সেন রাজারা কিছুদিন পর্যন্ত মধ্য ও পূর্ববঙ্গে স্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে স্থানীয় শাসনকর্তারা অনেককাল ধরিয়া অল্পবিস্তর স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকিবার জন্য বাঙ্গালা নামেমাত্র দিল্লীর রাজশক্তির অধীন থাকিলেও এই দেশের শাসনকর্তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। আবার বাঙ্গালাদেশ নামেমাত্র এক শাসনকর্তার অধীন হইলেও স্থানীয় এবং বিশেষ করিয়া প্রান্তীয় শাসনকর্তারা অধিকাংশই স্বাধীন ছিলেন। পাঠান এবং মুঘল শাসনকালেও এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে বারবার বর্গীর হাঙ্গামা হয়। সেই সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে এদেশে ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রায় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এক অখণ্ড শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্গীর হাঙ্গামা, পোতুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার, জমিদারদের বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রায় সর্বপ্রকার অরাজকতার অশান্তি দূরীভূত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পোষণের অনুকূল পরিবেশ জন্মলাভ করে।

বাঙ্গালা দেশ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে আর্যসংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হইতে বহু দূরে অবস্থিত। সেইজন্য বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম ছাড়াও বহু অনার্য ধর্মানুষ্ঠান বর্তমান। বস্তুত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে লোপ না পাইলেও বিরল-প্রচার হইয়া আসিয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ব্রতপূজা পূর্ণ বা আংশিকভাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। এই দেশে একদিন কর্মকাণ্ড-প্রধান বৈদিকধর্ম এবং ভক্তি-প্রধান দ্রাবিড়ধর্মের মিলন হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নানা সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয়ে বাঙ্গালার ধর্মভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে।

সমাজের স্তরবিন্যাসের মধ্যেও নানা বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়, মোঙ্গল, কোল প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস করিত। ইহাদের বংশধরেরা আজিও বিভিন্নভাবে বর্তমান। ইহার পর মুসলমানসংস্কৃতির সহিত যোগাযোগের ফলে সমাজে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তদুপরি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা সংহত সমাজসৃষ্টির প্রতিকূলে ছিল।

একটি দৃঢ়সংবদ্ধ সমাজ ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা থাকিলে বাহিরের শক্তির পক্ষে মূলচালনা করা খুবই কঠিন। ইংরেজদের আগমনের সময় সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের চিন্তা ও ভাবের কোন দৃঢ়সংহতি না থাকায় ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারা সহজেই মূল বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল।

২॥ এই যুগে সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার প্রাচুর্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার কারণ কি?

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই ভল্টেয়ার, হিউম, লক, টম পেইন প্রভৃতি চিন্তানায়কদের গ্রন্থাবলী এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষা ও এই সকল পুস্তকের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যে ইয়ংবেঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছিল এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কারকে আঘাত করিয়া রামমোহন যে চিন্তার বিপ্লব আনিয়াছিলেন তাহার মূলেও রহিয়াছে ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারা। প্রাচীন ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের সহিত নবাগত ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের দ্বন্দ্বে সমাজে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সমাজে যে সম্মিলিতভাবে স্বাধীনচিন্তা ও আলোচনার স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল তাহাই সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রেনেসাঁসের সময় ইতালীতেও সভাসমিতির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

সংঘাত-মুখর সমাজে নানাসমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয়। স্বাধীন চিন্তা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা ও পরস্পর মিলনের অবাধ অধিকার এই সভাসমিতির মূল আদর্শ থাকে। ইংরেজী শিক্ষাসভ্যতার মধ্য দিয়াই এই গণতান্ত্রিক আদর্শ এই দেশের চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের অধিকার পত্রপত্রিকাগুলির মূলনীতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইওরোপ হইতে প্রাপ্ত নূতন মানবাধিকারবোধ ও অবাধ চিন্তার আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকাদির প্রাচুর্যের প্রধান কারণ।

৩॥ এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সকল আন্দোলনই ধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষ ভাবে জড়িত। পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও ধর্ম এদেশের ধর্মের প্রতি

আঘাত হানিয়াছিল বলিয়াই প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র হিন্দু কলেজে একাধিকবার ধর্মসংক্রান্ত আলোড়ন উঠিয়াছিল। রামমোহন সতীদাহপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে এই প্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নহে ইহা প্রমাণ করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরকেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছিল। ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর নিকট শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণিত না হইলে কোন সংস্কার আন্দোলনই যে সমর্থন লাভ করিতে পারে না একথা তাঁহারা উভয়েই বুঝিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়কার ধর্মান্দোলনের একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল। এই সময়কার ধর্মান্দোলন জাতিকে মোক্ষলাভের পথে চালিত করে নাই, জাতির চরিত্রকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া তাহার ইহলৌকিক কল্যাণ সাধন করিতে চাহিয়াছে। সমাজরক্ষা ও তাহার সর্ববিধ উন্নতিবিধানের সমস্যাই এ যুগের প্রধান ধর্মসমস্যা। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের আদর্শ অপেক্ষা সমাজকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল।

৪॥ গদ্যসাহিত্যের বাহুল্য নবযুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিষয়-বৈচিত্র্য এই সময়কার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্য কেবল পদ্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং ধর্মই ছিল সাহিত্যের বিষয়বস্তু। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রধানত শাক্ত ও বৈষ্ণব কাব্যের সমষ্টি।

বাঙ্গালার জনসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খ্রীষ্টান মিশনরীগণ সর্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। এই জন্যই তাহারা সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবাহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছিল।

রামমোহনের কাছেও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পদ্যই যথেষ্ট বোধ হয় নাই। পদ্য কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা। সেইজন্য রামমোহন যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ববিষয়ের ও সর্বসাধারণের ভাষার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। পূর্বে ভাবুকসভার জন্য পদ্য ব্যবহৃত হইত। রামমোহনের প্রচেষ্টায় জনসভার জন্য গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হইল।

গদ্যপদ্যের সহযোগে বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণতা আসিল। সর্বসাধারণের ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে এতখানি স্বীকৃতিদান নবযুগের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ফল।

প্রথমে প্রধানত ধর্মালোচনার জন্য গদ্য ব্যবহৃত হইলেও শীঘ্রই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাতেও গদ্যের ব্যবহার হইতে লাগিল। নূতন নূতন বিষয়বস্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া নবযুগের প্রাণচাঞ্চল্যের প্রমাণ দিয়াছিল।

৫॥ নবযুগের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মধর্মান্দোলন একটি অসামান্য ঐতিহাসিক প্রয়োজন সাধন করিয়াছিল। ইওরোপীয় শিক্ষা সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ইয়ংবেঙ্গল হিন্দুধর্মের প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া হয় নাস্তিক সংশয়বাদী হইয়া উঠিতেছিলেন, না হয় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত হইয়া সংশয়বাদী চিত্তের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল এবং যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের শরণ লইয়াছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মধর্ম সমাজের ভাঙনকে রোধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

ব্রাহ্মেরা সহমরণনিবারণ, বিধবাবিবাহপ্রচলন প্রভৃতি সমস্তপ্রকার প্রগতি আন্দোলনের সমর্থক ছিল। নবযুগের চিন্তা ও ভাবধারা ব্রাহ্মদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-স্পৃহা ও অনধীনতার আদর্শ ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬॥ নবযুগের সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য হইতেছে পৌরুষের অভাব ও ভাবাবেগের আতিশয্য। আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যও এই দুইটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

নবযুগের নবশিক্ষা এদেশের চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ইওরোপীয় শিক্ষার সংস্পর্শে ইয়ংবেঙ্গলের দল মনে করিয়াছিলেন যে, মদ্য মাংস ও ভাবোচ্ছ্বাসই প্রগতির লক্ষণ। ভাবোচ্ছ্বাসের বশে তাঁহারা সনাতন আদর্শের প্রতি আস্থা হারাইয়া সংশয়বাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাবোচ্ছ্বাসে বাঙ্গালী মৌখিকভাবে অনেক কিছু সমর্থন করিলেও দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পৌরুষ তাহার প্রায়ই দেখা যায় না। বাঙ্গালী দেশাচারের অধীন বলিয়াই বিধবাবিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইলেও ইহা সমাজে তেমন চলে নাই। বাঙ্গালী

সেইযুগে হিন্দুর পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারকে নিন্দা করিলেও স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

যাহারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা বর্ণহিন্দু তাহারা অনেকক্ষেত্রেই কোন না কোন কারণে সমাজে পতিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা অনেকক্ষেত্রে প্রলুব্ধ হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মিশনরীদের শক্তিপ্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা হিন্দুসমাজের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিত। বস্তুত হিন্দুধর্মাদর্শে বিশ্বাস ছিল না অথচ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই এইরূপ লোকের সংখ্যাই ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে বেশি ছিল।

কিন্তু এই যুগের পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগের একটি সুফল ফলিয়াছিল। এই ভাবাবেগে সমাজ নিজের অবস্থার দুর্দশাকে অতিক্রম করিয়া নূতন আশা ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় সে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়াছিল। সেইজন্য নবযুগের সাহিত্যে যে উদ্দীপনা, প্রাণপ্রাবল্য ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় সেইরূপ পূর্বে আর দেখা যায় নাই। ভাবাবেগের আতিশয্য থাকিলে উঁচুদরের সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এই ভাবাবেগ সংযত হইলে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের রচনা হয়। সেইজন্য শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল।

৭॥ পূর্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে যে, এদেশের রাষ্ট্রীয় চেতনা ইওরোপীয় সংস্রব হইতে উদ্‌ভূত। ইওরোপীয় সংস্পর্শের পূর্বে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল বলিয়া আমরা সমস্ত অসম্মান ও অধিকারের খর্বতাকে মানিয়া লইতাম। কিন্তু এই ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিবাদে মানিবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতাকে প্রবল শক্তিতে কায়েম করে। ইওরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচয়ের ফলে রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা শুনিয়াছিলাম। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা; আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোন চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে যে-কোন চেষ্টা

করছি সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনো দিন মোগল-সম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে, যে তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে : A man is a man for a' that."[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফরাসী-বিপ্লবের ফলে ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তা-ধারায় যে গণতান্ত্রিক চেতনা দেখা দিয়াছিল তাহাই পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া এ দেশের চিত্তক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল।

৮॥ একটি জিনিস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইংরেজী সভ্যতার সংস্রবে সমাজের এক অংশের নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়াছিল। এই অংশ বাবুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই বাবুশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতা একাধিক পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে। এই বাবুশ্রেণীর এক অংশের মধ্যে পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ ও ভোগস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মদ্য মাংস ও বাইজীর নৃত্যগীত বাবুশ্রেণীর এক অংশের নিকট পরমার্থ বলিয়া আদৃত হইত। এই বাবুশ্রেণী কাহারা?

ইংরেজ রাজশক্তি এদেশে দৃঢ় হইলে অরাজকতার অশান্তি প্রায় দূরীভূত হইয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদার-দিগের সহিত কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে জমিদারদের অবস্থা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। কলিকাতা নবাগত সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হইলে ভোগোপকরণের প্রাচুর্যে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই এখানে আসিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আর্থিক পদমর্যাদা বলে কেহ কেহ ইংরেজদের সঙ্গলাভ করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল। যন্ত্রযুগের বিকাশে ও ইংরেজী শিক্ষায় মানুষের মর্যাদার বাণী প্রচারিত হইবার ফলে অনেক পরিমাণে বর্ণবৈষম্য কমিয়া আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও জমিদারশ্রেণীর লোকেরাই বিশেষ করিয়া বাবুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইংরেজেরা নূতন ভাব ও চিন্তাধারার সহিত ভোগের রীতি ও উপকরণ আনিয়াছিল। এই বাবুশ্রেণীর এক অংশ এই ভোগের রীতি ও উপকরণকে গ্রহণ করিয়া বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল।

৯॥ নবযুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবধারায় বাঙ্গালী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কালান্তর ২য় সং : কলিকাতা ১৯৪৯ : পৃ ৯

সমাজ কিয়ৎপরিমাণে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু এই প্রবল প্রাথমিক উত্তেজনা পরে সংহত হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী যে শক্তি বলে ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করিয়া ভারতবর্ষে নবযুগ-উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করিয়াছিল সেই শক্তির উৎস কি? এই উৎস সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন,

"বাঙ্গালী যেমন সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রীয় অনুভূতিরসের রসিক, তেমনই, সে সেই রসকে বস্তু বা বিষয়-নিরপেক্ষরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছুক নয়; সে এই দেহেরই সূক্ষ্মতর অধিষ্ঠানে, সহস্রদল নাড়ী-পদ্মে তত্ত্বমধু-ভুঞ্জনের পক্ষপাতী—সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া মহাকাশের নির্বিকল্প সমাধি-রস আস্বাদন করিতে সে চায় না;…"[১]

বলা বাহুল্য তাহার এই চরিত্রের মূলে রহিয়াছে সুপ্রাচীন তন্ত্রধর্ম। বাঙ্গালা দেশে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন বিরল-প্রচার হইয়া আসিয়াছে এবং পৌরাণিক ব্রতপূজা ও আত্মিক আচার-অনুষ্ঠান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তন্ত্রের মধ্যে খাঁটি সন্ন্যাস-বৈরাগ্য নাই। ইহার মধ্যে একদিকে প্রকৃতির প্রবৃত্তি-বন্ধন, অপরদিকে পুরুষের তান্ত্রিক মুক্তির দুরন্ত পিপাসা। তান্ত্রিক ভোগবাদ জাতীয় চরিত্রে ছিল বলিয়াই জাতির চরিত্রে ইওরোপীয় ভোগবাদ উপেক্ষিত হয় নাই। ভারতীয় মোক্ষবাদ ও ইওরোপীয় ভোগবাদের সামঞ্জস্যের ফলে নবযুগের সোনার ফসল ফলিয়াছিল।

১০॥ নবযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কলিকাতাই বাঙ্গালার নবজাগৃতির কেন্দ্র ছিল। ইহার কারণ কি?

প্রাচ্যসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে ভূমিস্বত্বের একটি বিশেষ রূপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় ভূমিস্বত্বের সহিত ইংলণ্ডের ভূমিস্বত্বের লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। ইংলণ্ডে রাজা জমির মালিক। পূর্বকালে ভারতবর্ষে রাজারা ভূমির মালিক ছিলেন না। তাঁহারা উৎপন্ন ফসলের একটি মাত্র অংশ দাবী করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'রায়তের কথা' পুস্তিকার একস্থলে লিখিয়াছেন,

---

১। মোহিতলাল মজুমদার: বাংলার নবযুগ: কলিকাতা ১৯৪৬: পৃ ৫৬

"যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথমে রাজার তারপর আর পাঁচজনের, যথা গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।"[১]

রাজা রক্ষাকর্তা হিসাবে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহের উত্থান-পতনে এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার নিকটে ভূমি হস্তান্তর হইলেও ভূমিস্বত্বের বিশেষ রকমফের হয় নাই। নূতন বিজয়ী রাজা রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভূমিস্বত্বের এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়াই সামন্তযুগের ইংলণ্ডের মত ভূমিস্বত্ব লইয়া এদেশের রাজাপ্রজায় বিরোধ তেমন হয় নাই। এই ভূমিস্বত্বের বৈলক্ষণ্যের সহিত সরল সহজ নির্মাণপ্রণালী-বিশিষ্ট কুটির শিল্প যুক্ত হইয়া গ্রাম্য সমাজের স্থিতিশীলতা, আত্মনির্ভরতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ব্রিটিশ যুগের পূর্ব পর্যন্ত এই স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য সমাজের অনুভবযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই গ্রাম্য সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল একই প্রকারের অনায়াসসাধ্য উৎপাদন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি। ব্রিটিশ আমলেই প্রথম এই স্থিতিশীল আত্মকেন্দ্রিক পরিবর্তন-বিমুখ গ্রাম্য সমাজের মূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। এই আঘাতে সনাতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ এবং সেই সঙ্গে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। গ্রামকেন্দ্রিক এ দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তরে বিপর্যয়ের তরঙ্গ উঠিল। ব্রিটিশ বণিকেরা লুঠতরাজ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া যে ধন সঞ্চয় করিল তাহা পরে মূলধনে পরিণত হইয়া এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাইতে সাহায্য করিল। এই প্রকারেই ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড সত্যকার রাজদণ্ড হইয়া এদেশে দেখা দিল।

নূতন যন্ত্রপাতির প্রচলনে এবং ইংরেজ বণিকদিগের লুঠতরাজ জুলুম শোষণ ও অত্যাচারে বাঙ্গালার কুটিরশিল্প ধ্বংসের পথে চলিল। ইংরেজ বণিকদের নিকটে তাহাদেরই নির্ধারিত মূল্যে এ দেশের ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে হইত। বণিকদিগের অত্যাচার ও জুলুমে অসহ্য হইয়া তাঁতীরা আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়া অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিত। কুটির-

১। প্রমথ চৌধুরী : রায়তের কথা পুনর্মুদ্রণ : কলিকাতা ১৯৪৭ : পৃ ৩৪

শিল্পের অবনতিতে বাঙ্গালার অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাঙ্গালার অন্তর্বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজেরা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য বহু কোটি টাকা স্বদেশ হইতে এ দেশে লইয়া আসিয়াছিল দেখা যায়। পলাশী যুদ্ধের পর তাহারা সেলামী ও ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু অর্থ লাভ করিল। বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব তাহাদের অর্থভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইহার উপর জুলুম অত্যাচার ও অসদুপায়ে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে তাহারা প্রভূত অর্থ লাভ করিতে থাকিল। তখন তাহারা স্বদেশ হইতে অর্থ না খাটাইয়া এ দেশ হইতে অর্জিত অর্থেই দ্রব্যসামগ্রী ধনসম্পদ ক্রয় করিয়া বাহিরে চালান দিতে লাগিল। এই আথিক নিষ্কাশনে (Drain of Wealth) বাঙ্গালা ক্রমেই দরিদ্র হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইংরেজ এক মারাত্মক স্বার্থপর নীতির প্রচলন করিল। কোম্পানীর রীতি হইল—এদেশের শিল্পদ্রব্য যথাসম্ভব বিদেশে রপ্তানী না করিয়া এখান হইতে যথাসাধ্য কাঁচামাল সেখানে পাঠানো এবং পরে ইংলণ্ড হইতে যথাসম্ভব শিল্পজাতদ্রব্য এদেশে আমদানী করা। এইভাবে বাঙ্গালাকে কাঁচামালের ক্রয়কেন্দ্র করিয়া তোলাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের অভাবে স্বাভাবিক নিয়মেই বাঙ্গালায় বহু শিল্প নষ্ট হইয়া গেল। নরেন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন,

"In Bengal the Company and its men practically established a monopoly in the manufacture of cotton for export and raw silk. Many of the objectionable features of such a system developed—compulsory labour and restriction of trade in other directions. Bengal, which was the resort of merchants from all nations for the purchase of its manufactures, was unprotected and unprepared for the economic impact which was soon to begin. Faced with the alternative between turning the corner and extinction, the people of Bengal, with their sapped vitality, were not in a position to turn the corner."[১]

১। Narendra K. Sinha : The Economic History of Bengal, Vol. I : Calcutta 1956 : p. 226.

ইহার সহিত যুক্ত হইল ভূমিব্যবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ কোম্পানীকে বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে দশশালা বন্দোবস্ত হয় তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাতে বাঙ্গালার প্রজা জমির উপর তাহার স্বত্বস্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত হইল। জমিদারগণ স্বাধিকারের দাবী পাইলেও নির্ধারিত উচ্চ হারে রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়ি রীতি অনুসরণের ফলে নিয়মিত কিস্তির টাকা দিতে না পারার জন্য বহু জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেল। উচ্চহারে রাজস্বের টাকা সংগ্রহের জন্য জমিদারগণ কর্তৃক কৃষককুল উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হইতে লাগিল। জমিদারগণ জমিদারী রক্ষার্থে যেন তেন প্রকারেণ খাজনা আদায় করিয়া চলিল, কিন্তু কৃষি জলসেচন ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে কোন দৃষ্টিই দিল না। ফলে কৃষির অবনতি হইল এবং দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতিতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হওয়াতে গ্রাম্য সমাজের ভিত ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ব্রিটিশ বণিকগণ ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এদেশে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পযুগের বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডে কলকারখানার চাহিদা মিটাইবার জন্য ইংরেজগণ ভারতবর্ষ হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যকে বিক্রয় করিবার মত বাজারসৃষ্টির নিমিত্ত গ্রাম হইতে নগর গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে সকল কাঁচামাল এদেশ হইতে ইংলণ্ডে চালান যাইত, তাহাদের মধ্যে কার্পাস, রেশম, সোরা ও নীলই ছিল প্রধান। কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং বিক্রেয় ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য ইংরেজেরা যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিল। গ্রামের কার্পাস, তুঁত ও নীলের চাষ হইতে লাগিল, কফি ও চা-বাগান বিস্তৃত হইয়া চলিল, কয়লাখনিতে অধিকতর কাজ আরম্ভ হইল। সেই সঙ্গে রেলপথ বসিল। ডাক ও তারবিভাগের উন্নতি ঘটিল। বড় বড় সেতু তৈয়ারী হইল। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী হওয়ায় যন্ত্রযুগ আত্মপ্রকাশ করিল। এইভাবে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতাকে উৎকেন্দ্রিক করিয়া ফেলিল।

কলিকাতাতেই ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের প্রথম নগরনির্মাণের কার্য আরম্ভ হয়।

ক্রমে এখানে অনেকগুলি মার্কেন্টাইল হাউস ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া কলিকাতাকে শিল্পবাণিজ্যের এক প্রধান কর্মকেন্দ্র করিয়া তুলে। ইংরেজের এ দেশীয় বেনিয়ান ও অন্যবিধ কর্মচারিগণ, ধনী ব্যবসায়ীরা এবং এদেশের জমিদারশ্রেণীর অনেকেই কলিকাতায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে ইহাদের অর্থে ও সামর্থ্যে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। ইংলণ্ড হইতে কলকারখানার দ্রব্যসম্ভারের সহিত সাহিত্য ও শিক্ষার সম্পদও এদেশে আমদানী হইতে থাকে। গ্রাম্যসমাজের স্থিতিশীলতা ভাঙ্গিয়া কলিকাতায় যান্ত্রিকযুগের গতিশীলতা ও প্রসারণপ্রবণতা দেখা দেয়। কলিকাতাতে বিজ্ঞান, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বাণী প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণেই নবজাগরণের তরঙ্গকেন্দ্র হয় কলিকাতা। এতদ্বিষয়ে বিনয় ঘোষ তাঁহার 'বাঙলার নবজাগৃতি' ১ম খণ্ড (কলিকাতা ১৯৪৮) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন।

১১॥ যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন শ্রেণীবিন্যাসের উৎপত্তি হইল। এই শ্রেণীবিন্যাসের স্বরূপ কি ?

মধ্যযুগে শ্রেণীবিচারের প্রধান মাপকাঠি ছিল বংশকৌলীন্য। আর্থিক বৈষম্য বল্লালী কৌলীন্যের সহিত মিলিত হইয়া সমাজে এক বিরাট শ্রেণীভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু শ্রমশিল্পের যুগে ধনতন্ত্রের বিকাশে কৌলীন্য ও রক্তসম্পর্কের আভিজাত্যকে পরাজিত করিল মুদ্রা। মধ্যযুগের স্থিতিশীল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার স্থলে গতিশীল অর্থ নৈতিক কার্যবিধি আত্মপ্রকাশ করিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নূতন শ্রেণীবিন্যাসে দেখা দিল ধনিকশ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও শ্রমজীবীশ্রেণী। ইংরেজ আমলের পূর্বে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে মাঝামাঝি বিত্তসম্পন্ন লোক যে ছিল না তাহা নহে। তবে এই শ্রেণীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল বলিয়া ইহাদের শ্রেণীহিসাবে বিশেষ কোন প্রাধান্য ও প্রভাব ছিল না। এই ধনী ও মাঝামাঝি রকমের বিত্তসম্পন্ন লোকেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কৌলীন্য লক্ষণীয় ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থসম্পদই ক্রমে নূতন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে শ্রেণী-বিচারের মানদণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। বিষয়টি একটু বিশদ করা যাক।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থার দারুণ পরিবর্তন ঘটিল। বড় জমিদার, ছোট জমিদার, তালুকদার, চৌধুরী,

তরফদার অথবা অন্যান্য মধ্যবর্তী রাজস্বআদায়কারীদের মধ্যে একজনকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার সহিত জমির বন্দোবস্ত করা হইল। এই জমিদার প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট হারে গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ রহিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদারবর্গের মধ্যে স্তরভেদ বিনষ্ট হওয়াতে সকলে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল। সুতরাং ইংরেজেরা জমিদারশ্রেণীকে নূতন ভাবে বিন্যস্ত করিয়া নূতন স্বত্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল। নরেন্দ্র সিংহ মন্তব্য করিয়াছেন,

"It would be wrong to assert that this class was a creation of British rule. Under the British there were only ramifications of this class and the professions contributed very considerably to its growth."[১]

কিন্তু বর্ধিত হারে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব আদায়ের কঠোরতার জন্য অনেক জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে বহু প্রাচীন বনেদী জমিদার বংশ ধ্বংস হইয়া গেল। ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজের অধীনে কর্ম বা ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া যাহারা কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল তাহারা অনেক জমিদারী কিনিয়া লইল। এইভাবে ইংরেজের অনেক বেনিয়ান জমিদার হওয়াতে নূতন শ্রেণীবিন্যাসের প্রকাশ ঘটিল। নরেন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন,

"One-third to one-half of the Zamindaris of Bengal were sold by the rigour of the Sale Law and they were mostly bought by rich parvenus, the banians from Calcutta, who had amassed their fortunes in their transactions with the English, the French and the Dutch and by those who had made money by banking, contracts, inland trade and such other activities."[২]

রেশমব্যবসায়ী কান্তবাবু, মহারাজা নবকৃষ্ণ ও শিল্পপতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

১। Narendra K. Sinha: The Economic History of Bengal, Vol. I: Calcutta, 1956: p. 4.

২। Ibid: pages 4-5.

দাদনবণিক রূপে যাঁহারা প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, লক্ষীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, উমিচাঁদ (আমির চাঁদ) প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বিখ্যাত বেনিয়ানদের মধ্যে ছিলেন গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, হিদারাম ব্যানার্জী, অক্রূর দত্ত, মনোহর মুখার্জী ইত্যাদি। মহারাজা নবকিষেণ (নবকৃষ্ণ), গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কৃষ্ণকান্ত নন্দী প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে বেনিয়ান বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা রাজনৈতিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধনকুবের জগৎ-শেঠদের নাম পরিচিত। ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর ছায়ায় শিল্পোদ্‌যোগী হইয়া প্রচুর অর্থসম্পদ যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামকৃষ্ণ মল্লিকের নাম করা যাইতে পারে। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালায় পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেছে তাহাদের প্রাথমিক মূলধনসঞ্চয়ের যুগ।

ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এই মধ্যবিত্ত কথাটির প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। মধ্যবিত্ত দুই প্রকার—(১) জমি-বিহীন অর্থাৎ চাকরিজীবী বা সামান্য ব্যবসায়জীবী এবং (২) সামান্য জমিজমা-সম্পন্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর অধিকাংশেরই কিছু না কিছু জমিজমা ছিল দেখা যায়। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে মাথাপিছু চাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষির উপর কেবলমাত্র নির্ভর না করিয়া সরকারী অফিস, বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকরিগ্রহণে অথবা ছোটখাট ব্যবসাবৃত্তি অবলম্বনে অনেকে বাধ্য হইল। এই ভাবে একদল চাকরি অথবা ব্যবসায়জীবী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তৃত হয় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের ফলে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে যাহারা বিশেষভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত যুক্ত হইল তাহারা বিদ্বৎ গোষ্ঠী বা সমাজ নামে পরিচিত হইল।

একালের ভূমি-বিহীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনের প্রধান নিয়ামক মুদ্রা এবং এই মুদ্রা তাহারা পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রধান সহায় ও অনুচর হিসাবে অর্জন করে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে কেরানীর সংখ্যা খুবই বেশি। বাঙ্গালার মধ্যবিত্তশ্রেণীতে হিন্দুপ্রাধান্যের কারণ এই যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের মত ইংরেজী শিক্ষা-

দীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানদের নিকট হইতে ইংরেজরা রাজশক্তি অধিকার করিয়াছিল। সেই জন্য মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ছিল। তাহারা স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ পোষণ করিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষভাব ও অসহযোগিতা উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানসমাজের অবনতির অন্যতম কারণ। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রাজনৈতিক কারণে ইংরেজগণ মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি প্রদর্শন করিত। বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট মুসলমানেরা সেইজন্য হিন্দুদের মত সুযোগ সুবিধা না পাইলেও, যেটুকু পাইয়াছিল তাহারা তাহারও সদ্ব্যবহার করে নাই। পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে হিন্দুপ্রাধান্যের কারণও ইহাই।

এই সময় যে আর একটি শ্রেণীর উৎপত্তি হইল তাহার নাম মজুরশ্রেণী। ধনতান্ত্রিক যুগে এই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে বাধ্য এবং ইহাদের দ্বারাই শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলে বহু কৃষক ও কারিগর উৎখাত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে কয়লাখনি, রেল, পাটকল, নীলক্ষেত, চা-বাগান প্রভৃতিতে যোগ দিয়া মজুরশ্রেণীর সৃষ্টি করিল। মজুরশ্রেণীর দুইটি প্রধান ভাগ—(১) গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং (২) শহরের কলকারখানার মজুর।

নবযুগের নূতন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে শ্রেণীবিরোধের বীজ উপ্ত হইল। ধনিকতন্ত্রের প্রথমযুগে সম্পদসচ্ছলতা হেতু এই বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে বেকারত্ব দেখা দিলে শ্রেণীসংগ্রাম প্রকাশ পায় এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীসংগ্রাম স্পষ্ট ও ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই নূতন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগের রক্তের মর্যাদা ও কৌলীন্য অর্থহীন।

১২॥ আমরা দেখিয়াছি যে নবজাগরণ বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এবিষয়ে দু'একটি কথা বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ মুসলমান অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য ও অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর। নানা শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত বিদেশী আরবী ইরানী

তুর্কী আফগান ও মুসলমানদের সংমিশ্রণের ফলে বাঙ্গালায় স্বল্পসংখ্যক আশ্‌রাফ বা অভিজাত মুসলমানের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই আত্‌রাফ বা অনভিজাত অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। এই হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। মানবপন্থী বাঙ্গালা দেশে হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় তাই সহজেই ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

"ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের বলপূর্বক কিছু কিছু মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালাদেশে যে মতের মহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরান-অনুসারী ইসলাম নহে; শরিয়তী মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে। বাঙ্গালাদেশে ইসলামের সুফীমতই বেশী প্রসার লাভ করে। সুফীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সুফী-মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে তুর্কী বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই "মজ্‌মু'অ অল্‌-বহ্‌রৈন্‌" অর্থাৎ দুইটি সাগরের সম্মিলন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[১]

ইংরেজেরা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাণী এদেশে লইয়া আসিয়াছিল তাহার সহিত মুসলমানভাবধারা আপোষ করিতে পারিল না। ইহার কয়েকটি গুরুতর কারণ ছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবদুল ওহাব (Abdul Wahhab) নামক একজন আরব দেশীয় যোদ্ধা মুসলমানজগতে একটি আন্দোলন উপস্থিত করেন। যুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলীর শাহ্‌ সৈয়দ আহ্‌মদ (Shah Sayyid Ahmad) আবদুল ওহাবের নিকট হইতে ভাবধারা গ্রহণ

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যঃ কলিকাতা ১৯৩৮ঃ পৃ ২৫-৬

করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সমগ্র ভারতে একটি গণআন্দোলনের তরঙ্গ তোলেন। ওহাবী মতবাদের উচ্চাদর্শ ছিল সমস্ত নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিহার এবং ধর্মোপদেষ্টার (Prophet) আচার ব্যবহারের বিশেষভাবে অনুসরণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপের জাতিসমূহের যখন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল, তখন মুসলমানজগতে বিকেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পায়।

ওহাবী নেতাগণ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সাবেকী পবিত্রতা হইতে বিচ্যুতিই এই অবনতির জন্য দায়ী। তাই তাঁহারা উপর্যুক্ত আদর্শপ্রচারে যত্নবান হন। আরবদেশে এই আন্দোলন প্রধানত ধর্মসম্বন্ধীয় হইলেও ভারতবর্ষে এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের অবনতি ঘটে। এই সময় ওহাবপন্থীগণ মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়। ওহাবপন্থীগণের প্রথম জেহাদ শিখদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। শিখগণ মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করিত এবং ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে শাহ্ সৈয়দ আহ্মদের নেতৃত্বে ওহাবপন্থীগণ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর যুদ্ধ (জেহাদ) ঘোষণা করে। ইহার পর তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করিয়াছিল। তাহাদের মতে এই সময় ভারতবর্ষ দার-উল-হার্ব বা অ-মুসলমান রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, যেখানে মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মসম্বন্ধীয় পদমর্যাদা ও নির্বিঘ্নতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে তিতুমিয়াঁ বা তিতুমীর নামক একজন ওহাবী নেতা মুসলমান প্রজাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অচিরে তিনি ইংরেজদের হস্তে পর্যুদস্ত ও নিহত হন।

W. W. Hunter তাঁহার 'The Indian Musalmans' নামক গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমানপরিবারের অর্থাগমের তিনি তিনটি প্রধান উপায়ের কথা বলিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে—সাময়িক কর্ম, রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচার অথবা রাজনৈতিক বিভাগের চাকরি। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইতে মুসলমানেরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হইল। সাধারণভাবে ইংরেজদের সামরিক

বিভাগে কোন মুসলমান নিয়োগ করা বন্ধ হইল। যদি বা কখনো কোন মুসলমান সৈন্যদলে ভর্তি হইত তাহার সম্পদসংগ্রহের কোন সুযোগ রহিল না।

দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। কেননা রাজস্ব সংগ্রহ-নীতির পরিবর্তনের জন্য বাঙ্গালার ভূমি-ব্যবস্থার এক নূতন রূপ দেখা দিয়াছিল। মুসলমানআমলে রাজস্ব-বিষয়ক উচ্চপদগুলিতে প্রায়শ মুসলমানেরাই অধিষ্ঠিত থাকিত দেখা যায়। তবে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত কর্ম হিন্দু নাজির বা বেলিফেরাই সম্পাদন করিত। এইভাবে হিন্দুরা রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার ভিতর একটি নিম্ন কর্মচারীশ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীরা ঊর্ধ্বতন মুসলমান কর্মচারীদের নিকট সংগৃহীত রাজস্ব জমা দিবার সময় তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ গ্রহণ করিত। বলা বাহুল্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরাই রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যাপারে সম্রাটদের নিকট দায়ী থাকিতেন। কোন দেওয়ানী আদালতের পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁহারা ভূমিকর বসাইতেন না। তাঁহাদের অধীনস্থ একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিকের সাহায্যে ভূমিকর বলবৎ করা এবং বাকী রাজস্ব আদায় করা হইত। এই অশ্বারোহী সৈনিকদল প্রয়োজন মত জেলা হইতে গ্রামে গিয়া লুঠপাট করিয়া বাকী খাজনার শেষ কপর্দকও সংগ্রহ না করিয়া ছাড়িত না। এই ব্যবস্থায় রাজস্বসংগ্রহের সূত্রে মুসলমান কর্মচারিগণ প্রচুর অর্থসম্পদ লাভ করিত।

দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে ইংরেজেরা প্রধান রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে বঙ্গদেশ লাভ করিয়াছিল। এই রাজস্ব আদায়ের অধিকার তাহারা তরবারির জোরে লাভ করিলেও তাহাদের আইনসম্মত উপাধি ছিল দেওয়ান বা রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী। সেইজন্য মুসলমানেরা মনে করিত যে, ইংরেজেরা মুসলমান পদ্ধতি অনুসরণ করিতে বাধ্য। তদনুসারে ইংরেজেরা প্রথমে মুসলমান কর্মচারীদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখিয়াছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও জন শোর ক্রমে মুঘল পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিলেন। এই পরিবর্তনগুলি পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইয়া মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে নূতন রূপদান করিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান কর্মচারীর স্থলে প্রত্যেক জেলায়

একজন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। এই বন্দোবস্তের অন্যতম নীতি হইল অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীদের জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি দান। এইভাবে মুসলমান রাজস্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় পরিবার-সমূহের পদমর্যাদা বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মুসলমানদের সম্পদ হিন্দুর হাতে আসিতে আরম্ভ করিল।

হান্টার স্বীকার করিয়াছেন যে, এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বিশেষ শঠতাপূর্ণ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,

"The greatest blow which we dealt to the old system was in one sense an underhand one, for neither the English nor the Muhammadans foresaw its effects. This was the series of changes introduced by Lord Cornwallis and John Shore, ending in the Permanent Settlement of 1793. By it we usurped the functions of those higher Musalmán officers who had formerly subsisted between the actual Collector and the Government, and whose dragoons were the recognised machinery for enforcing the Land-Tax. Instead of the Musalmán Revenue-farmers with their troopers and spearmen, we placed an English Collector in each District, with an unarmed fiscal police attached like common bailiffs to his Court. The Muhammadan nobility either lost their former connection with the Land-Tax, or became mere landholders with an inelastic title to a part of the profits of the soil.

The Permanent Settlement, however, consummated rather than introduced this change. It was in another respect that it most seriously damaged the position of the great Muhammadan Houses. For the whole tendency of the Settlement was to acknowledge as the landholders

the subordinate Hindu officers who dealt directly with the husbandmen."[১]

তৃতীয় উপায় অর্থাৎ শাসনবিভাগীয় কর্ম, যাহা মুসলমানের প্রায় একচেটিয়া ছিল। এখন তাহা তাহাদের পক্ষে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী চাকরি এবং বেসরকারী উচ্চজীবিকার্জনের সুযোগ হইতে মুসলমানেরা বঞ্চিত হইল।

"......the Muhammadans are now shut out equally from Government employ and from the higher occupations of non-official life."[২]

উপরের আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানসমাজের অর্থনৈতিক অবনতির কারণের উপর আলোকপাত করিবে বলিয়া বিশ্বাস।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোর্টে পারস্যের স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যাপারেও মুসলমানেরা ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

প্রধানত দুইটি কারণে মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে যায়—(১) খ্রীষ্টধর্মান্তরিত হইবার ভয় ও (২) ওহাবী আন্দোলনের ফলজনিত ব্রিটিশ-বিদ্বেষ। এই দ্বিতীয় কারণটিই গুরুতর, কেননা বাঙ্গালার দূরতম প্রান্তেও এই আন্দোলনের ঢেউ গিয়া পৌঁছাইয়াছিল।

এই সময় ওহাবপন্থীগণের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ক্রমেই তিক্ত হইতেছিল। সেইজন্য রাজকার্যে মুসলমানকর্মচারী নিয়োগ না করা সরকারী নীতি বলিয়া স্থির হইল। ক্রমে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বহু ওহাবীমতাবলম্বীদের নির্বাসনে পাঠাইয়া এবং বহু অর্থসামর্থ্য ব্যয় করিয়া ওহাবী আন্দোলন প্রশমিত করিলেন। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে মুসলমানসমাজের চরম অবনতি ঘটিল এবং তাহারা ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ

১। W. W. Hunter: The Indian Musalmans, Third Edition: London 1876: page 162.

২। Ibid: p. 171.

গ্রহণ করিল না। নবযুগের ভাবধারা প্রধানত ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। যেহেতু ইংরেজবিদ্বেষ-বশত মুসলমানেরা ইহা হইতে দূরে সরিয়া রহিল সেইহেতু নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানসমাজে বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই।

ওহাবী আন্দোলনই ছিল এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমান সমাজের প্রধান ঘটনা। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মতবাদের জন্মভূমি আরবদেশ এবং ভারতবর্ষে ইহার কেন্দ্র-ভূমি ছিল পাটনা। এ বিষয়ে অমিত সেন লিখিয়াছেন,

"Wahabism started from Arabia as a puritan upsurge and has been aptly described as Anabaptist in faith, Red republican in politics. A contemporary of Rammohan imported it into India, and Patna became a leading centre of the new cult".[১]

ওহাবী আন্দোলন বাঙ্গালার মুসলমান কৃষক সমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে ওহাবীগণ আন্দোলন চালাইয়াছিল। বলিতে গেলে ইহারাই বাঙ্গালার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং ইহাদের মধ্য হইতেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ওহাবী আন্দোলন ছাড়া মুসলমানসমাজের মধ্যে জাগৃতির কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় নাই। কলিকাতায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনে যে ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মধ্যেও মুসলমান ছিল না বলিলেই চলে।

ভারতবর্ষে মুসলমানসমাজের জাগরণ আরম্ভ হয় উত্তর ভারতের সার্ সৈয়দ আহ্মদ্ খানের নেতৃত্বে। এই সৈয়দ আহ্মদ্ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। সার্ সৈয়দ ওহাবীদিগের অসহিষ্ণুতা ও বিক্ষোভকে সমর্থন করিতেন না। মুসলমানদের অধোগতির কথা চিন্তা করিয়া তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের হইতে মুসলমানদের পৃথক ব্যবস্থার (Separatism) পক্ষপাতী ছিলেন।

১। Amit Sen: Notes on the Bengal Renaissance: Bombay 1946: page 41.

সার্ সৈয়দের পর মুসলমানজাগৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সার্ সৈয়দ আমির আলি এবং সার্ মহম্মদ ইকবাল। আমির আলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানসমাজের দুর্দশা ঘুচাইয়া ইহাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করা। সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হইবার পরে আমির আলি দি সেণ্ট্রাল মহমেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই এসোসিয়েশন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি আঞ্জুমান (এসোসিয়েশন) গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই সকল আঞ্জুমানের দ্বারা প্রচারিত হইত যে, মুসলমানেরা হিন্দুদের হইতে পৃথক।

এই সময় হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দুজাগৃতির ফলে হিন্দু সভ্যতা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠতার বাণী বিশেভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দুসমাজকে উন্নত করিবার জন্য এই সকল বাণী প্রচারিত হইলেও ইহাতে মুসলমান সমাজে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কবি ইকবাল ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিন্দু একাধিপত্য স্থাপনে তৎপর অনুভব করিয়া ইহার বিপক্ষে ছিলেন। ইহা ব্যতীত হিন্দুরা ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্যও মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিল।

এই সময় হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিদ্বৎ-সমাজের মধ্যে নানা প্রকার অসন্তোষ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইতেছিল এবং ইহারা নিজেদের দাবীদাওয়ার প্রতি সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে পরিমাণে ছিল তাহা পূরণের সেই পরিমাণ সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। সেই জন্য সংঘাত অনিবার্য হইয়া আসিতেছিল।

এই অবস্থায় ইংরেজ শাসকগণ তাঁহাদের নীতির পরিবর্তন করিলেন। হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্টি করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল এই যে, মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিদ্বৎ-সমাজের বিকাশ হইলে হিন্দুমধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিদ্বৎ-সমাজের সহিত সংঘর্ষ বাধিবে এবং তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সহায়তায় রাজত্ব বজায় রাখিতে পারিবেন। মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিদ্বৎ-সমাজ সৃষ্টির প্রধান উপায় শিক্ষা। সেই জন্য ১৮৭০-১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসকগণ মুসলমানসমাজের শিক্ষার দিকে নজর দিলেন। শিক্ষিত

হিন্দুদের সংস্পর্শে মুসলমানসমাজের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ইতোমধ্যেই জাগরিত হইয়াছিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিদ্বৎ-সমাজের বিকাশ আরম্ভ হইল।

১৩॥ উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ যে প্রধানত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশ ছাড়া মহারাষ্ট্রেও এই নবজাগরণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রে এই নবজাগরণের নেতৃত্ব করেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। রাণাডের পর এই জাগৃতির নেতৃস্থানীয় হন গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং বাল গঙ্গাধর তিলক।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই নবজাগৃতি শেষ পর্যন্ত হিন্দুজাগৃতি ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। জাতিকে সর্ববিষয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ করাই ছিল এই নবজাগৃতির লক্ষ্য। এই জাগৃতির আন্দোলনে মুসলমান সমাজের অনুপস্থিতির কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাববাদী বাঙ্গালী ও বাস্তববাদী মারাঠাগণের মধ্যে এই জাগৃতি হিন্দুজাগৃতি রূপেই চিহ্নিত হইয়াছিল। কাজী আবদুল ওদুদ লিখিয়াছেন,

"...the idealist Bengalee and the practical Marhatta combined in calling the Awakening a Hindu Awakening." [১]

এই হিন্দুজাগৃতির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুজাতিকে অধঃপতন হইতে তুলিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী জাতিসমূহের পাশে একই মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই জাগৃতির হোতাগণ মনে করিতেন যে, হিন্দুসভ্যতার মূল প্রাণশক্তি অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী এবং ইহা অনেক আঘাত সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া আছে, কেননা ইহার মূল অত্যন্ত দৃঢ়। হিন্দুজাগৃতি এই শক্তিরই নূতন উদ্দীপন। হিন্দুজাগৃতির অপর একটি কথা সাময়িকভাবে রাহুগ্রস্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদের গ্রাসমুক্তি ও পুনর্বিকাশ।

১। Kazi Abdul Wadud: Creative Bengal: Calcutta 1950: page 72.

গ্রন্থ-বিবরণী

॥ ১ ॥ গ্রন্থাবলী (রচনার মধ্যে উল্লিখিত প্রধান প্রধান গ্রন্থের লেখকদের অথবা সম্পাদকদের নামের বর্ণানুসারে সাজান)

অক্ষয়কুমার দত্ত—ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ সং : কলিকাতা ১৮৯৪

—বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ১ম ভাগ ৭ম সং : কলিকাতা ১৮৭১

—বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ২য় ভাগ ৫ম সং : কলিকাতা ১৮৭৩

—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ ২য় সং : কলিকাতা ১৯০৭

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) (বসুমতী সাহিত্য মন্দির সং) কলিকাতা

কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস) : কলিকাতা ১৯৩৯

কুমুদনাথ মল্লিক—সতীদাহ : কলিকাতা ১৯১৪

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ : কলিকাতা ১৮৫৭-৮

কৃষ্ণকমল-গ্রন্থাবলী ২য় সং পরিবর্ধিত (কামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত) : কলিকাতা ১৯০৪

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৩ খণ্ড) : কলিকাতা ১৮৪৬-৫১

—ষড়্‌দর্শন-সংবাদ : কলিকাতা ১৮৬৭

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গুপ্ত রত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ : কলিকাতা ১৮৯৪

ক্ষিতিমোহন সেন—হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা : কলিকাতা ১৯৫০

ক্ষিতীশচন্দ্র দাস—বঙ্গে যীশুর বিজয় যাত্রা : কলিকাতা ১৯৪২

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নূতন খসড়া) : কলিকাতা

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১ম খণ্ড : ভবানীপুর ১৮৭৭

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং): কলিকাতা ১৯৩৭
ঘনরাম চক্রবর্তী—শ্রীধর্ম-মঙ্গল ২য় সং: কলিকাতা ১৯০১
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর ৩য় সং: এলাহাবাদ ১৯০৯
তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জুন: কলিকাতা ১৮৫২
তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী: কলিকাতা ১৮৫৪
দাশরথি রায়—পাঁচালী ১ম ও ২য় খণ্ড (হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত): কলিকাতা ১৯০১
দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ: কলিকাতা ১৮৬০
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী: কলিকাতা ১৮৭৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ৩য় সং (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত): কলিকাতা ১৯২৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ব-রচিত জীবনচরিত (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত): কলিকাতা ১৮৯৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মতত্ত্ববিদ্যা (প্রথমাবধি পঞ্চমাধ্যায় পর্যন্ত) ২য় সং: কলিকাতা ১৮৬২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত): কলিকাতা
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত: কলিকাতা
—ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান (প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণ ও মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশ একত্রে): কলিকাতা ১৯৪৫
—ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস ৩য় সং: কলিকাতা ১৮৬৯
নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয়-চরিত: কলিকাতা ১৮৮৭
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ৫ম সং: এলাহাবাদ ১৯২৮
নরহরি দাস—ভক্তিরত্নাকর ২য় সং: বহরমপুর ১৯১২
প্যারীচাঁদ মিত্র—আলালের ঘরের দুলাল: কলিকাতা ১৮৫৮
প্রমথ চৌধুরী—রায়তের কথা পুনর্মুদ্রণ: কলিকাতা ১৯৪৭
বিদ্যাসাগর—গ্রন্থাবলী (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত):

—সাহিত্য : কলিকাতা ১৯৩৭
—সমাজ : কলিকাতা ১৯৩৮
—শিক্ষা ও বিবিধ : কলিকাতা ১৯৩৯
বিনয় ঘোষ—বাঙলার নবজাগৃতি ১ম খণ্ড : কলিকাতা ১৯৪৮
বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ (১ম পর্যায়) : কলিকাতা ১৯১৩
—পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়) : কলিকাতা ১৯২৩
বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর : কলিকাতা ১৮৯৫
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১৮২৪-৫৮) : কলিকাতা ১৯৪৮
—বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ : কলিকাতা ১৯৩১
—বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নূতন সং : কলিকাতা ১৯৪৮
—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ সং : কলিকাতা ১৯৪৭
—রামমোহন রায় পরিবর্ধিত ৪র্থ সং : কলিকাতা ১৯৪৬
—সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড ৩য় সং : কলিকাতা ১৯৪৯
—সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড : কলিকাতা ১৯৩৩
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা কমলালয় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং) : কলিকাতা ১৯৩৬
—নববাবু বিলাস (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং) : কলিকাতা ১৯৩৭
—দূতীবিলাস : কলিকাতা ১৮২৫
ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে) ২য় সং (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সং) : কলিকাতা ১৯৫০
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক উপন্যাস : কলিকাতা ১৮৫৭
—পারিবারিক প্রবন্ধ : হুগলী ১৮৮২
—পুরাবৃত্ত : কলিকাতা ১৮৫৮
—বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ : চুঁচুড়া ১৯০৫

—শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব : কলিকাতা ১৮৫৬
—সামাজিক প্রবন্ধ ৬ষ্ঠ সং : কলিকাতা ১৯৩৭
মধুসূদন দত্ত—তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য : কলিকাতা ১৮৬০
—শর্মিষ্ঠা : কলিকাতা ১৮৫৯
—পদ্মাবতী : কলিকাতা ১৮৬০
—একেই কি বলে সভ্যতা ? : কলিকাতা ১৮৬০
—বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ : কলিকাতা ১৮৬০
মন্মথনাথ ঘোষ—কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র : কলিকাতা ১৯২৭
—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় : কলিকাতা ১৯১৭
মহেন্দ্রনাথ রায়—শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত : কলিকাতা ১৮৮৫
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—ভূদেবচরিত ১ম ভাগ : কলিকাতা ১৯১৭
—ভূদেবচরিত ২য় ভাগ : কলিকাতা ১৯২৩
—ভূদেবচরিত ৩য় ভাগ : কলিকাতা ১৯২৭
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বত্রিশসিংহাসন : কলিকাতা ১৮০৮
—রাজাবলি : কলিকাতা ১৮০৮
মোহিতলাল মজুমদার—বাংলার নবযুগ : কলিকাতা ১৯৪৫
যোগেশচন্দ্র বাগল—রাজনারায়ণ বসু : কলিকাতা ১৯৪৫
—রাধাকান্ত দেব ৪র্থ সং : কলিকাতা ১৯৫১
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনীউপাখ্যান : কলিকাতা ১৮৫৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালান্তর পরিবর্ধিত সং : কলিকাতা ১৯৪৮
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ : কলিকাতা ১৮৫৫
রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত : কলিকাতা ১৯০৮
—ধর্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ : কলিকাতা ১৮৬৭
—সারধর্ম : কলিকাতা ১৮৮৬
—সেকাল আর একাল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সং) : কলিকাতা ১৯৫১
—হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত : কলিকাতা ১৮৭৫
—হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা : কলিকাতা ১৮৭৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্বস্ব-নাটক : কলিকাতা ১৮৫৪

—রত্নাবলী : কলিকাতা ১৮৫৮
রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিবর্ধিত ও সংশোধিত ষষ্ঠ সং) : কলিকাতা
রামমোহন-গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-সং)
২য় খণ্ড : কলিকাতা ১৯৫২
৩য় খণ্ড : কলিকাতা ১৯৫২
৫ম খণ্ড : কলিকাতা ১৯৫১
৬ষ্ঠ খণ্ড : কলিকাতা ১৯৪৫
রামরাম বসু—প্রতাপাদিত্যচরিত্র : কলিকাতা ১৮০১
—লিপিমালা : শ্রীরামপুর ১৮০২
রামাই পণ্ডিত—শূন্যপুরাণ (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত) কলিকাতা ১৯০৮
রামেশ্বর ভট্টাচার্য—শিবায়ন ২য় সং : কলিকাতা ১৯০৩
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত : কলিকাতা ১৮৯১
শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : কলিকাতা ১৯০৪
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ২য় সং : কলিকাতা ১৯৪৮
সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং) : কলিকাতা ১৯৩৯
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত—পদকল্পতরু পরিশিষ্ট ৫ম খণ্ড : কলিকাতা ১৯৩১
সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড : কলিকাতা ১৯৪৮
সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত—ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ : কলিকাতা ১৯০৭
সুশীলকুমার দে—দীনবন্ধু মিত্র : কলিকাতা ১৯৫১
—নানা নিবন্ধ : কলিকাতা ১৯৫৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গের ভূমিকা : কলিকাতা ১৯৩১

যে সকল গ্রন্থে লেখকদের নাম নাই :

ক। ধর্মসভার অতীত সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত দৃষ্ট শ্রুত পবিত্র চরিত্রবিবরণ : কলিকাতা ১৮৪৮

খ। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত : কলিকাতা ১৮৭১

গ। সংক্ষিপ্ত ভূদেবজীবনী ১ম সং (কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত): চুঁচুড়া ১৯১১

Alexander Duff—India and India Missions 2nd ed.: Edinburgh 1840

Amit Sen—Notes on the Bengal Renaissance: Bombay 1946

Arthur Avalon—Tantra of the Great Liberation (Mahānirvāna Tantra): London 1913

Bimanbehari Majumdar—History of Political Thought from Rammohun to Dayananda (1821—84): Calcutta 1934

C. B. Lewis—The Life of John Thomas Surgeon of the Earl of Oxford East Indiaman and first Baptist Missionary to Bengal: London 1873

Charles E. Trevelyan—On the Education of the People of India: London 1838

Charles Lushington—The History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity: Calcutta 1924

Eustace Carey—Memoir of William Carey: London 1836

Eyre Chatterton—A History of the Church of England in India Since the Early days of the East India Company: London 1924

Fanny Parkes—Wanderings of a Pilgrim, in search of the picturesque during four-and-twenty years in the east with Revelations of life in the Zenāna Vol I: London 1850

F. W. Thomas—The History and Prospects of British Education in India: Cambridge University 1891

George Otto Trevelyan—The Life and Letters of Lord Macaulay New edition Vol I: London 1895

George Smith—The Life of Alexander Duff Vol I: London 879

Henry Louis Vivian Derozio—Poems of Henry Louis Vivian Derozio (ed. by F. B. Bradley-Birt): Oxford University Press 1923

Hyde—Parochial Annals of Bengal: Calcutta 1901.

H. E. Busteed—Echoes from Old Calcutta 3rd Edition : London 1897

Jatindra Kumar Majumder—Raja Ram Mohun Roy and Progressive Movements in India (1775-1875): Calcutta 1941

John Addington Symonds—A Short History of the Renaissance in Etaly: London 1893

John Clark Marshman—The Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol I: London 1859

J. J. A. Campos—History of the Portuguese in Bengal: Calcutta 1919

J. N. Farquhar—Modern Religious Movements in India: New York 1915

Kazi Abdul Wadud—Creative Bengal: Calcutta 1950

Kissory Chand Mittra—Radha Kant Deb (in the Calcutta Review)
—Ram Mohun Roy (in the Calcutta Review)
—Review of The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy (in the Calcutta Review)

Krishna Mohon Banerjea—A Prize Essay on Native Female Education: Calcutta 1841
—Persecuted: Calcutta 1831

K. S. Macdonald—Rajah Ram Mohun Roy, The Bengali Religious Reformer: Calcutta 1879

Mary Carpenter—The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy: Calcutta 1915

Monier William—Religious Thought and Life in India Part I: London 1883

Narendra K. Sinha—The Economic History of Bengal Vol I: Calcutta 1956

Peary Chand Mittra—David Hare (Basumati Sahitya Mandir ed.): Calcutta 1949
—Life of Dewan Ram Comul Sen: Delhi 1928

Priscilla Chapman—Hindu Female Education: London 1839

Priya Ranjan Sen—Western Influence in Bengali Literature 2nd edition: Calcutta 1947

Raja Rammohun Roy—The English works: Panini office 1906

Rajnarain Bose—The Essential Religion : Calcutta 1886
—Brahmic Advice, Caution and Help : Calcutta 1869

Sashibhusan Das Gupta—Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature : Calcutta 1946

S. Leonard—History of the Bbáhma Samáj : Calcutta 1879

Sophia Dobson Collet : The Life and Letters of Rajah Rammohun Roy : London 1900

S. Pearce Carey—William Carey (8th ed.) : London 1934

Surendranath Banerjea—A Nation in Making : Being the Reminiscences of Fifty Years of Public Life : Oxford University Press 1925

Thomas Edwards—Henry Derozio, the Eurasian Poet, Teacher and Journalist : Cacutta 1884

Thomas Rœbuck—The Annals of the College of Fort William : Calcutta 1819

Thomas Smith—Alexandar Duff : London 1833

W. W. Hunter—The Indian Musalmans Third Edition : London 1876

যেসকল গ্রন্থের লেখকদের নাম নাই :

ক। A Brief Account of the Life and Character of Radhakant Deb : Calcutta 1880

খ। A Rapid Sketch of the life of Rajah Radhakant Dev Bahadur with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning by the editors of the Raja's Sabdakalpadrum : Calcutta 1859

গ। Speeches of Ram Gopaul Ghose and his pamphlet on "Black Acts" and minutes on education together with a short account of his life published by Charu Chandra Mitra Reprinted : Calcutta 1923

॥ ২ ॥ সরকারী রিপোর্ট ও বেসরকারী সভাসমিতির বিবরণী

First Report of the Calcutta School Book Society : Calcutta 1818

Second Report of the Calcutta School Book Society : Calcutta 1818-19

Third Report of the Calcutta School Book Society's Proceedings (1819-20) : Calcutta 1820-21

Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838) by William Adam (ed. by Anathnath Basu) : Calcutta 1941

Papers realating to the Public Press in India 1858

The Proceedings of the Bethune Society for the Sessions of 1859-60, 1860-61

॥ ৩ ॥ পত্রপত্রিকা

The Bengal Harukaru

The Bengal Spectator

The Calcutta Christian Intelligencer

The Calcutta Christian Observer

The Calcutta Review

The Hindu Patriot

The Indian Messenger

The Indian Mirror

The National Magazine

The National Paper

এডুকেশন গেজেট

জ্ঞানান্বেষণ
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
বিশ্বভারতী পত্রিকা
বিবিধার্থ সংগ্রহ
মাসিক পত্রিকা
শনিবারের চিঠি
সমাচার চন্দ্রিকা
সমাচার দর্পণ
সংবাদ প্রভাকর
সংবাদ ভাস্কর
সোমপ্রকাশ

নির্দেশিকা
